এই দেশেরই মেয়ে

শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশপ্রিয় লাইব্রেরী
১৯৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীকালীপদ দে
১৯৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

দাম—দুই টাকা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৩৮

মুদ্রাকর—
শ্রী তারাচাঁদ মুখার্জ্জি
কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩নং কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, কলি

বঙ্গ-ভারতীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান
বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
ও
লীলা বৌঠা'নকে দিলাম।

এই দেশেরই মেয়ে

বহুদিন আগে গল্পটির ছক এঁকে রেখেছিলাম। হেলায় পড়ে ছিল, পড়েও থাকতো। হঠাৎ একদিন স্নেহাস্পদ বন্ধু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এসে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন এবং তাঁরি উদ্ধত তাগিদ মাথায় ক'রে বইটি শেষ করি। ততোধিক তাগিদের ওপর এর মুদ্রণকার্য্য শেষ হয়। কিন্তু যে জন্য এত তাগিদ, তা হলো না, মাঝখান থেকে অনেক ভুল ত্রুটি রয়ে গেল। বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বইটি প্রকাশ করতে যে শ্রম স্বীকার করেছেন, সে জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

লক্ষ্মীপুরের রাজবাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ধুম পড়িয়া গেল। অজস্র আলোর বিদীর্ণ রশ্মিতে, জনতার অবিরাম গতায়াতে, রাজভোজের প্রাচুর্য্যে, বিবিধ গীতবাদ্যে গণ্ডগ্রামটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

উত্তেজনার সে প্রস্রবণ, আনন্দের সে ক্ষীণ আয়ু ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গতানুগতিকতার কোলে ঢলিয়া পড়িয়া বিলীন হইয়া একটি যুগের প্রান্তকালে আসিয়া পৌঁছিল,—তাহা টের পাইলাম তখন, যখন দুইটি ধনী পরিবারের কাহিনী লিখিবার ডাক আসিল নানা উত্থান পতন ও বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া। এক পুরুষ নামিয়া আসিল পরমায়ুর ক্ষীণ স্বাক্ষর লইয়া, আর এক পুরুষের অভ্যুত্থান হইল উত্তরকালের উজ্জ্বল ও জটিল ভবিষ্যৎ লইয়া।

প্রেমের মন্দিরে সানাইয়ের প্রভাতী সুর স্পষ্ট করিয়া মিলাইয়া না যাইতেই সংসারে নূতন অতিথির সমাগম হইয়াছে। সেও আজ অনেক দিনের কথা। জ্যেষ্ঠার দাবী লইয়া আসিয়াছে কন্যা—নাম রাখা হইয়াছে দেবীরাণী। পাঁচবৎসরের নাতিদীর্ঘ অবকাশের পর আসিয়াছে কনিষ্ঠ,—নাম হইয়াছে দেবকুমার। কালক্রমে দেবটুকু উহ্য হইয়া গেছে, রহিয়াছে শুধু কুমার।

ঘট বুঝিয়া বিল্বদল নিক্ষেপের বেলায় বিধাতার কার্পণ্য নাই। ধনীর ঘরে শুধু ধন দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন না, রূপকারের তুলিটিও তখন সজাগ হইয়া উঠে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অভিনিবিষ্টতায়।

সপ্তমবর্ষীয় পুত্র দেবকুমার রূপবান পিতার অবিকল প্রতিচ্ছবি লইয়াই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ওই যে দ্বাদশবর্ষীয়া মেয়ে দেবী,—যৌবনের ঘাটে কুম্ভ যার আজও ভরিয়া উঠে নাই; কিন্তু কাঁচা অঙ্গের ওই ঢল ঢল লাবণ্য বলিয়া দেয় অনাগতের একটা ঝল্‌সানো দীপ্ত শ্রী! বলিয়া দেয়, যৌবন যেদিন তাহার ঘুমন্ত পাপড়ি সহাস্যে মেলিয়া ধরিবে, ওই কাঁচা সোনার রং যেদিন পাকা হইবে, যেদিন দেবীর টানা টানা দুইটি দেবীচক্ষু আরও পূর্ণায়ত হইয়া উঠিবে, ঘনকুঞ্চিত ওই কেশদাম যেদিন আগুল্‌ফচুম্বিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িবে শ্রোণীভারে গতিভঙ্গি হইয়া উঠিবে বেপথুমানা,—সেদিন হয়ত রূপের প্রতিযোগিতায় আহ্বান আসিলে লক্ষ মেয়ের মধ্যে প্রথম পুরস্কার ওই পাইবে।

হয়ত পাইত; কিন্তু সে আহ্বান আসে নাই, তাহার প্রয়োজনও হয় নাই। আমরা জানি দেবীর জীবনের ইতিহাস। কাহিনীর গোড়ার কথা ও রূপের কথা শেষ করিয়া এইবার বলি সেই ইতিহাস।

দুই

শরতের দেবীদুর্গা পূজামণ্ডপ আলো করিয়া প্রতি বৎসর যেমন আসে এবারও তেমনি আসিয়াছেন। কিন্তু মায়ের আগমনেও মা-জাহ্নবীর প্রা উৎকণ্ঠায় ভরিয়া উঠিয়াছে। আজ দ্বাদশবৎসরের এক টানা রুটিন্ ভ হইয়াছে পুত্রবধূ সন্ধ্যার শঙ্কাজনিত পীড়ায়।

প্রতিবৎসর পূজার উৎসবও শেষ হইয়া আসে, নিশীথও বাহির হই পড়ে সন্ধ্যাকে লইয়া বম্বের দিকে। আদরিণী কন্যা দেবীরাণী কোন সঙ্গে থাকে, কোনবার পিতামহীর অঞ্চলে বাঁধা থাকে দেশের বাড়িতে পুত্র কুমার জননীর কাছছাড়া হয় নাই আজও পর্য্যন্ত। নিশীথ দু

তাহার পিত্রালয়ে পৌছাইয়া দিয়া তাহার দেশপর্য্যটনের নেশাটা এখানে-ওখানে ঘুরিয়া মিটাইয়া দেশে ফিরিয়া আসে। লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মী ছয়মাস বাপের বাড়ি থাকিয়া আকাশে বাদলের সঞ্চার হইতেই আম-কাঁঠালের দিনে লক্ষ্মীপুরে ফিরিয়া আসে।

কিন্তু এইবার পূজার আগে ব্যাধি আসিয়া সন্ধ্যাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছে। তাই সে পূজার আগেই এবার স্বামীপুত্র সঙ্গে লইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় চলিয়া আসিয়াছে পিত্রালয়ে।

কিন্তু পিত্রালয়ে আসিয়া পিতামাতার সান্নিধ্য সে পাইয়াছিল মাত্র এক পক্ষকাল। তারপর এক সন্ধ্যায় সূর্য্য ডুবিয়া গেল সমুদ্রের মধ্যে, তারই সাথে নিশীথের স্ত্রী সন্ধ্যাও ডুবিয়া গেল সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে।

বিয়োগান্ত আসরে একমাত্র কন্যার পিতামাতার ক্রন্দনের ঢেউ গিয়া মিশিয়া গেল সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে।

কিন্তু নিশীথ চোখের জল ফেলিয়া তাহার মনের দুঃখ লাঘব করিয়া লইতে পারিল না। শুচিনিষ্ঠ গাঢ় ভালবাসার সে করুণ বিলাপ মনে কোণে অশ্রুত ক্রন্দনের যে ঢেউ তুলিয়া দিল তাহা কেহই শুনিতে পাইল না, শুধু শুনিলেন তাহার অন্তর্যামী।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শোকাভিভূত রায়সাহেবের পায়ের ধূলা লইয়া নিশীথ বলিল,—'আপনার মেয়ের শেষ অনুরোধ আমি পালন করবো। কোনদিনই কুমারকে আমি আর নেবো না দাবীও করবো না। ও আপনাদেরই।'

কথার উত্তর না লইয়াই নিশীথ বেগে বাহির হইয়া আসিল ঘর হইতে। গভীর নিশীথেই নিশীথ বম্বে ত্যাগ করিল। বম্বের উদয়-অস্ত আর সে দেখিবে না।

এদিকে সপ্তমী অষ্টমী নবমী পার হইয়া গেছে একটা মহাউদ্বেগের মধ্য দিয়া। দশমীও চলিয়া পড়িয়াছে বিসর্জ্জনের শ্রান্ত সন্ধ্যায়।

রুক্ষ চুল, রক্তচক্ষু, আলুথালু বেশ লইয়া ঝড়ের মত বেগে নিশীথ দুর্গামণ্ডপে প্রবেশ করিল। বহু নারী পরিবেষ্টিতা জাহ্নবীদেবী তখন দুর্গার বিদায় অনুষ্ঠানে ব্যাপৃতা।

নিশীথ মায়ের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, 'মা সন্ধ্যা ডুবে গেছে।'

হতভম্বের মত মা সেদিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। মুখ দিয়া তাঁহার যেন অজ্ঞাতসারেই শুধু বাহির হইল, 'হ্যাঁ তাতো গেছেই, এইবার মা যাবে ভাসানে।'

'যাবে নয়, গেছে। মা সন্ধ্যা চলে গেছে।'

মন বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না। তাই মায়ের মুখে আবার নিরর্থক প্রশ্ন শোনা যায়, 'কোথায় চলে গেছে?'

'সেইখানে গেছে মা, যেখান থেকে আর ফিরবে না।'

মা জাহ্নবী মহামায়ার চরণতলে বসিয়া পড়িলেন। কন্যা দেবীর হাত হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া রূপার বরণডালা স্খলিত হইয়া পড়িল মন্দিরের শ্বেত মর্ম্মরের উপর।

তিন

ছাতের উপর নির্জন ছোট ঘরটির ভিতর একটা বৈরাগ্যের করুণ ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। গৈরিকবস্ত্র আচ্ছাদিত বাতায়নের ফাঁক দিয়া সূর্য্যের আলোও সেখানে ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করে।

সাদা গালিচার উপর বসিয়া বসিয়া নিশীথ সেখানে দিবারাত্র ধর্মগ্র পাঠ করে। কখনো বা ধ্যানস্থ হইয়া শুচিস্মিত সে-মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে কাহার তপস্যায় মগ্ন হইয়া পড়ে।

সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

অসাধারণের মধ্যে হয়ত একমাত্র জননী জাহ্নবীর প্রবেশ অবারিত।

শোকের উত্তাপটা মাত্র কমিয়া আসিয়াছে।

হঠাৎ জাহ্নবী ঠাকুরাণীর মনে হইল—'কুমার কোথায়? তাকে ত নিশীথের সঙ্গে দেখতে পেলাম না!'—ঠাকুরাণীর নিম্নগামী স্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিল একটা ভাবী আশঙ্কায়। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন পুত্রের দরজায়।

ডাকিলেন, 'নিশীথ?'

গ্রন্থ হইতে মুখ তুলিয়া নিশীথ বলিল, 'ডাক্‌চো মা?'

'কুমার কোথায় নিশীথ?'

দিব্য সহজকণ্ঠে নিশীথ উত্তর দিল, 'তাকে ত' দিয়ে এসেছি মা!'

'দিয়ে এসেচিস্! কি বলচিস্ খোকা, কুমারকে দিয়ে এসেচিস্?'

'হ্যাঁ মা কুমারকে দিয়ে এসেচি।'

'কবে আসবে?'

'আসবে না।'

জাহ্নবীদেবী নিজের দেহের ভার যেন আর বহিতে পারিলেন না। গালিচার এক কোণেই বসিয়া পড়িয়া উদ্বেলিতকণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আসবে না?'

না মা, আসবে না। তার দাদামশাই আর তার দিদিমার হাতে তাকে তুলে দিয়ে এসেছি। তাই যে মা সে বলে গেছে।'

'কে বলে গেছে, কি বলেছে নিশীথ?'

'বলেছে তোমার বৌ, কুমারের মা। একমাত্র সন্তানের পিতামাতার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌লে, 'আমি জন্ম দিলেও আমার দান করবার অধিকার নেই। কিন্তু কাকে নিয়ে থাকবে ওঁরা? তাই তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি……' এর পর চিন্তা করবার সময় আমার ছিল না মা, তাই কোনরূপ ইতস্ততঃ না ক'রে আমি তার শেষ ভিক্ষা পূরণ ক'রে এসেছি।'

'খুব ভালো কাজ ক'রে আসোনি নিশীথ। তোমার কথা ত' থাকবে না।'

অবিচলিতকণ্ঠে নিশীথ বলিল, 'থাকবে।'

মা'র কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর ভাসিয়া উঠিল। বলিলেন, 'থাকবে?'

'হ্যাঁ মা থাকবে। আর সে ত' ভালোই আছে। রায়সাহেবের ... বড় বিত্তটার সেই ভাবী ওয়ারিশ। আর তাই যদি হয়, দৌহিত্রের স্নেহের ভাগেও তাঁদের দাবী আছে।'

'সেই দাবীর জোরে তুমি তাকে চিরকালের জন্য খয়রাৎ ক'রে আসতে পারো নাকি?'

'কুমারের মা'র মৃত্যুকালের সেই যে শেষ অনুরোধ ছিল মা!'

'হোক্ তার শেষকালের শেষ অনুরোধ! হোক্ রায়সাহেবের সম্পত্তি তোমার জমিদারীর চতুর্গুণ! তোমার বাপ ঠাকুরদার বংশটাকে টাকার লোভে তুমি যে কোন্ আক্কেলে বিলিয়ে দিয়ে আস... পারলে আমি ত' ভেবে পাইনে নিশীথ! আমি তা হতে দেব না। আমি নিজে যাবো, নিজে গিয়ে কুমারকে নিয়ে আসবো।'

'যেয়োনা মা। গিয়ে কোন লাভ হবে না।'

'লাভ হবে না? নিশীথ তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? বৌ কে সংসারে আর কারও মরে না? ছেলে তোমার এত ফ্যাল্না হলো াবা? বম্বের ময়দানে ঢের ছেলে ঘুরে বেড়ায়, নিক্ রায়সাহেব সেখান থেকে একটা কুড়িয়ে।'

নিশীথ সে কথার কোন জবাব না দিয়া আবার সে পুঁথির পাতা খুলিয়া বসিল।

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'তুইও যাবি নে, আমিও যাবো না—এই তোর ইচ্ছে?'

মুখ না তুলিয়াই নিশীথ বলিল, 'এই আমার ইচ্ছে। তোমাদের দাবী আছে, জবরদস্তিও তোমরা করতে পারো; কিন্তু অন্ততঃ আমার অনুরোধেও সে চেষ্টা তোমরা কোরো না। যদি করো, নিজের ছেলেকে হারাবার নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে জেনেই করবে।'

নিশীথের অব্যর্থ সন্ধান ব্যর্থ হইল না। মার প্রাণ বিগলিত হইয়া উঠিল পুত্রের চিত্তদুর্ব্বলতার আশঙ্কায়। কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া যাইবার পর তিনি বলিলেন, 'বেশ তাই যদি হয়, আর দেরী না ক'রে বিয়ে একটা তোমার করতেই হবে।'

নিশীথ যেন চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, 'বিয়ে?'

'হ্যাঁ বিয়ে, কেন নয়? কি তোমার বয়স, ছত্রিসও পেরোয়নি!'

'কুমারকে ফিরিয়ে আনা যেমন অসম্ভব, ফের আমার বিয়ে করাটা যে া তার চেয়েও অসম্ভব।'

এইবার জাহ্নবীদেবী কিঞ্চিৎ অধৈর্য্য হইয়াই বলিয়া উঠিলেন—'বেশ সবই যদি অসম্ভব হয়, দু'চারদিনের মধ্যেই আমার কাশী যাওয়াটা সম্ভব,

ক'রে দাও বাবা। এর চেয়ে বেশী তোমার কাছে আর আমি কিছু চাই নে।'

নিশীথ বলিল, 'তাও সম্ভব নয়। আমি এখন অচল, কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম চাই। তুমি গেলে সংসার তোমার ভেসে যাবে মা।'

'একান্ত স্বার্থপরের মত তুমি যা বললে বাবা, তার কি কিছু অর্থ হয়? সংসার? কার সংসার? পুত্র অচল,—বিশ্রামপ্রার্থী। পুত্রবধূ চিরতরের জন্য বিশ্রাম নিয়েছে। একমাত্র পৌত্র, তাকেও জীবনে আর দেখতে পাবো না। কাকে নিয়ে কার সংসার আমি করবো বাবা? দরকার নেই আমার সংসারের, তুমি আমায় বিদেয় ক'রে দাও।'

'কেন মা, দেবী ত' রয়েছে। দেবীকে তোমার আদর্শে গড়ে তোল। আমার যা-কিছু সবই তার হাতে তুলে দাও। তার বিয়ে দাও,—তার ছেলে হবে, মেয়ে হবে,—দেখতে দেখতে সংসার তোমার আবার ভরে উঠবে!'

প্রৌঢ়া জননী তাহাতেও খুসী হইলেন না; বরং একটা গভীর ঔদাস্যের সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া একটা মৃদু ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'হ্যাঁ আমি এখন ওর ছেলে ভাসিয়ে দিয়ে ওর মেয়ের সংসার আগলে বসে থাকবো! আমি পারবো না, আমার কাশীযাত্রার ব্যবস্থা করো!'

বলিয়াই জাহ্নবীদেবী ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নিশীথ ঝুঁকিয়া পড়িল পুঁথির দিকে।

চার

গৃহত্যাগী মন লইয়া পুত্রের মুখের উপর জাহ্নবীদেবী এইমাত্র কাশী যাত্রার যে বিজ্ঞপ্তি সদম্ভে ঘোষণা করিয়া আসিলেন, ভিতরে আসিয়া

দেবীর ওই নিষ্কলঙ্ক দেবীমূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার সঙ্কল্পের সে দৃঢ়তা তলাইয়া গেল মায়ামোহ স্নেহের একপাট উচ্ছ্বাসে।

দেবীকে তিনি ভালবাসিতেন প্রাণের চেয়েও বেশী। জন্মাবধি দেবী পিতামহীর হাতেই মানুষ, তাঁরই বুকেপিঠে সে বড় হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের কোল হইতে কুমার ছুটিও পাইয়াছে কম, ঠাকুরমার ভালবাসার ভাগী হইবার বরাতটুকু কাড়িয়া লইয়াছে তাই সবটুকুই দেবী।

সেদিক দিয়া দেবী ভাগ্যবতী।

তবু সে কুমার নয়, কুমারী!

বিধাতাপুরুষের সৃষ্টির এই প্রভেদের মূলে জমা হইয়া আছে অনেক দিনের অনেক আপত্তি।

পিতামহীর এত স্নেহের পাত্রী হইয়াও, নৈকট্য ও ভালবাসার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঠাকুরমার মন তাঁহার স্বামীর বংশরক্ষার জন্য বেগে ধাবিত হয় বংশের দিকে।

পদতলে বসিয়া দেবী ঠাকুরমার মুখের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিয়া ফেলে, 'কি ভাবচো ঠাকু'মা?'

ঠাকুরমা বলেন, 'ভাবচি বিধাতা তোর কপালে লিখে দিয়েছে তুই রাণী হবি,—আমরা তার বাধ সেধে করবো কি বল্?'

উত্তরে এতটুকু মেয়ে দেবী যাহা বলিল, শুনিয়া ঠাকুরমার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না!

হাসিতে হাসিতে দেবী বলিল, 'রাণীর নাতিনী আমি, আমি রাণী হবো না, হবে ওই ঘুঁটে কুড়ুনীর মেয়ে! কিন্তু সে কথা থাক্ ঠাকু'মা, কুমার কি সত্যি আর আসবে না? আমার ভারী দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।'

দেখিতে ইচ্ছা ঠাকুরমার আরও বেশী করে। কিন্তু মনের সে আকাঙ্ক্ষা মিলাইয়া যায় একান্ত সঙ্গোপনে। বৃথাই আশা। পিণ্ডাধিকারী পৌত্র বংশের একমাত্র কুলপ্রদীপ কুমার আর আসিবে না। পাগল ছেলেটা তাহাকে বিলাইয়া দিয়া আসিয়াছে জন্মের মত একটা খেল্‌নার মতোই। কথাটা ভাবিতে বসিলে জাহ্নবীদেবীর শিথিল মনের কোণে সংসার পাতিবার যে ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে আবার তাহা যেন ফুৎকারে নিবিয়া যায়। একান্ত অসহায়ের মত শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন দেবীর পানে।

আবার দেবী প্রশ্ন করে, 'তুমি কি এত ভাব্‌চো বলো ত' ঠাকু'মা? তোমার এত হাসিঠাট্টা গেল কোথায়? কি ভাব্‌চো এত?'

জাহ্নবী দেবীর এত ভাবনার উত্তর তিনি এক কথায় কিইবা দিবেন, বালিকা হয়ত তাহা বুঝিবে না। ভাবিতে ভাবিতে হয়ত কোন সময় তাঁহার বিক্ষিপ্ত মন তলাইয়া যায় তিনপুরুষ আগেকার কালে, তাহাও মেয়েটা জানিতে পারে না।

তিনপুরুষ আগের এক জীর্ণ স্মৃতি ভাসিয়া উঠে পিতামহীর সংশয় ব্যাকুল মনের কোণে। যেকালে নিশীথের প্রপিতামহী লক্ষ্মীদেবী ছিলেন এই সম্পত্তি ও সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। যাঁর নামে একদা এই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং নাম হইয়াছিল লক্ষ্মীপুর। লক্ষ্মীদেবীর গর্ভে পর পর পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেও ততটা অনর্থের সৃষ্টি হইত না, একটি পুত্রের পর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া সেই অনর্থের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। মায়ের সম্পত্তির পুত্রকন্যা সমান অংশীদার এবং যাহা ইংরেজের আইনও মঞ্জুর করে, তাহা করেনা বাঙালীর মনের অন্ধ সংস্কার। তাই বুঝি একদিন লক্ষ্মীদেবী অতি নিভৃতে তাঁহার বাঁকা লেখার একটা হাতে মেয়েকে আট আনার অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া উইল-পত্র তুলিয়া দিলেন ছেলের হাতে।

ভাবিতে ভাবিতে জাহ্নবীদেবী জাগিয়া থাকিয়াই যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

দেখিতেছিলেন কোন্ এক অখ্যাত পল্লীগ্রামের এক ক্ষুদ্র গৃহকোণে দারিদ্র্যের সহস্র নির্য্যাতনে প্রপীড়িতা একটি নারীর মলিন বিষণ্ণ মুখ। নির্দ্দয় বিচারে বঞ্চিতা নারীর সে ঘন ঘন চাপা নিঃশ্বাস আজও যেন কান পাতিলে এই রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে শুনিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞাতসারেই একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিয়া জাহ্নবীদেবীকে সচেতন করিয়া তুলিল।

ঠাকুরমার এই ঘন ঘন ভাববিপর্য্যয়ে দেবী চমকিয়া উঠিল। উত্যক্ত হইয়া আবার সে প্রশ্ন করিল, 'বলো না ঠাকু'মা তোমার কি হয়েছে, কি ভাব্‌চো এত?'

জাহ্নবীদেবী তেমনি ভাবের ঘোরেই যেন বলিয়া উঠিলেন, 'ভাব্‌চি মেয়ে হয়ে মায়ের সম্পত্তি যে পেলে না,—সেই বংশের বধূ হয়ে কোন্ প্রাণে বাপের সম্পত্তি ছেলে থাকতে মেয়ের হাতে তুলে দেব?'

বুঝিয়াই হউক কিম্বা না বুঝিয়াই হউক দেবী বলিল, 'সে মেয়ে কে ঠাকু'মা? তাকে মেরে ফেলে দিতে পারো না?'

জাহ্নবীদেবী একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'ষাট্ ষাট্ অমন কথা বলিস্‌নে দেবী। আমার যত চুল তত তার পরমায়ু হোক্। সে যে রাণী হবে দিদিমণি,—সে যে তুই!'

'আমি?'

'হ্যাঁ দিদি তুই। তুই-ই আমার রাণী হবি দিদি।'

'আমি রাণী হবো না ঠাকু'মা, আমি রাণী হবো না, আমি রাণী হতে চাই না ঠাকু'মা। ভারী পাজি মেয়ে আমি। কেন জন্মেছিলাম বলো ত'? যদি বা জন্মেছিলাম, মেয়ে হয়ে কেন জন্মালাম? ভাইয়ের গ্রাস কেড়ে

নিতে চায় যে মেয়ে, তাকে টুক্রো টুক্রো ক'রে ভাসিয়ে দাও ওই যমুনার জলে।'

দেবীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া জাহ্নবী ঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন,—'থাম্ থাম্ —ওরে থাম্—তেরো বছরের এতটুকু মেয়ে, মুখ দিয়ে যেন আগুন ছোটে!'

স্নেহশীলা জাহ্নবীর অটলতার দম্ভ চূর্ণ হইয়া যায়। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত-সীমায় আসিয়া নিম্নগামী স্নেহ ভাঁটার টানে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চায় সংস্কারের চিরাগত দাবীদাওয়া। বিগলিত স্নেহ দুঃস্বপ্নের মত অন্তর মথিত করিয়া জাগাইয়া তোলে বিদ্রোহের সুর।

বলিয়া উঠেন, 'চলো দিদি, তোমার বাপের গদীতে আজ তোমাকে বসিয়ে দেবো। ভেঙে দেবো সব সংস্কারের কড়া বাঁধন।'

হতভম্বের মত দেবী তাকাইয়া থাকে এই শিক্ষিতা মহীয়সী পিতামহীর দিকে। দুর্বোধ্য সে সব কথা কিছু সে বোঝে, কিছু হয়ত বুঝিতে চেষ্টা করে, কিছু অস্পষ্ট ধোঁয়ার মধ্যে বোধশক্তি হারাইয়া ফেলে।

দেবী বলে, 'কি সব বলচো ঠাকু'মা, আজ তোমার হলো কি?'

'কিছু হয়নি দিদি। ভাব্‌চি, সত্যিইত' আমরা মেয়ে হয়ে মায়ের জাত হয়ে মেয়েদের প্রতি কত বড় অবিচার, কত বড় অধর্ম্মই না ক'রে আসছি! কিন্তু আর করবো না। চল্ যাই দেবী, তোর বাপের কাছে।'

বলিতে বলিতে ঠাকুরমা দেবীকে এক রকম টানিতে টানিতেই লইয়া চলিলেন নিশিথের ঘরের দিকে।

পাঁচ

শতবর্ষ পরে আবার মেয়ের হাতে লক্ষ্মীপুরের জমিদারী পরিচালনার ভার পড়িল। কিন্তু লক্ষ্মী দেবীর সে আমোল আর নাই। সেটা ছিল

একেবারেই অন্ধ সংস্কারের যুগ। প্রতিটি পদ গুনিয়া গুনিয়া চলিতে হইত তর্ক-চূড়ামণিদের শিরোমধ্যস্থ সুদীর্ঘ চৈতনগুচ্ছের অসামান্য মহিমায়। আজও সে মহিমা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই বটে; কিন্তু শ্লথ হইয়া আসিয়াছে তাহার উগ্রশক্তি।

যুগসন্ধির এই কালে দেবীর হাতে এত বড় জমিদারীটা তুলিয়া দিবার আগে উদারমনা বিদুষী পিতামহী তাহার শিক্ষাদীক্ষার ধারাটিও যথাসম্ভব বদলাইয়া দিলেন। শহর হইতে ফিরিঙ্গি মেমসাহেব আসিয়াছে দেবীর শিক্ষয়িত্রী হইয়া। দেবী তাহার কাছে ইংরাজী শেখে। জমিদার বাড়ির পঞ্চতীর্থ [illegible] হাতেও কিছু শিক্ষার ভার পড়িয়াছে। দেবী তাঁহার কাছে শেখে বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত।

এমনি করিয়াই অধ্যয়নের নিয়মিত সময় পার হইয়া গেল একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। মেধাবী মেয়ে সিদ্ধিলাভের প্রশংসাপত্রটাও অনায়াসেই আদায় করিয়া লইল।

তাহার পর একটা দীর্ঘ অবকাশের পর ঘটা করিয়া যৌবন আসিয়া একদিন তাহার পর্ব্বদিন ঘোষণা করিয়া বসিল। শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখিয়া পঞ্চতীর্থ দিন ধার্য্য করিলেন।

সমস্ত লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীশ্রী দেখিতে দেখিতে আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নগরের শোভা বদ্ধন করিতে পথে পথে তোরণ সজ্জিত হইল। লাল কাঁকর ফেলিয়া পথের রং বদলাইয়া দিল। পথের ধারে সারি সারি কদলী বৃক্ষের শোভা মঙ্গল অনুষ্ঠানের সূচনা করিল।

পুত্রের বিবাহে একদিন জাহ্নবী দেবী যেমন মহাড়ম্বরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন, আজও পৌত্রীর জীবনের প্রথম সংস্কারে তেমনি

রাজবাড়ির চিরাচরিত বনিয়াদী প্রথানুযায়ী প্রচুর ভোজ ও বিবিধ গীতবাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের তারিখ সন্নিকট হইয়া আসিল। আনন্দের প্রস্রবণে পরগণার লোক মাতিয়া উঠিল। সুসজ্জিত রাজপথগুলি অবিরাম জনস্রোতে থৈ থৈ করিতে লাগিল।

বিবাহের দিন প্রভাতে বেনারস হইতে আগত রোশনচৌকির দল রাজবাড়ির নহবতে বসিয়া প্রভাতী সুরে প্রথম মঙ্গলধ্বনি সূচনা করিল।

তাহার কিছুক্ষণ পরেই বরযাত্রীর দল আসিয়া পৌছিল। তাহারা আসিয়াছে বহুদূর হইতে আসিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের এক অখ্যাতনামা পল্লী হইতে। বরযাত্রীর বড় দলটির মধ্য হইতে বর খুঁজিয়া বাহির করিতে মোটেই ক্লেশ পাইতে হয় না। জনতার মধ্যেও ওই সুদর্শন যুবকটি তাহার সৌন্দর্য্য লুকাইয়া রাখিতে পারে না—এতই সে সুন্দর! কিন্তু জাহ্নবীদেবীর অনেক ক্লেশ পাইতে হইয়াছে এই বরটি খুঁজিয়া বাহির করিতে। প্রথমতঃ তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র। হোক্ দরিদ্র। ধনী কুটুম্বের উপর জাহ্নবীদেবীর আর স্পৃহা নাই। একমাত্র পুত্র নিশীথের বিবাহেই ধনী কুটুম্বিতার সখ তাঁহার মিটিয়া গেছে। এইবার তিনি প্রথম হইতেই পণ করিয়াছিলেন, প্রিয়তমা পৌত্রী দেবীর মনোমত সুপাত্র ধনীর ঘরেও যদি সুলভ হয়, তথাপি তিনি আর ভুল করিয়া ঐশ্বর্য্যের ফাঁদে পা বাড়াইবেন না। কিন্তু গরীব গৃহস্থ ঘরে দারিদ্র্যের বীভৎস চাপে সৌন্দর্য্যের সমস্ত রূপ ও রস যে শুকাইয়া এমন বিশীর্ণ হইয়া যায়—ইহা তাঁহার জানা থাকিলেও এমন প্রত্যক্ষভাবে তিনি ইতিপূর্ব্বে অনুভব করিতে পারেন নাই। মাসের পর মাস কাটিয়া গেছে, বৎসর ঘুরিয়া আসিয়াছে, উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের ঘরে ঘরে ঘটকের পদচিহ্ন পড়িয়াছে, তবু জাহ্নবী দেবীর মনোমত দেবীর বর মেলে নাই। অবশেষে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের চোদ্দরশি নামক এক অখ্যাত গ্রামের

কুলিনশ্রেষ্ঠ পীতাম্বর মুখুজ্যের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান মাণিকলাল দেবীর জন্য একমাত্র মনোনীত পাত্র বলিয়া স্থির হইল। সেই মাণিক যে সুন্দর হইবে — তাহাতে আর বিচিত্র কি! শুধু সে সৌন্দর্য্যের অধিকারীই নয়, বহুগুণে—গুণী এই মাণিক! খেলাধূলায় বিদ্যাবুদ্ধিতে নাকি সে অঞ্চলে তাহার জোড়া নাই। এই সবে মাত্র সে এম-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়া বসিয়াছে।

এমন যে মাণিক্য, তারি সঙ্গে আজ দেবীর বিবাহ।

দেখিতে দেখিতে গোধূলি সন্ধ্যায় বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে রাজপুরী মুখরিত হইয়া উঠিল।

বিবাহের লগ্নের আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। ছাঁদনাতলায় বর আসিয়া পৌছিয়াছে। চতুর্দ্দিকে ব্যস্ততার ধূম পড়িয়া গেছে; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কন্যাকর্ত্তা নিশীথকুমারের দেখা নাই; কথাটা জাহ্নবী দেবীর কানে যাইয়া পৌছিতেই তিনি শঙ্কিতপদে উপরে উঠিয়া গেলেন।

নির্জ্জন চিলেঘরে পাঠরত নিশীথ তখনো গ্রন্থের পাতা উল্টাইয়া নতুন অধ্যায়ের দিকে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে ব্যস্ত। এমন সময়ে জাহ্নবীদেবী ঘরে প্রবেশ করিয়াই পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আনন্দের এই বিপুলতার মধ্যেও একদৃষ্টে পুত্রের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মাতার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। কী হইয়া গেল ছেলেটা! বৌ কি সংসারে আর কাহারও মরে না! এ ত' ভালবাসার স্বাভাবিক রূপ নয়! এ যে অসাধারণ! হয়ত ইহা একরূপ ব্যাধি! ভূতগ্রস্ত মন তাহার কাহার ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে কে জানে! শঙ্কায় মাতার মন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু আর সময় নাই। বিবাহের লগ্ন আসন্ন। বিনা বাক্যব্যয়ে

জাহ্নবীদেবী নিশীথের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া নীচে বিবাহবাসরে পাঠাইয়া দিলেন।

নীচে নামিয়া আসিয়া যন্ত্রচালিতের মত নিশীথ কন্যার পিতার আসনে বসিয়া একান্ত সংযমের সঙ্গে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিল। কিন্তু ওইটুকুই যেন তাহার কাজ। সম্প্রদানের পালা শেষ করিয়াই সে পুনরায় যথাস্থানে চলিয়া গেল পারমার্থিক কিম্বা পারলৌকিক তত্ত্বের গভীর সন্ধানে!

দেবীরাণীর বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় দিনে কুশণ্ডিকাও একরূপ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। তাহার পর কোথা হইতে একটা দুর্লক্ষ্য বিপর্য্যয় আসিয়া নিষ্পন্নের সুরে বাধা জন্মাইল। দেখিতে দেখিতে হাস্যমুখরিত পুরীর চেহারাটা একেবারেই বদলাইয়া গেল! কিন্তু এমন যে কেন হইল, ইহা কেহ কল্পনা করিতে পারিল না!

কল্পনা করা যায়ও না। মানুষের দৃষ্টির লক্ষ্য যদি এত বিপুল ঐশ্বর্য্যের সমারোহে, দেবীর মত অসামান্য সুন্দরী-স্ত্রী লাভেও ভ্রষ্ট না হয়,—তাহা হইলে সে-মানুষের এই আকস্মিক পলায়নে মস্তিষ্কটি যে অবধারিতরূপে বিকৃত তাহাই প্রমাণ হয়। হইলও তাই।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই স্বয়ং বরকর্ত্তা বরযাত্রী সহ বিদায় লইয়াছে। রহিয়াছে শুধু মাণিক। তাহার ফিরিয়া যাইবার কথাও নয় প্রয়োজনও নাই—ইহাই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু ব্যবস্থার চাকা ঘুরিয়া গেল। শ্রীমান মাণিকলাল এই বৃহৎ পরিজনকে ধাঁধায় ফেলিয়া দিয়া কোথায় যে উধাও হইল—তাহা কেহই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত আনন্দ অবসাদে রূপান্তরিত হইল! দারুণ উৎকণ্ঠায় জাহ্নবীদেবী উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

দেবীর মনের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু মুখ দেখিলে ভয় হয়! এমন কেন হইল? সমগ্র [illegible] তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া অবশেষে

ঠাকুরমা তাহার জন্য কি এই সুপাত্র আনিয়াছিলেন? লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে দেবীর আর বাঁচিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু বৃদ্ধা পিতামহীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা কল্পনা করিয়া দেবী বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শেষ পর্য্যন্ত সংযম ভাসিয়া গেল।

লজ্জা স্ত্রীলোকের অঙ্গের ভূষণ; সেই ভূষণ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া দেবী জাহ্নবীদেবীর পদতলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। অশ্রুসিক্তনয়নে দেবী বলিতে লাগিল, 'ঠাকু'মা, এ কী হলো? আমার কি হবে ঠাকুরমা?'

জাহ্নবীদেবীর মুখ হইতে আর বাক্য সরিতে চায় না। অনেক কষ্টে তিনি দেবীকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'আমার মুখ যে বন্ধ হয়ে গেছে দিদি! এমন বেকুব জীবনে আমি হই নি! কি করবো আমি — তুই-ই বল্। আমার মাথায় কিছু আসচে না! আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখছি দিদি।'

দেবী বলিল, 'ঠাকু'মা মুখদৃষ্টির সময়ে আমার দিকে ভালো ক'রে চেয়ে পর্য্যন্ত ছাখেনি। অতটুকু সময়ের মধ্যে আমি যেন স্পষ্টই দেখতে পেলাম —ও-মুখে যেন কে কালী ঢেলে দিয়েছে! একটা অব্যক্ত বেদনার আভাস! কেন আমার দিকে চাইলে না ঠাকু'মা? আমি এতই কুৎসিৎ?'

'তোর মুখের দিকে হতভাগাটা যদি একবার চেয়ে দেখতে পারতো —তা হ'লে এমন কেলেঙ্কারী ক'রে সে কিছুতেই পালাতে পারতো না। ছি ছি কী লজ্জার কথা! তুই না পুরুষ মানুষ, উচ্চশিক্ষিত যুবক, এম-এ পরীক্ষা দিয়ে এসেছিস! তোর এই বুদ্ধি হলো! আমাকে শুদ্ধু ফাঁসিয়ে গেলি! আমি দশজনের কাছে মুখ দেখাবো কি ক'রে?'

'কিন্তু কি হবে ঠাকু'মা? আমাকে পাঠিয়ে দাও। আমি শ্বশুরবাড়ি যাবো। আমার মন বলচে ঠাকুরমা ওখানে গেলেই আমি তাঁকে পাবো।'

বিপদ যত বড়ই হউক, আত্মমর্য্যাদা হারাইয়া বসিবার মত মেয়ে জাহ্নবীদেবী নয়। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে বলিলেন, 'তা হয় না দিদি। এমনি ক'রে শ্বশুরবাড়ি যেতে তুমি পারো না। আমি সোমনাথকে ডেকে আজকেই চোদ্দরশি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সোমনাথবাবু এই পরিবারের একজন বিশিষ্ট হিতৈষী এবং সম্পত্তি পরিচালনায় সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা। তাঁহার দক্ষতার উপর [illegible] বিশ্বাসও যেমন আছে, তাঁহার সততার উপর আছে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সুতরাং এমন একটি সঙ্গিন কার্য্যের ভার দিয়া আর কাহাকেও পাঠানো চলে না।

সোমনাথবাবুকে ডাকিয়া জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'যেমন ক'রে হোক্ তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। লক্ষ্মীপুরের জমিদারীটাও যদি হারাতে হয় — তাতেও আমি সম্মত আছি সোমনাথ — তবু মাণিককে আমার চাই-ই। দিদির মুখের দিকে যে আমি আর চাইতে পারি না। তুমি বাবা মাণিকের হাতে ধরে বলবে, — শুধুমাত্র সাতটা দিন এসে আমাদের এখানে থাকবে, তার বেশী কিছু চাই না। তারপর তার যা ইচ্ছে সে করুক। সে ফিরে আসবে না এই সংবাদ পেলে আমি আর জলগ্রহণ করবো না, — এই কথাটা তাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে বোলো সোমনাথ। আর কিছু আমার বলবার নেই। তুমি বাবা আমার মুখ রেখো।'

মুখ সোমনাথ রাখি[illegible]লেন এবং আশ্চর্য্য ভাবেই রাখিয়াছিলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত রাজপুরীটা যেন গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। লজ্জায় মাণিক কোথায় যে পালাইবে ভাবিয়া উঠিতে পারি[illegible] না। কিন্তু অসংখ্য সতর্কদৃষ্টি হইতে এইবার আর পালাইবার পথ নাই। স্বয়ং জাহ্নবীদেবী অন্দর হইতে লোকের উপর লোক পাঠাইতেছেন মাণিককে

ভিতরে লইয়া যাইতে। কিন্তু এদিকে মাণিকের আড়ষ্টভাব কিছুতেই কাটিতে চায় না। সোমনাথবাবু তাহাকে একরূপ টানিতে টানিতেই ভিতরে লইয়া গেলেন।

জাহ্নবীদেবী উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিলেন মাণিকের প্রতীক্ষায়। সোমনাথবাবু মাণিককে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতেই জাহ্নবীদেবী দাঁড়াইয়া দুই বাহু বাড়াইয়া মাণিককে জড়াইয়া ধরিলেন।

আবেগ বিহ্বলকণ্ঠে জাহ্নবীদেবী মাণিককে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেই সোমনাথবাবু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওঁকে আর কিছু বলবেন না মা। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে যে কাণ্ড ক'রে ফেলেছে সেজন্য উনি নিজেই লজ্জিত। কিন্তু ওঁর নালিশটা একান্তই ওঁর নিজস্ব — তাই অনেক জেরা ক'রেও আমি জানতে পারিনি। হয়ত আপনারা পরে জানতে পারবেন। কিন্তু কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে, নইলে ওঁর মত বুদ্ধিমান শিক্ষিত ছেলে এমন একটা ছেলেমানুষি কাণ্ড কেন ক'রে বসলো!'

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'অভিমান আমাদের খুবই হতে পারে, তবু কিছু বলবো না। বিশেষ ক'রে তুমি যখন ফিরে এসেছো মাণিক তখন আর আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু থাকবে ত' মাণিক,—আমাদের কি দোষ হয়েছে জানতে পারলে—

অবশেষে মাণিক মুখ খুলিল। বলিল, 'আপনাদের তরফ থেকে আমার কিছুমাত্র নালিশ নেই। যা-কিছু আমার বাপ-মার তরফ থেকে; সুতরাং আমি ব্যক্ত করতে পারবো না।'

মাঝখান হইতে সোমনাথবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'বাবাজী সে কথা আমাকে গোপন করলেও সে আভাস কিছু যে পাইনি তা নয়! বাবাজীবন আমার সদ্য কালেজ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। রক্তটা গরম। তাই ব্যক্তিত্ব হারিয়ে নিজের জীবনটা পরের অনুগ্রহের তলায় সমর্পণ করতে

প্রস্তুত নয়। এই হলো মূল অভিযোগ। বোধকরি বাপ-মার সঙ্গে এই নিয়ে মনান্তরও হয়েছে। যাই হোক্ সে-সব নিয়ে আর কথায় প্রয়োজন নেই। তবে—

একটু থামিয়া সোমনাথবাবু জাহ্নবীদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, '— তবে বাবাজীকে কিন্তু মা সাত দিনের মেয়াদ দিয়ে নিয়ে এসেছি, বাকীটা পূরণ করবার ভার আপনাদের। তা হ'লে আমি এখন আসি মা, আসল জিনিষ আপনার হাতে হাতে বুঝিয়ে দিয়ে—এইবার আমি ছুটি চাই।'

'দাঁড়াও সোমনাথ।'

একটু দাঁড়াইতে বলিয়া জাহ্নবীদেবী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরিয়া আসিয়া সোমনাথবাবুর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'না করবার এতে কিছু নেই সোমনাথ, তা হ'লে বড় দুঃখ পাবো। তুমি যে জিনিষ আজ আমায় ফিরিয়ে দিয়েছো, তার তুলনায় এ কিছুই নয়!'

বলিয়াই জাহ্নবীঠাকুরাণী সোনার একটা মূল্যবান দশলহরী হার সোমনাথবাবুর সঙ্কুচিত হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিলেন।

'কিন্তু বড়ই লজ্জা পেলাম মা, তবু আপনার দেয়া জিনিষ মাথায় তুলে নিলাম।'

বলিয়া সোমনাথবাবু ধীর মন্থর পদক্ষেপে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

জাহ্নবীদেবী তখন মাণিকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তা হ'লে মাত্র সাত দিন! এই কি তোমার শেষ কথা মাণিক?'

মাণিক বলিল, 'আপনি অন্নজল ত্যাগ করবেন শুনে শুধু এই ভয়ে আমি ফিরে এসেছি ঠাকু'মা। নইলে আমি আসতাম কিনা সন্দেহ।'

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'এই কথা তুমি বলতে পারলে মাণিক? তুমি নাকি একজন বিদ্যাদিগ্‌গজ? এত নামডাকের এই নাকি তোমার

পরিচয়? আসতে পারতে কিনা! আমার চিন্তাটাই তোমার বেশী হলো? আর একটি মেয়ের জীবন-মরণ তোমার হাতে—তা কি তুমি ভুলে গেছো?'

'আজ আমায় মাপ করবেন ঠাকু'মা। বড়ই শ্রান্ত আজ আমি। আর একদিন আপনাকে আমার মনের কথা সব খুলে বলবো।'

'কিন্তু তোমার মেয়াদটা শুনতে পেলে রাত্রে একটু সুনিদ্রা হতো।'

'একবার ত' বলেইছি।'

'ধনুর্ভঙ্গ পণ দেখ্‌ছি। কিন্তু রাখতে পারবে কি জামাইবাবু? আমার নাত্‌নীটিকে একবার ভালো ক'রে চেয়েও ত' দ্যাখোনি। কিন্তু একবার যদি দ্যাখো, তা হ'লে কিন্তু—

বাধা দিয়া সহাস্যে মাণিক উত্তর দিল, 'বেশ একবার দেখেই যদি আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ ভঙ্গ হয় ত' হোক্‌। বিনিময়ে তা হ'লে নিশ্চয়ই একটা অসম্ভব বস্তু লাভ হবে। কিন্তু ঠাকু'মা আমি বড় লোভী। আপনাদের ওই সোনাদানা জহরতে কিন্তু আমার পেট ভরবে না।'

অন্তরাল হইতে অকস্মাৎ তীব্র ও মধুরকণ্ঠে জবাব আসিল, 'বয়সের দম্ভটা এখনো টাট্‌কা! তাই মানুষকে দশের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে ওঁদের জুড়ি মেলে না ঠাকু'মা। আর সত্যিকারের লোভীদের সোনাদানা জহরতে যে পেট ভরে না—সে আমার জানা আছে ঠাকু'মা,— সে কথাটাও তুমি জানিয়ে দিও।'

মাণিক অকস্মাৎ যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। শ্লেষবাক্যের অন্তরালে বুদ্ধির প্রখরতা তাহাকে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা নাড়া দিয়া গেল।

ঠাকুরমা জাহ্নবীদেবী গদগদ কণ্ঠে হাসিয়া কহিলেন, 'শুনলে মাণিকবাবু? বোধকরি এইটুকুতেই বুঝতে পারচো যে তোমার সাতদিনের মেয়াদের মাত্রা বাড়িয়ে দিতেই হবে।'

মাণিক নিরুত্তরে তখনো ওই গুটিকয়েক কথাই মনে মনে আলোচনা করিতেছিল।

আদর্শবাদের একটা দমকা বাতাসে মাণিকের মস্তিষ্কটি যেভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল — যুবধর্ম্মের খেয়ালের মধ্যেই তাহার সমাধি ঘটিল। রহিয়া গেল শুধু একটা আকস্মিকতার বিপন্ন সুর। এই সুরের মধ্যেই ব্যক্তিত্ব ফিরাইয়া পাইবার যা-কিছু সম্ভাবনা রহিল। কিন্তু বর্ত্তমানে মাণিকের দিক হইতে আর কোনরূপ শঙ্কার কারণ দেখা যায় না। সাতদিনের মেয়াদ বাড়িয়া গিয়া আরও বহু সাতদিন কাটিয়া গেছে; কিন্তু মাণিক তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে নাই।

জাহ্নবীদেবী বিজয়গর্ব্বে মাঝে মাঝে মাণিকের দিকে অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে।

তাহার উত্তরে মাণিকও হাসিয়াই বলে, 'হার ত' মেনেইছি, আর কাটা-ঘায়ে নূনের ছিটে দিয়ে কি লাভ? বড়ো লজ্জা পাই।'

ঠাকুরমা মুখে কিছু বলেন না। শুধুমাত্র আর একবার হাসিয়া মাণিককে পুনরায় একটু লজ্জিত করিয়া দিয়া নীরবে চলিয়া যায়।

পারিবারিক যে অশান্তির সূচনা হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ এমনি করিয়াই দূর হইয়া গেল।

সাময়িক উত্তেজনার হাত হইতে জাহ্নবীদেবী নিশ্চিন্ত হইলেন বটে; কিন্তু বিষয় বাসনা ও সংসার হইতে তিনি নিজেও কোনদিন ছুটি চান নাই, তাই বুঝি সংসারও তাঁহাকে ছুটি দিতে চায় না।

কাজ না থাকিলেও অকাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া কাজের সৃষ্টি করিয়া লইতে পারিলে কাজের অভাব সত্যই হয় না।

জাহ্নবীদেবীর পূজার ঘরটাই হইল বৈষয়িক গবেষণাগার। ওইখান হইতেই যতকিছু কর্ম্মতৎপরতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাই বুঝি রুষ্ট দেবতা কাজের চাপে বৃদ্ধাকে নিঃশ্বাস ফেলিতে অবসর দেন না। এক কাজ শেষ না হইতেই আর এক দায়িত্ব ঘাড়ে আসিয়া নেশার মত চাপিয়া বসে। সেটাকে শেষ না করা পর্য্যন্ত জাহ্নবীদেবীর দিনে পূজার ব্যাঘাত ঘটে, রাত্রে নিদ্রা আসে না। এই তাঁর স্বভাব।

এই স্বভাবের জোরেই অনেক সময় তিনি বড় বিপদকেও সহজে সহ্য করিতে পারিতেন, আর সেই গুণেই বোধকরি সংসার আজও একমাত্র পুত্রের নিষ্কর্ম্মা উদাসীনতায় ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই।

সেই যে বিবাহ হইয়া গেছে, তাহার পর মাসাধিককাল উত্তীর্ণ হইতে চলিল, তথাপি নিশীথ একবার নীচে নামিয়া আসিয়া নূতন কন্যাজামাতার সঙ্গে বসিয়া দু'দণ্ড গল্প করিতেও পারে নাই! বিবাহের পর জাহ্নবীদেবীর কত উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়াছে, তাহারই বা খোঁজ কে রাখে,— নবপরিনীত জামাতা বিবাহের অব্যবহিত পরেই উধাও হইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল— তাহাও বোধকরি অদ্যাবধি তাহার কানে যায় নাই!

নিশীথের এই বধিরতা যে আর ভাঙিবে না,— ইহা জাহ্নবী দেবী নিশ্চিতভাবেই বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি এখন কোন কাজেই আর পুত্রের সম্মতির অপেক্ষায় থাকেন না।

কিন্তু এমন একটি গুরুতর কাজ আজও বাকী আছে যাহা শুধু নিশীথের সম্মতির প্রতীক্ষাই রাখে না, বাস্তবক্ষেত্রে তাহার উপযুক্ত সহায়তারও প্রয়োজন। জাহ্নবীদেবী সেই কথাই কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়া

ভাবিয়া আজ নিশীথের ঘরের দিকে পা বাড়াইলেন। লোকটার শ্রান্তি নাই! তেমনি করিয়াই সে আজও গ্রন্থের দিকে ঝুঁকিয়া আছে। একান্ত সে নীরব; গবেষণার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল মাতার বৈষয়িক নীরস ধ্বনি।

মা বলিলেন, 'ও নিশীথ শুন্‌চিস্‌?'

শ্রবণশক্তি নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছে উপনিষদের জটিল শব্দগুলির মধ্যে। তাই মাতার সু-উচ্চারিত সে-ডাকও সে শুনিল না।

জাহ্নবীদেবী আবার বলিয়া উঠিলেন, 'তোকে ভূতে পেলো না কি নিশীথ! কানের কাছে বোমা ফেটে পড়লেও যে শুনতে পাস্‌ না! ওরে শুন্‌চিস্‌— ?'

শ্রবণইন্দ্রিয়ের দয়ায় এইবার সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইল, — দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে জন্মদাত্রী জননী জাহ্নবী।

বলিল, 'এই যে মা তুমি!'

'হ্যাঁ বাবা, মা আমি। অমন করে চমকে উঠ্‌লি যে! আমি যে মা, তা কি তুই আজ জান্‌লি? কিন্তু এমন করলে আমি এবার সত্যিই কাশী চলে যাবো নিশীথ।'

'না না তুমি যাবে কেন? বলো তুমি কি বলতে এসেছো?'

'বলতে এসেছি, মেয়ে বিয়ের এত বড় ঝঞ্ঝাটা তুই ত' এই ঘরে বসেই মিটিয়ে দিলি; কিন্তু আর কি কোন কাজ নেই?'

'কি কাজ বলো। মেয়ে বিয়ের কাজ ত' নির্ব্বিঘ্নেই সাঙ্গ হয়েছে। যার ঘরে এমন মা তার আবার চিন্তা কিসের মা?'

'ও কথায় আর আমি তুষ্ট হচ্ছি না বাবা। চিন্তার ঢের জিনিষ আছে,—কোন্‌ অচিন্ত্য চিন্তায় তুমি বিভোর হয়ে আছো বাবা, সে তুমিই জানো। মা তোমার মেয়েমানুষ, সব কাজ তাকে দিয়ে চলে না। বলি, মেয়েটাকে কিছু লিখেপড়ে দিতে হবে, না কি?'

নিশীথ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'তাই তো, বস্তুতন্ত্রের যুগে ওটা যে একটা মস্তো বড় প্রয়োজনীয় কথা, তা শ্রেফ্ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু উইল নয়, একেবারে দানপত্র, হ্যাঁ মা দানপত্র। আমি বেঁচে থাকতেই ওর হাতে তুলে দিয়ে যাবো মা।'

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'বেশ ভালো কথা। যত শীঘ্র পার সেই ব্যবস্থাই ক'রে দাও।'

নিশীথ বলিল, 'কিন্তু—কিন্তু —?

'আবার কিন্তু! আমি এখন মেয়েমানুষ হয়ে ছুটি তোর এটর্নির বাড়ি, না?'

'তাই তো, তাও তো হতে পারে না। এক কাজ করো মা সোমনাথবাবুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

'এ সব কাজ নায়েব গোমস্তা দিয়ে চলে না নিশীথ। তোমার নিজে করতে হবে।'

'কিন্তু আমি নিজে করলে সেটা শিগ্‌গীর হয়ে উঠবে কিনা, কি আদৌ হয়ে উঠবে না—সেই আমার ভয়।'

'সে ভয় কিছুদিনের জন্য তোমার মুলতুবী রাখতেই হবে। যখন দিলেই মেয়েটাকে দায়মুক্ত ক'রে দাও।'

'আচ্ছা তাই দেবো।'

বলিয়া নিশীথ পড়িতে আরম্ভ করিল :

না জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি —
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো।—
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

(কঠোপনিষদ্)

ছয়

নিশীথের ভয় মিথ্যা হইল না। যদিও প্রাণের একান্ত ইচ্ছা ছিল, নিষ্কণ্টক অব্যাহত নির্ব্যূঢ়-স্বত্বে সে তাহার বিত্তবৈভব যাহা আছে সবই মেয়ের হাতে তুলিয়া দিবে; কিন্তু লোকটা অকালে অথর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। উদ্‌ভ্রান্ত মন মনের প্রবল ইচ্ছাকেও বারম্বার হারাইয়া ফেলিয়াছে বিস্মরণের মধ্যে।

কিন্তু মাতার তাগিদে উদ্‌ব্যস্ত হইয়া একদিন সে সোমনাথবাবুকে ডাকিয়া গোপনে সব বলিয়াও দিয়াছিল। উকীলের দপ্তরখানা হইতে দানপত্রের মুসাবিদা দলিলপত্র সবই যথাসময়ে আসিয়াছিল। শুধুমাত্র বাকী ছিল কমিশনস্বরূপ রেজিষ্ট্রার সাহেবের উপস্থিতিটা এবং তারি সুমুখে একটি মাত্র দস্তখৎ।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ভবিতব্য আসিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পূর্ব্বেই একদিন সায়ংকালে গৃহদেবতার সান্ধ্য-আরতির সঙ্গে সঙ্গে সংসার বাসনাত্যাগী নিশীথ সন্ন্যাস রোগে আধঘণ্টার মধ্যেই দেহত্যাগ করিয়া একটা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করিল।

*

বুকফাটা আর্ত্তনাদ কর্ত্তব্যের চাপে দুইদিনের মধ্যেই মিলাইয়া যায়। আর্ত্তনাদ থামিলেও সাতটা দিন যে শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া শোক করিবে তাহারও উপায় নাই। এমনই কঠিন কর্ত্তব্য। রাত্রে নিদ্রা আসে না, মাঝে মাঝে তন্দ্রায় ঢলিয়া পড়েন, আবার তন্দ্রা ছুটিয়া যায়। উচ্ছ্বসিত শোকের মাঝে তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠে চিন্তার উত্তপ্ত প্রতিচ্ছবি। এ কী হইল! একে একমাত্র পুত্রের বিয়োগব্যথা।

তাঁহার উপর বৈষয়িক জঞ্জালের একটা নিদারুণ পরীক্ষা। মেয়েটার মুখ হইতে আশার গ্রাস কাড়িয়া লইলে যে কুম্ভীপাকে পড়িয়াও তাঁহার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না!

এই ভয়েই জাহ্নবী ঠাকুরাণীকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল। যে কুমারের জন্য একদা তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—আজ সেই একরত্তি ছেলেটা যেন তাঁহাকে দুঃস্বপ্নের জাতাকলে ফেলিয়া মারিতে চায়! বম্বে হইতে কি সংবাদ আসিবে কে জানে?

কিন্তু দেবীর ভাগ্য ভালো। সংবাদ যাহা আসিল তাহাও ভালো। সোমনাথবাবু বম্বে হইতে ফিরিয়া আসিয়া জাহ্নবীদেবীর চরণধূলা লইয়া বলিলেন, 'সস্ত্রীক রায়সাহেব কুমারকে নিয়ে আজ এক বছর হলো বিলেত চলে গেছেন। মালাবার হিলের বাড়িতে খবর নিয়ে জানলাম, তাঁরা কবে ফিরবেন কিছুই স্থির নেই।'

অবসাদ খিন্নকণ্ঠে জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'সোমনাথ তুমি বাবা আইন-টাইন ভালো জানো, ষ্টেটের বিশ্বাসী লোক,—এ অবস্থায় কি করবো বাবা তুমিই বলে দাও। আমার মাথার ঠিক নেই।'

সোমনাথবাবু বলিলেন, 'অনর্থক চিন্তা ক'রে মা দেহ নষ্ট করবেন না। যে গেছে তাঁকে ত' ফিরে পাবেন না।'

'নিশ্চয়ই না। সে কথা আমার চেয়ে বেশী জানে কে? আমি মা হয়েও একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে প্রাণখুলে কাঁদবার সময় পেলাম না। আমি বড় ভাগ্যবতী সোমনাথ—সে কথা বোলো না। এখন মেয়েটার কি গতি করবে তাই বলো।'

সোমনাথবাবু কহিলেন, 'সে সমস্যাও মিটে যাবে মা। কর্ত্তাবাবু যে দানপত্র শেষ ক'রে যেতে পারেন নি, এ খবর ত' কেউ জানে না। একমাত্র আমি আর আপনি। কর্ত্তার মৃত্যুর পর দেবীরাণীই যে সব পাবেন এই

কথাই পরগণার লোক শুনে আসচে। লেখাপড়ার দিক দিয়ে একটা কিছু পাকা কাজ তিনি নিশ্চয়ই ক'রে গেছেন, এও মানুষ ভেবে বসে আছে। সুতরাং নিশ্চিন্তমনে দেবীরাণীর নামে নামজারি ক'রে ফেলবার হুকুমটা আপনি আমাকে দিন, আমি কাজটা যত শীঘ্র পারি শেষ ক'রে ফেলবো।'

দ্বিধাজড়িতকণ্ঠে জাহ্নবীঠাকুরাণী বলিলেন, 'অনুমতি ত' দেবো সোমনাথ, তার পরে যে কী হবে—সেই ত' ভেবে আমি কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে! বাবা লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মনে কি আছে কে জানে? মানুষের যে কিছু হাত নেই—তা ত' দেখতেই পেলে'।

জাহ্নবীদেবীর দ্বৈধভাবটা তখনো একেবারে মুছিয়া যায় নাই বুঝিয়া লইয়া সোমনাথবাবু আবার বলিলেন, 'আপনি মিছেই চিন্তা করছেন মা। আমি বলছি আপনি শুনুন—এ ব্যবস্থায় কোনরূপ উদ্বেগের কারণই নেই! কারণ রায়সাহেবও সবিশেষ জানেন, কর্ত্তাবাবুর মনের ইচ্ছাটা কি ছিল। আমাদের এখান হতে দুঃসম্বাদটা জানিয়ে যে তার করেছিলাম, বম্বে থেকেই শুনে এসেছি সে তার ওরা বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সুতরাং রায়সাহেব খবর পেয়েছেন। কুমারের তরফ থেকে কোন দাবী এলে এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই আসতো।'

জাহ্নবীদেবী অনেকক্ষণ পর যেন একটা উৎকট চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া বলিলেন, 'ঠিক বলছো সোমনাথ, ব্যাপারটা আমি জানি বলেই শুধু ভয় পাচ্ছি। তা ছাড়া রায়সাহেবের অত বড় সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ কুমার। আমাদের যা-কিছু রায়সাহেবের তুলনায় নাকি সামান্যই। তাই যদি হয় অত বড় লোভটা ছেড়ে যে কুমার এরই জন্যে আবার কোন দিন ফিরে আসবে আমার ত' মনে হয় না।'

বিষয় বাসনার বাকবিতণ্ডা একবার আরম্ভ হইলে সহজে শেষ হইতে চায় না। জাহ্নবীদেবী ও সোমনাথবাবুর সঙ্গে এই গুরুতর পরামর্শ কতক্ষণ

চলিয়াছিল জানি না। তবে সোমনাথবাবুর সমীচীনতায় যাহা স্থির হইল—তাহাতে দেবীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের যে সূচনা হইয়া উঠিয়াছিল—তাহা কাটিয়া গেল একান্ত নিশ্চিন্ততার মধ্যেই।

সাত

অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যে জাতটাকে আমরা হেলায় সরাইয়া রাখি শুধুমাত্র ভাঁড়ারের চাবিগুচ্ছ ও রন্ধনশালার দায়িত্ব দিয়া কিম্বা পতিসেবা ও সন্তানপালনের গুরুভার চাপাইয়া—সেই জাতেরই মেয়ে দেবী পিতার শূন্যস্থানে বসিয়া অতগুলি পুরুষের চক্ষে যেন ধূলা উড়াইয়া চলিতে চায়!

নিরঞ্জন সরকার গোমস্তা যাহারা হাত পাকাইয়া ফেলিয়াছে জমিদারী সেরেস্তার উপরিপ্রাপ্তির ঘৃণিত ব্যবসায়, তাহারা একটা মেয়ের হাতে জমিদারী পরিচালনার ভার পড়ায় অপরিমিত আনন্দে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া একদিন আকাশের চাঁদটাকেই হাতের মুঠোর মধ্যে ধরিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, তাহারাই আবার একদিন পৌরুষের মিথ্যা গর্ব্ব লইয়া মাটির ভাণ্ডের মতই ভাঙ্গিয়া পড়িল মাটিতে।

[illegible]তে ওস্তাদ মুন্সিয়ানার সুচতুর পাকামুন্সি কামিক্ষ্যে সমাদ্দার নাকের ডগায় সুতার-বাঁধা বৈক্লব্যদশায় উপনীত চশমাজোড়া স্থাপন করিয়া মনের কথা আর গোপন না করিয়া সহকর্ম্মী [illegible]কে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিয়াই ফেলিল। বলিল, 'ওহে পাঁচু এবার তোমার [illegible]সামাল করো, তারপর আমার মাথা। বলি, শুনেছো ত'?'

পাঁচুগোপাল শুনিয়াছে। কিন্তু ধড়িবাজিতে সে সমাদ্দারের চেয়ে আরও ওস্তাদ।

বলিল, 'কিছু না। তবে সোমনাথবাবুকে একবার বলতে শুনেছিলাম। — 'মেয়ে বটে! আমার মত লোককেও তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে।' কিন্তু ব্যাপার কি হে সমাদ্দার?'

সমাদ্দার বলিল, 'দাসমশায়ের দেওয়ানগিরি ত' খতম হলোই, খাজাঞ্চিগিরি ক'রে নিজের খাজাঞ্চিখানায় যা জমিয়েছিল এবার তাও গেল। একেবারে বিশহাজার টাকার তবিল তশ্রূপের দায়ে পড়ে গেছে চাঁদ। এবার বাবা শ্রীঘর ঠেকায় কে?'

'বলো কি সমাদ্দার! বি-শ হা-জা-র!!'

সমাদ্দার বলিল, 'চমকাও কেন পাঁচুবাবু? মাটির নীচে তুমিও যা পুঁতে রেখেছো, তার চেয়ে ত' এখনো কিছু কম আছে।'

সে কথার উত্তর না দিয়া পাঁচুগোপাল শুধু বলিল, 'কিন্তু ধরলে কি ক'রে? সাবাস্ মেয়ে ত, সমাদ্দার!'

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সমাদ্দার বলিল, 'এ বাবা সে জাতের মেয়ে নয়, যারা চুরির ঠুন্ ঠুন্ বাজনা বাজিয়ে পুরুষের মন গলাতে আসে। এ বাবা বাঘিনী। জমিদারের মেয়ে। মেমের কাছে ইংরেজী শিখেছে, পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিখেছে, বাঙালীর কাছে বাঙলা শিখেছে। আর এই তিন বছর ওই বুড়ো সোমনাথের কাছে যা শিখেছে তারি ধাক্কা সামলাও এইবার! কিন্তু ভাবেসাবে যা মনে হচ্ছে — যেতে হবে একদিন তোমারও আমারও। কিন্তু যাই কোথা? মনিবের যে দু'টি চক্ষু! চক্ষু ত' নয়—যেন দ[illegible]ান?'

অজস্র বৈগুণ্য দোষে দুষ্ট এই পাঁচুগোপাল। সুতরাং ভয়টা কানিক্কো সমাদ্দারের চেয়েও তাহার বেশী। কিন্তু পাকা লোক ভয় পাইলেও তাহা সহজে প্রকাশ করিতে রাজি নহে।

পাঁচুগোপাল বলিল, 'তা বটে, দুরবীনই বটে। কিন্তু অনুবীক্ষণ ওই চোখের তারা দু'টি এবার যেন তোমার দিকেই লক্ষ্য ক'রে বসে আছে। হাত টানটা তোমার সকলের চেয়ে বেশী, একথা কাছারির লোক কে না জানে? আসল কথাটা কিন্তু সমাদ্দার তুমি এখন পর্য্যন্ত শোনইনি। সোমনাথবাবু আইন যতই জানুক, লোকটি সাদাসিদে। তাঁকে দিয়ে জমিদারীর কাজ যে আর চলে না — এটা ঠাকুরাণী বেশ বুঝেছেন। তাই কলকাতা হতে সাহেব ম্যানেজার আসছে। বুঝলে সমাদ্দার চুরিটুরি আর চলছে না। এবার থেকে একটু সাবধান মত কাজকর্ম্ম করো। ভয় ভাবনা তোমারি ত'.বেশী।'

সমস্ত ভাবনা ছাপাইয়া উঠিয়াছে ত্রাহি ত্রাহি ডাক। নায়েব গোমস্তা ইজারদার তহশিলদার চাকলাদার সর্দার মির্দ্দা সকলের মুখে মুখে কথাটা পল্লবিত হইয়া চতুর্দ্দিকেই ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই ভাবিল দেবীরাণীর জমিদারীতে এখন হইতে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইবে।

কিন্তু সে ভুল একদিন তাহাদের সকলেরই ভাঙিয়াছিল,—যেদিন দেবীরাণীর দুইটি রক্তচক্ষু শুধুমাত্র অগ্নিকণাই ছড়াইয়া দেয় নাই, শান্তস্নিগ্ধ দুইটি সজল চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া স্নেহ অনুকম্পা বিলাইয়া দিয়াছে অকাতরে।

* *

*

ডেভিস সাহেব যেদিন ম্যানেজারের পদে বহাল হইল, সেদিন সকলেই বুঝিয়াছিল সোমনাথবাবুর ইস্তফা লইতে আর বিলম্ব নাই।

কিন্তু দেবীরাণী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এইবার হতে আপনি ষ্টেটের ম্যানেজার নন্, আমার কাকাবাবু। আপনার মাসিক দক্ষিণার যে বরাদ্দ ছিল, আজ থেকে তা কিছু বাড়বেই, কমবে না।'

সোমনাথবাবু আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিলেন, 'দক্ষিণার বরাদ্দটা যদি একেবারেই না থাকতো, তা হ'লেও কি আমাকে তাড়াতে পারতে মা? আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি তোমার ভবিষ্যতের কীর্ত্তি-উজ্জ্বল দিনগুলো। তা শুধু কানেই শুনে যাবো মা, দেখে যাবো না?'

দেবী সোমনাথবাবুর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, 'আশীর্ব্বাদ করবেন কাকাবাবু। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তাই যেন হয়। পূর্ব্বপুরুষের নামটা যেন রেখে যেতে পারি।'

'শুধু তাদের নামটাই থাকবে না মা, আমি ভবিষ্যৎবাণী ক'রে যাচ্ছি, তোমার কীর্ত্তি বজায় থাকবে অধস্তন সাতপুরুষ পর্য্যন্ত।'

'আমার নয় কাকাবাবু। আপনাদের সেই বুড়ো মা জাহ্নবীদেবীর। আমি শুধু উপলক্ষ্য।'

'না মা, আমার চোখে ফাঁকি দিতে পারবে না। দু'টি চক্ষু আমার আজো অন্ধ হয়নি। তোমার ওই খাজাঞ্চী দাসমশাই ফাঁকি দিতে পেরেছে, কারণ ওটা ফাঁকিরই জিনিষ। কিন্তু তোমার······

বিবেক বুদ্ধি যাহাদের আছে, তাহারাও হয়ত আত্মপ্রশংসা শুনিতে ভালই বাসে; কিন্তু চক্ষুলজ্জা আসিয়া মাঝে মাঝে শ্রবণশক্তির সঙ্গে একটা মৃদু কলহ বাঁধাইয়া শোনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া তোলে। দেবীরাণীর অবস্থাটাও হইল সেইরূপ। বাধা দিয়া দেবী বলিল, 'ও কথা থাক্ কাকাবাবু। কিন্তু দাসের সমস্ত অপরাধ আমি মাপ ক'রে দিতে পারতাম, অন্ততঃ একটা নজির থাক এই ভেবে দিলাম না। ওটা ওদের পক্ষে একটা শান্-দেয়া অস্ত্র হয়ে রইলো।'

সোমনাথবাবু কৌতূহলবশতঃ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'আর সবাই, যাদের বিরুদ্ধেও আমাকে অভিযোগ জানিয়েছো, তাদের—?'

'তাঁদের সবাইকে আমি আজও চিনিনে কাকাবাবু। তবে আজ না হয়, কাল তাদের চিনবো। পাঁচুগোপাল, কামিক্ষ্যে সমাদ্দার, প্রফুল্ল চক্র সবাই দাসের দলের — সে আমি টের পেয়েছি ; কিন্তু ওদের সবাইকেই যদি আমি তাড়িয়ে দিই, কাজ চালাবো কাদের নিয়ে ? মানুষ ত' আমি তৈরী করতে পারবো না কাকাবাবু। বেশী মাইনে দিয়ে একটা সাদা লোকই না হয় নিয়ে এলাম শুধুমাত্র গুণের তারিফ ক'রে। কিন্তু গুণের আদর করতে গিয়ে নিজের সর্ব্বনাশও করতে পারি না, — আর আমাদের দেশের লোকগুলোকেও ত' অমানুষ ক'রে রাখা চলে না ! আপনিই বলুন, চলে ?'

'চলে না মানি ; কিন্তু এরা বড়ই নেমকহারাম। জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না, ওদেরও একটা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে,—নেই আমাদের এই বাঙ্গালী জাতির !'

'কিন্তু ওদেরি বা দোষ দেব কি ক'রে বলুন ? আমরাই যে ওদের বলে দিই, — বাপুহে পাঁচটাকা মাইনে দেব, বাকীটা কিন্তু পুষিয়ে নেবে। এই পুষিয়ে নেওয়ার অর্থ তারাও বোঝে, আমরাও জানি। এত বড় নৈতিক অধঃপতনকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আমি ভেবে অবাক হই আপনার মত প্রবীণ লোকের চোখে ধুলো দিয়ে ওরা দশবছর ধরে এই উঞ্ছবৃত্তি চালিয়ে এসেছে কি ক'রে ?'

সোমনাথবাবু লজ্জায় মুখ নামাইয়া লইয়া বলিলেন, 'সেই জন্যই ত' মা তুমি আমায় কাকাবাবুর পদে বহাল করেছো। এটা তুমি ঠিকই বুঝেছো যে এই সেকেলে বুড়োটাকে দিয়ে আর যাই চলুক, ম্যানেজারি করানো আর চলবে না।'

একটু থামিয়া সোমনাথবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহ'লে ওদের একটু আশাভরসা দিই, কি বল? বেচারীদের ভয়ে ভয়ে দিন কাটছে, কার কখন চাকরি যায়।'

স্মিতহাস্যে দেবীরাণী বলিল, 'আরও কিছু দিন যাক্। ভয় ভাঙলে শাসন করবো কাকে? ওঁরা সবাই থাকবে, কাউকে আর আমি তাড়াবো না। মাইনে বাড়িয়ে দেবেন, সাহেবের খবরদারিতে ছেড়ে দেবেন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হইলও তাই। বিদেশী লোকটার দেহের ওই পীতাভ ও কটাচক্ষুর অগ্নিময় দৃষ্টি সাধারণের মনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করিয়া তুলিল। ষ্টেটের কার্য্যপরিচালনার ধারা আমূল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া শৃঙ্খলার একটা নিয়মবদ্ধ রীতিতে চলিতে লাগিল।

বড় হলঘরটি দেবীরাণীর দরবার কক্ষে পরিণত হইল।

মস্ত বড় হলঘর। ঘর জোড়া লাল নীল বেগ্‌নী রংয়ের ফুল আঁকা বিলাতী কার্পেট। চারদিকের দেয়ালে মস্ত বড় বড় আয়না। সোনার গিল্টি করা সেগুলির চওড়া ফ্রেম্। তলায় কালোপাথরের প্রত্যেকটি টেবিলের দুই পাশে পরীমূর্ত্তির বাতিদান। টেবিলের মাঝখানে কোনটায় সোনার জলে আঁকা কালো পাথরের ঘড়ি, কোনটায় কাচের আবরণের মধ্যে চীনামাটির নানা ঢংয়ের পুতুল। দেয়ালের গায়ে পূর্ব্বপুরুষদের বড় বড় অয়েলপেন্টিং। মাঝখানে একটা বিশাল ইটালিয়ান মার্ব্বেলপাথরের রাউণ্ড টেবিল। টেবিল ঘিরে অসংখ্য দামী সোফা। কড়িতে ঝুলিতেছে ঝাড় লণ্ঠন। সমস্তই আবরণীতে ঢাকা। এ সমস্তই দৈনন্দিন ব্যবহারের

সম্পর্ক-বঞ্চিত। বিশেষ উৎসব কিম্বা জিলার সাহেব-সুবাদের আগমনে এসবের অবগুণ্ঠন মোচন হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিলাতী আসবাবে সজ্জিত এই বড় হলঘরটায় দেবীরাণী সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি দিন গিয়া বসিত। তাহার পাশে বসিতেন সোমনাথবাবু। মাঝখানে থাকিত চিকের আব্রু। চিকের ওপাড়ে বসিতেন ডেভিস সাহেব ও নথীপত্র হাতে সরকার গোমস্তা। তাহাদের দুই পাশে দণ্ডায়মান দুইটি সশস্ত্র ভোজপুরী সেপাই, জনকয়েক মুসলমান লাঠিয়াল ও দুইজন তক্‌মাপরা আরদালি। সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সব বিচারপ্রার্থী প্রজার দল।

বিচার চলিতে থাকে। সকলেই দেবীর কণ্ঠনিঃসৃত বাণী শুনিতে পায়; কিন্তু দেখিতে পায় না — ওই দেবীমূর্ত্তি। সসম্ভ্রম অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লইয়া সে মূর্ত্তি থাকিত চিকের অন্তরালে।

এমনি সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মে দেবীরাণীর রাজত্ব সুরু হইল।

প্রতিবেশী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জমিদারদের তরফ হইতে আসিল ভীরু ও বিলাসী মনের অশ্রদ্ধ বিদ্বেষপূর্ণ অভিবাদন!

কিন্তু দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল দেবীর সুনাম।

আট

মার্ব্বেলপাথরের মেঝের উপর পাতা সুদৃশ্য একটি ছোট গালিচার আসন। সুমুখে রূপার থালের উপর নৈবেদ্যের আকারে পরিপাটিরূপে দাদখানি চালের অন্নের ক্ষুদ্র একটি মঠ। থালার সম্মুখে বৃত্তাকারে সজ্জিত অনেকগুলি রূপার বাটিতে পঞ্চব্যঞ্জনের বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য।

আহারের আয়োজন সম্মুখে রাখিয়া মাণিকের অপেক্ষায় হাতপাখা হাতে লইয়া বসিয়া আছে দেবী।

দুই দুইবার ভৃত্য যাইয়া ডাকিয়া আসিবার পর মাণিক আসিয়া উপস্থিত হইল।

আসনে বসিতেই দেবী বলিল, — 'কি যে মানুষ তুমি কিছু বুঝতে পারি না। কাছারির কাজকর্ম্ম ত' কিছুই দেখ না, ঠিক সময়ে যে এসে দু'টি খাবে সে ফুরসুৎটুকও তোমার হয়ে ওঠে না। কি কর বলো ত' ?'

বিনাবাক্য ব্যয়ে অন্নের সুদৃশ্য মঠটি দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলিতেই দেবী বলিয়া উঠিল, 'ওকি করচো, রোজ রোজ তোমায় বলি, একসঙ্গে সবটুকুন ভেঙ্গে ফেলো না, জুড়িয়ে যায়, তা তোমার মনেই থাকে না!'

হাসিয়া মাণিক তাহার জবাব দিল, 'অভ্যাসটা আয়ত্ত করতে পারিনি দেবী। তবে শিখবো। আমার রাণীটির যে দু'টি তীক্ষ্ণ চক্ষু, ফাঁকি দেবার উপায় নেই।'

'তোমার একঘেয়ে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। বিয়ের পর পালিয়ে গিয়ে তুমি আমায় যে অপমান করেচো — সে আমি ভুলবো না। তোমার দারিদ্র্য নিয়ে কে কবে বিদ্রুপ করেছে বলো ত' ?'

'না করোনি'। তবু ঘর-জামাই,—মানুষ একটু কৃপার চক্ষে দেখে থাকে, তাই একটু সঙ্কোচ।'

'বৃথাই সঙ্কোচ। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে তোমাকে দেখবে কৃপার চক্ষে।'

একটু থামিয়া হাসিয়া দেবী বলিল—'তারা জানে দেবীরাণীর রাজা তুমি ?'

'হ্যাঁ জানে; কিন্তু মানুষের মনের উপর ত' রাণীরও হস্তক্ষেপ চলে না।'

'নিশ্চয় চলে। বৃথাই তা হ'লে রাজত্ব করছি, যদি না মানুষের মনই নিতে পারলাম। দৈবাৎ-পাওয়া এই প্রভুত্ব করবার সুযোগটা রক্তশোষণের দুর্নীতির লাঞ্ছনায় যেদিন কলঙ্কিত হয়ে উঠবে — সেদিন বোলো সে-কথা।'

মাণিক মৃদু হাসিয়া বলিল, 'স্বীকার করি রাণী; কিন্তু দৈবাৎ-পাওয়া এই প্রভুত্ব করবার সুযোগটা তুমি আমার উপর দিয়েই চালিয়ে নিচ্ছ অখণ্ড প্রতাপে। অন্যের কথা ত' বাহুল্য।'

'ঠিক বুঝতে পারলেম না, স্পষ্ট করে বলো।'

'শুধু মানুষের মনই নাওনি দেবী, আমার গরীব মনটির ওপরও প্রভুত্ব চলেছে তোমার ষোল আনা। আমি ভাবি সেটা কি ক'রে সম্ভব হলো? নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে মেয়ে মানুষের করুণায় আত্মসমর্পণ ক'রে ঘর-জামাই হয়ে বসবাস করবো, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! তোমার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। শুধুমাত্র পিতামাতার দাবী অগ্রাহ্য করতে না পেরে দৈবাৎ এসে পড়েছিলাম।'

মাঝখানে বাধা দিয়া দেবী বলিল, 'এসে পড়ে বড়ই ঠকে গেছো না?'

'মোটেই না, মিথ্যা দম্ভ ক'রে তোমার কাছে বড় হতে চাই না। সে ভুল আমার ভেঙ্গেছে।'

'কিসে ভাঙলো, শুনতে পারি কি?'

'শুনবে? আচ্ছা বলি। ভেঙ্গেছে, সোনারূপার জলুসে নয়, দেবী রূপের ওই অমিতাভ জ্যোতিতে, দেবীমনের ওই অপার্থিব প্রভুত্বে……

বাধা দিয়া দেবী বলিল, 'ও কথা আমার শুনতে নেই। তুমি আমার চিরকালের প্রভু, তোমার ওপর প্রভুত্ব করবার দুঃস্বপ্ন যেন কখনো না দেখি। হিন্দুঘরের স্ত্রী আমরা, আমাদের স্বামীই যে সর্ব্বস্ব। এত সাধের ঠাকুরমা, এত সাধের জমিদারী সব ভেসে যাবে যদি স্বামীর মনই না পেলাম। দেবীরাণীর মাথার মুকুটে ও-নাম জ্বলতে থাকুক তার

মরণ পর্যান্ত, শিরে পড়ুক তাঁর সুমঙ্গল হস্তের আশীর্ব্বাদ, বক্ষে পড়ুক তাঁর পদচিহ্ন……

হঠাৎ রোহিত মৎস্যের আস্ত মাথাটি এমন সুন্দর উচ্ছ্বাসকে পণ্ড করিয়া দিল। সেদিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িতেই দেবী বলিতে বলিতে থামিয়া গেল।

বলিল, 'বেশ মানুষ ত', খেতে বসেছো না কাব্য শুনতে বসেছো। আমার কথা শুনলেই পেট ভরবে, না ওটাও খেতে হবে ?'

মাণিক নিষ্পলক মুগ্ধদৃষ্টিতে দেবীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'সত্যিই রাণী, তোমার মুখের অমৃতবর্ষণের কাছে সামান্য এই [illegible] যে কত তুচ্ছ, এবং তা যে না বুঝতে পারে সে হয়ত প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষও খুণ করতে পারে।'

হাত হইতে হাতপাখা খসিয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে দেবী আর একটু হইলে মেঝের উপর লুটাইয়াই পড়িত।

মাণিক বলিল, 'হাসচো যে !'

'হাসছি তোমার অমন সুন্দর উপমাটি শুনে। কিন্তু কবিত্ব এখন থামাও। মাছের মুড়োটা ভাঙো, একটুও পাতে থাকতে পাবে না। রাণীর জন্য প্রসাদী কিছু রাখতে হবে না বরং আর এক বাটি আনিয়ে দিচ্ছি, একটু মুখে ছুঁইয়ে দিও। তবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছো, খাও না।'

'এই খাচ্ছি।'

'হ্যাঁ খাও। ফষ্টিনষ্টি ত' খুব হলো বরং খেতে খেতে দুটো কাজের কথা বলি।'

'বলো।'

দেবী ঠাকুরকে ডাকিয়া আর এক বাটি মাছের জন্য বলিয়া হাতপাখার সাহায্যে মৃদু বাতাস দিতে দিতে তাহার বক্তব্যটা এইবার বলিতে সুরু করিল।

বলিল, 'কত তোমায় বলি, কিন্তু দিনান্তে তুমি কাছারিতে গিয়ে একবারও উঁকি মারবে না। কেন বলো ত' ?'

'এই তোমার কাজের কথা ?'

'কাজের কথা পরে বলছি, — আগে এই কথার উত্তর দাও।'

'ও আমার ধাতে সয় না দেবী। অনভ্যাস ত' আছেই, খানিকটা অনধিকার চর্চ্চা বলেও মনে করি। তুমি জমিদারের মেয়ে, ওটা তোমার জন্মগত দাবী, তুমি পারবে। আমি পারিও না, কোনোদিন পারবো বলেও মনে হয় না। সুতরাং ও-পাহাড়ের চাপটা তুমি আমার ঘাড়ে চাপিও না। তার চেয়ে বরং যে-টাকাটা তুমি আমায় মাসিক বরাদ্দে বই কেনার বাবদ দিয়ে আসছো, তেমনি দিয়ে যেও। স্বামীসেবার প্রত্যবায় ত' হবেই না বরং স্বামী তাতে তোমার প্রসন্ন থাকবেন।'

'সে ত' জানি লাইব্রেরী-ঘরটায় লেপ্টে আছো দিনরাত। তা থাকো, কিন্তু আমি শত হলেও মেয়েমানুষ, সব কাজ আমি পারি না। আর সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয়ও না।'

'কাজটা কি একবার বলো ত' ? একবার শুনি, তারপর দেখি ভেবে এই অপদার্থ লোকটাকে দিয়ে তা হয়ে উঠবে কি না ?'

আসল কথাটি দেবী এইবার ব্যক্ত করিল।

বলিল, 'নবাবগঞ্জ, ইস্‌পিঞ্জারপুর আর কালীদহ পালেদের জমিদারী। এক চাপের একটা বড় মহাল। শুনেছি দেনার দায়ে ওটা বিক্রী ক'রে ফেলবে। যত টাকা লাগে দেবীরাণীর সিন্দুক তোমার জন্য খোলা আছে, তুমি ওটা আমায় কিনে দাও।'

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, 'কত স্থিত ?'

'বিশ-বাইশ হাজার হবে। তুমি এই কাজটা আমায় ক'রে দাও, তোমার পায়ে পড়ি।'

হাসিয়া মাণিক বলিল, 'দেবীরাণীর এই দয়া আমি ভুলবো না। যার একটা হুকুমে পরগণা কেঁপে ওঠে, সেই রাণীর এই বিনীত অনুরোধ আমি অবহেলা করলে যে লক্ষ্মীপুরের হাজতঘরে আমার বাস করতে হবে।'

দেবীও হাসিয়াই তাহার উত্তর দিল, 'লোকটা তুমি মন্দ, তাই বল। নইলে তোমার হাজতঘর যে দেবীরাণীর শয়নমন্দির তা কি তুমি জানো না? খুব জানো! এখন বলো, যাবে কিনা?'

'যাবো। কিন্তু বেছে বেছে এই অকর্ম্মার ঢেঁকিটির ওপর তুমি এত বড় একটা গুরুতর কাজের ভার চাপিয়ে দিচ্ছো কেন আমি ভেবে পাইনে দেবী!'

'এই অকর্ম্মার ঢেঁকিটিকে সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে তাঁর অজ্ঞাতসারে যদি ওই বইয়ের গাদা হতে টেনেই আনতে না পারি, তা হ'লে দেবী নাম আমার বৃথা।'

'সত্যি বৃথা। সে বিষয়ে তোমার জয় অনিবার্য্য। কিন্তু তোমার বিশ্বাসী লোকেরও ত' অভাব নেই, আমাকে দিয়ে কেন?'

'বিশ্বাস করি নির্ভরও করি; কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস আমার কারও ওপর নেই। বারোভূতের পার্ব্বণী জুগিয়ে ওর দাম পড়ে যাবে দ্বিগুণ। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত আমায় ফিরেই আসতে হবে। তাই অন্ধবিশ্বাস যাঁর ওপর আছে তাঁকেই এই কাজে পাঠাতে চাই। যাবে ত' ঠিক?'

'নিশ্চয় যাবো। কিন্তু আমি কি পারবো?'

বাহিরে ঠাকুরমার পদশব্দ শোনা গেল।

দেবী বলিল, 'খুব পারবে; কিন্তু ঠাকু'মাকে এ সম্বন্ধে এখনো কিছু বোলো না যেন।'

জাহ্নবীদেবী ঘরে পা দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কি গো, তোমাদের প্রেমালাপ শেষ হ'ল? খেতে বসে কি তোমাদের এত প্রেমের কথা হয় যে আমি পর্য্যন্ত একটু শুনতে পারি না!'

দেবী মাণিকের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'সতীন বুড়ো হ'লে এই অবস্থাই হয় বটে। দু'দণ্ড বসে যে গল্প করবো তাও কি সতীনের জ্বালায় পেরে উঠবো!'

বলিতে বলিতে দেবী মুখের একরূপ অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া বঙ্কিম গ্রীবাখানি হেলাইয়া ঘরের ভিতর একটা রূপের হিল্লোল তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে সে শুনিতে পাইল ঠাকুরমার আহ্লাদপূর্ণ কণ্ঠের কলহচ্ছটা। ঠাকুরমা তখন বলিতেছেন, 'শুনলে মাণিক, মুখপোড়া ছুঁড়ীর কথাটা একবার শুনলে!'

মাণিক তখন পাত্রত্যাগ করিয়া আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা দেখিয়া জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'কি গো ঘণ্টাখানেক বসেও ত' খাওয়া শেষ হচ্ছিল না আমি এলাম আর উঠে দাঁড়ালে! বয়সের ছুঁড়ীদের গুণ আছে দেখছি।'

'তা আছে ঠাকু'মা। তারপর আপনার নাতনীটি দেখছেন ত'? বয়সের জোয়ার বাঁধ ভেঙ্গে আসতে চায়! তার সঙ্গে আপনি পেরে উঠবেন কেন?'

ধীরে ধীরে মাণিক দুষ্ট হাসি মুখে চাপিয়া হাত ধুইতে বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল। ঠাকুরমাও তাহার পাল্টা কিছু জবাব দিতে মাণিকের পিছন পিছন চলিল।

কিন্তু ইহার পর জবাব দিবার আর আছেই বা কি?

নয়

যমুনা নদীর ধার দিয়া যে রাস্তাটা একটা বাঁকের অন্তরালে ঝাউতলার বড় সরকে গিয়া মিশিয়াছে, লক্ষ্মীপুরের রাজবাড়ির ছাত হইতে তাহা স্পষ্ট

দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় দুইটি রাস্তার মোহনায় একটি প্রাচীন অশ্বত্থ। বহুদূরের পথিককেও সে হাতছানি দিয়া বলিয়া দেয় যাত্রাপথের অবশিষ্ট পথটুকু।

রাজবাড়ির ছাতের আলিসার উপর ভর করিয়া দেবী সেই পথের পানেই চাহিয়া ছিল। নবাবগঞ্জের পালবাবুদের কাছারি হইতে খবর আসিয়াছে মাণিক আজ সন্ধ্যার মধ্যেই লক্ষ্মীপুর পৌছিবে।

সন্ধ্যা তখনো উত্তীর্ণ হয় নাই।

তবু দেবী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতেছিল এই বুঝি বা বাঞ্ছিত মূর্ত্তিটি ওই অশ্বত্থের বাঁকের মাথায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। ঘন ঘন সে দুইটি চক্ষু দিয়া দুরবীনের সহায়তায় দূরের মানুষকে কাছে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে ওই দুইটি গোল কাচের মধ্যে।

কিন্তু বৃথাই এই চেষ্টা।

বহু অচেনা মুখ ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর হইয়া চোখের সম্মুখ দিয়া একে একে পার হইয়া যায়। আসল মানুষটিকে দেখা যায় না।

ক্লান্ত হইয়া দেবী তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া আনে নদীর দিকে।

নদীর পশ্চিমতটে দেখা যায় ধূ ধূ বালির চর। দক্ষিণা বায়ুর মৃদু ঝাপটায় মুঠো মুঠো বালি নিদ্রিত চরের বক্ষ হইতে মাঝে মাঝে শূন্যে লাফাইয়া উঠিতেছে। ক্রমশঃ কুণ্ডলী পাকাইয়া সে বালুরাশি মুহূর্ত্তের মধ্যে সর্পিল গতিতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। মিলাইয়া যায় নীল আকাশের গায়ে। অলস সায়াহ্নে দিবসের শ্রান্তি ঢালিয়া দিয়া চরের বাঁকে বাঁকে জোড়ায় জোড়ায় বসিয়া আছে চক্রবাক ও চক্রবাকী। চরের অপর প্রান্তে গ্রামের অস্পষ্ট ধূম্ররেখা মিশিয়া গেছে সীমন্তিত ধরাতলে।

সূর্য্য অস্ত যাইতে তখনো দেরী আছে।

সূর্য্যের মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িয়াছে এক মুঠো ধূসর মেঘ। সে মেঘ ভাঙিতে ভাঙিতে গড়িয়া উঠিল একটি মৃগমূর্ত্তি। রূপকারের নেশা আবার ভাঙিয়া গেল নবসৃষ্টির মাদকতায়। মেঘের সে মৃগলেখা ভাঙিয়া গড়িয়া উঠিল একটি নাতিদীর্ঘ বিচিত্র পর্ব্বত। পর্ব্বতের কটিপ্রান্তে অস্তমান ভানুর স্বর্ণচ্ছটা। ঠিক যেন দুলিয়া উঠিল গিরিনিতম্বে একটি মহার্ঘ্য স্বর্ণমেখলা।

এদিকে মৃদুমন্দ বাতাসে নদীর বুক মাঝে মাঝে ফুলিয়া উঠিতেছে, মৃদুলাস্যভারে কম্পমানা পূর্ণযৌবনা নারীর বক্ষের মত। মন্থর ঢেউগুলির সে ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যের মুমূর্ষু দীপ্তি পড়িয়া গলিত সোনার মত চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছে।

অপলক ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টিতে দেবী সে দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু আর ফিরিতে চায় না। অকস্মাৎ সেই সৌন্দর্য্যস্নাত তপস্বিনী মূর্ত্তি শ্রবণইন্দ্রিয়ের এক উদগ্র আহ্বানে সচকিত হইয়া উঠিল!

দূর হইতে একটি ঘোড়ার মন্থর ক্ষুর-শব্দ শুনিয়া দেবী মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া হতাশ হইল। বিজাতীয় পরিচ্ছদ পরিয়া একটি লোক ধীর গতিতে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছে বিপরীত দিকে। দূরবীন চোখে দিয়া দেবী লক্ষ্য করিয়া দেখিল, লোকটি আর কেহ নয়, ম্যানেজার ডেভিস সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দূরবীন চোখে দিয়া দেবী তখনো সাহেবের অশ্বচালনা দেখিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ দেবী লক্ষ্য করিল দূরবীনের দুইটি গোল কাচের উপর একটি বলিষ্ঠ সাদা ঘোড়া ভাসিয়া উঠিল। ঘোড়াটি ক্ষিপ্রবেগে দূর হইতে ক্রমশঃ যেন বড় হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আরও দূরে দেখা গেল একটি পাল্কী। বোধকরি দেওয়ান সোমনাথ আসিতেছেন ওই পাল্কীতেই। দেখিতে দেখিতে মাণিকের ঘোড়া আসিয়া থামিয়া পড়িল

সাহেবের ঘোড়ার সম্মুখে। জিনে বসিয়াই সাহেব তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল মাণিকের দিকে।

দেবী চোখ হইতে দূরবীন নামাইয়া ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই দেবী তাহার অলঙ্কারের বাক্সটি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িল। সাজসজ্জার একটা প্রচণ্ড নেশায় আজ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কেন, তাহা সেই জানে। মাণিককে খুশী করা হয়ত আজ তাহার প্রয়োজন। চিঠিতে যে সুখবরটি সে দিয়াছে — তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে।

*   *

*

দ্বারপ্রান্তে মাণিক আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। খাটের বাজুতে হাত রাখিয়া রাজেন্দ্রানী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে দেবীরাণী।

মরি মরি রূপ সাজসজ্জার সমস্ত নিষ্ঠা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। দেবীরূপে আপন হইতেই ঘর উঠিয়াছে আলো হইয়া। মিথ্যাই উহার উপর তুলি ছোঁয়ানো। জাফরাণী রঙের শাড়ীটা নিষ্প্রভ হইয়া গেছে দেবীর বর্ণের ছটায়। মাথায় সোনার মুকুট। আলো পড়িয়া তাহাতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে হীরার টুক্‌রো দিয়া লেখা মাণিকের নাম। কানে, দুইটি দামী পাথর বসানো ইয়ারিং। গলায়, বহু মূল্যবান জহরতের নেক্‌লেস্‌। পরিপুষ্ট দুইটি নিটোল বাহুতে হ্যামিল্টনের বাড়ির জড়োয়া ভুজবন্ধনী। হাতে সোনার ফাঁকে ফাঁকে একটি করিয়া জরির চুরি, তাহারি সাথে শঙ্খের বলয়। পায়ে ঘাসের চটি, তাহারই ফাঁকে অলক্তকের ক্ষীণ রেখাটুকু দেখা যায়। দেবীর সুবঙ্কিম যুগ্ম-ভ্রূর মাঝখানে একটি সিন্দুরের টিপ জ্বলিয়া

উঠিয়াছে সতীত্বের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। দেবীর অধরের কোণে রহস্যের ছায়া। নয়নের কোণে স্বপ্নের অঞ্জন।

মাণিকের পায়ের ধূলা লইয়া দেবী বলিল, 'কি দেখচো, আমার এই রূপ?'

মাণিক বলিল, 'দাঁড়াও, কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছি না। নেশা লেগেছে।'

'যাও, বাড়িয়ে তুলো না, দেমাক বেড়ে যাবে কিন্তু।'

'বাড়ুক না, বাড়বার মতই ত' ?'

'থামো, কি এমন নূতন দেখলে? তিন বছর ধরেই ত' দেখে আসচো।'

'তিন বছর ধরে' যাকে দেখে আসচি, আর আজ যাকে দেখচি — সে কি তুমি দেবী?'

হাসিয়া দেবী বলিল, 'তোমার কি মনে হয়?'

'মনে হয়, ট্রয় পুড়ে গিয়েছিল যে রূপের শিখায়, সে রূপ কি এর চেয়েও বেশী? জাহাঙ্গীর বাদশা যে বেগমের রূপে মুগ্ধ হয়ে নাম রেখেছিলেন নূরজাহান — সে রূপ কি এর চেয়েও মধুর?'

দেবী মাণিকের দিকে পিছন ফিরিয়া একটু সরিয়া যাইতেই মাণিক তাহার আচল টানিয়া ধরিয়া বলিল, 'যাচ্ছো যে!'

অভিমানের ভাণ করিয়া দেবী বলিল, 'তোমার ঠাট্টা শুনে! না হয় দুটো গয়না পরেছি আজ বেশী — তাতেই এত ঠাট্টা? যাও, আর পরবো না।'

মাণিক বলিল, 'কি আর এমন গয়না পরেচো! দেবীরাণীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ ত' এখন পর্য্যন্ত পরোইনি!'

'কি সে ভূষণ?'

হাসিয়া মাণিক তাহার বাহু বাড়াইয়া দিল। নিটোল গ্রীবা বেষ্টন করিয়া মাণিক আর এক হাত দিয়া তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এই সেই ভূষণ।'

দেবীর স্বপ্নবিহ্বল দুইটি চক্ষু স্তিমিত হইয়া আসিল আনন্দের আবেশে। রক্তাভ গালে টোল পড়িল একটা লজ্জিত হাসির অব্যক্ত উচ্ছ্বাসে।

দেবী বলিল, 'সত্যিই ত', এই টুকুই বাকী ছিল। আর এরই জন্যেই ত' এত আয়োজন।'

'সে ত' রাণী তোমার নিত্যকালের দাবী। তার জন্য এত তপস্যার কি প্রয়োজন?'

'সমারোহে তাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। কে জানে, পুরুষের মন বলা ত' যায় না। হয়ত এই দেবীকেই একদিন তুমি দাসী ব'লেও স্বীকার করতে চাইবে না। চলো খাটে গিয়ে বসি, শ্রান্ত হয়ে এসেচো।'

দুই জনে খাটে গিয়া বসিল। দেবীর হাতটি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া মাণিক বলিল, 'তোমার মাণিকটি অরসিক নয়। এত বড় ভুল জীবনে একবার হয়েছিল বলেই আর হবে না।'

'হয়ত হবে না। হলে' আমি আর কি নিয়ে বাঁচবো বলো? ঐশ্বর্য্যের শৃঙ্খলে তোমাকে বেঁধে রাখতে পারবো, সে মানুষ তুমি নও। যাতে পারবো, সেই বস্তুটি যেন কোন দিনই না হারাই — শুধু এই আশীর্ব্বাদ কোরো।'

মাণিক বলিল, 'বারম্বার যে কথাটার ওপর সন্দেহ ক'রে আমাকে তুমি লজ্জা দাও তার মূলে রয়েছে একদিনকার ভুল। এই মেটিরিয়াল যুগে এই ভুল করা ঠিক হয়নি, এবং যারা করে, লোকে তাদের 'ফুল্‌স' আর 'ইডিয়ট্‌স' বলে, আরও অনেক কিছু বলে। কিন্তু এত বড় বিশাল জগৎটাতে শুধু গুণীলোকেরই ত' বাস নয়, মূর্খও আছে। আমি ছিলাম তাদেরই একজন।'

দেবী হাসিয়া উত্তর দিল, 'মানে উচ্চস্তরের মূর্খ! কিন্তু পূজনীয় মূর্খ ব্যক্তিটি কি ভেবেছিলেন শুনতে পারি কি ?'

'কথাটা তা হ'লে স্পষ্ট ক'রেই বলি। ভেবেছিলাম, ধনীর মেয়ে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে তুমিও তাই। ভেবেছিলাম, স্বামীর গদীতে থাকতে হবে আমায় চিরকাল চোর হয়ে। তার হুকুমের চাকর হয়ে তামিল করতে হবে তার ফুট্-ফরমাইস। বাবা মা ভাই বোন সব ছেড়ে এসে একটা দাম্ভিকা উদ্ধত মেয়ের তাঁবেদারি ক'রে জীবন কাটাতে হবে এইটেই ছিল আমার সবচেয়ে বড় ভয়; কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারি দেবী, সে ভুল আমার ভেঙেছে।'

গম্ভীরা দেবী মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার চঞ্চল হইয়া উঠে। খাট হইতে নীচে নামিয়া স্বামীর দুইটি পা একান্ত আলিঙ্গনে দেবী বক্ষে চাপিয়া ধরিল। দেবীর ঘন ঘন চুম্বনে সিক্ত হইয়া উঠিল মাণিকের পদযুগল।

মাণিক হাসিয়া বলিল, 'ওঠো রাণী, দেখো যেন পতিভক্তির বানে ভেসে না যায় তোমার পরম গুরুটি। পায়ের উপর চুমো খাওয়ার যে ধূম পড়ে গেছে, বাইরের লোক কেউ যদি দেখে ফেলে ত' হেসে আর বাঁচবে না। বিশেষ ক'রে আধুনিক সভ্য মেয়েরা ত দেখ্‌লে মূর্চ্ছাই যাবে। তার চেয়ে বরং তোমার ওই মসৃণ ঠোঁট্ এসে লাগুক আমার এইখানে, যাতে সভ্যতাও বজায় থাকবে, আমিও খুশী হবো বেশী।'

মাণিক দেবীকে টানিয়া লইল বুকের মাঝখানে। দেবীর ভূজবন্ধনে মাণিকের দেহও ঝুঁকিয়া পড়িল সেই দিকে। অবিশ্রান্ত চুম্বনরেখায় অভিষিক্ত হইয়া উঠিল মাণিকের গণ্ডদেশ কপোলতল ওষ্ঠপুট।

ধনীর নন্দিনী দেবীরাণীর ধীর স্থির স্ত্রীমূর্ত্তি একান্ত অলক্ষ্যে ডুবিয়া যায় একটা পরিচ্ছেদের অন্তরালে। জাগিয়া উঠে অষ্টাদশী দেবীর হাস্যচঞ্চল চটুল স্বভাবের লীলাময়ী রূপ! সেবাপরায়ণা স্ত্রী হইয়া উঠে তেমনি তার

ভালবাসার মাঝে প্রেয়সী, সস্নেহ কোমলতার সঙ্গে মাতার আশঙ্কা ও উদ্বেগময় আকুলতা, এবং তারি সঙ্গে মিশিয়া যায় ভগিনীর স্নিগ্ধ কল্যাণ-কামনা। নিজের মনেই দেবী পণ করে, সব ছাড়িয়া যে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমি একাই তাঁহার সকল অভাব পূর্ণ করিব।

মাণিক বলিল, 'সব ত' হলো। দ্বন্দ্ব, শঙ্কা, ছোট্ট একটু অভিমান কিন্তু সত্যি ক'রে বলো দেখি দেবী, দেবীর আজ রাণীর বেশ কেন?'

দেবী উত্তর দিল, 'বহু শ্রম ক'রে রাজা আসচেন দেশ জয় ক'রে, রাণী তাই পাদ্য অর্ঘ সাজিয়ে বসে আছে তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য, তাঁর শ্রান্তি অপনোদনের জন্য। জানি ও লোকটার জমিদারী বাড়ুক কমুক উদ্বেগের বালাই নেই, সুতরাং আনন্দ নিরানন্দের প্রশ্নও সেখানে একরূপ অর্থহীন। তবু তাঁর আনন্দের প্রাপ্য যেটুকু সেটুকুও যদি তাঁকে না দিই, সে দুঃখ দেবীর নূতন মহাল কিনেও মিটবে না। কিন্তু সত্যিই কি ওটা কেনা হবে?'

'সত্যিই কেনা হবে। তারা এক পায়ে খাড়া। দেরী করলে হয়ত বা হাত ছাড়াও হতে পারে।'

দেবী বলিল, — 'তা হ'লে হাতছাড়া যাতে না হয় সে কাজও তোমারি করতে হবে। সোমনাথবাবু আসুক, সাহেবের সঙ্গেও একটা শেষ পরামর্শ ক'রে যা হয় দু'চারদিনের মধ্যেই করা যাবে।'

বাহিরে তখন মণির মা'র গলার আওয়াজ শোনা গেল। মণির মা বুড়াঠাকুরাণীর খাসদাসী। ইহার পূর্ব্বেও দুই তিনবার সে কাশি কাশিয়া তাহার উপস্থিতির বিজ্ঞপ্তিটা দিয়া গিয়াছে; কিন্তু ভাবমগ্ন স্বামী স্ত্রী তাহা লক্ষ্যও করে নাই। এইবার মাণিক তাহার কথা শেষ হইতেই সেই সাঙ্কেতিক কাশির শব্দ শুনিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

বাহির হইতেই আওয়াজ আসিল — 'আমি মণির মা।'

দেবী তাহাকে ভিতরে ডাকিতেই অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'রাণীমণি তোমায় ডাকচেন বুড়ো মা।'

'আহ্নিক শেষ হয়েছে?'

'শেষ অনেকক্ষণ হয়েছে, তিনি বললেন জামাইবাবু এলে তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।'

ঝিয়ের মাকে বিদায় দিয়া দেবী বলিল, 'চলো যাই।'

'চলো, কিন্তু এই সব নিয়েই যাবে ত'?'

'পাগল নাকি, এইগুলো পরেই যাবো ঠাকুরমার কাছে?'

'কিন্তু দাসীটা ত' দেখে গেল, ওই ত' গিয়ে বলে দেবে।'

'বয়েই গেল। ঠাকুরমা ত' নিজেই কত তুক-তাকের কথা বলে দেন।'

'দেন নাকি? তুমি কি তা হ'লে — ?'

কথা কাড়িয়া লইয়া দেবী বলিল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তাই করেচি। চলো এখন। দেবীরাণীর কিইবা এমন আছে, যে তুক্-তাক্ ছাড়া সে স্বামীর মন নিতে পারবে? এখন চলো, ঠাকুরমার ওখানেই তার বোঝাপড়া হবে।'

দশ

নাতজামাইকে উদ্দেশ করিয়া জাহ্নবীদেবী বলিতেছিলেন, 'কি গো মাণিকবাবু যাওয়া হয়েছিল কোথায়? না বলে করে হঠাৎ অন্তর্ধান হলে, আমি ভাবলাম বুঝি পাখী আবার শেকল কাটলো।'

লজ্জামিশ্রিত আনন্দের সুরে মাণিক উত্তর দিল, 'না ঠাকু'মা, আর পাখী পালাবে না। জংলা পাখী ধরে এনেছিলেন, তাই বাগ মানাতে পারেননি। এখন পোষ মেনেছে।'

হাসিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, 'সোনার খাঁচায় রেখে অমন সোনাদানা খাওয়ালে সব পাখীই পোষ মানে, মানে না শুধু তোমার মত সৃষ্টিছাড়া পাগ্‌লা পাখী। তা হোক্ সেই জন্যই তোমায় আমি ভালবাসি মাণিক। দেবীর আমার ভাগ্য ভালো। কি গো রাণী হাসচো যে, সত্যি নয় ?'

দেবী বলিল, 'ও বাবা, সত্যি আবার নয় ? বলো কি ঠাকু'মা ? আমি সাগর সেচে—থুরি !'

বলিতে বলিতে দেবী থামিয়া গিয়া আবার বলিল, 'ওই যা ভুলে নামটাই প্রায় বলে ফেলেছিলাম। তুমিই বল ঠাকু'মা, সাগর সেচে কি এনেছো ?'

দেবীর গালে একটা মৃদু চড় দিয়া হাস্যরসিকা ঠাকুরমা বলিলেন, 'কেন রে ছুঁড়ী, জানিস না কি এনেছি ?'

দুষ্টু হাসি চাপিতে চাপিতে দেবী বলিল, 'বলোই না নামটা ?—ওঃ তোমারও বুঝি ও-নাম নিতে নেই ?'

'ছুঁড়ীর আমার বড় বাড় বেড়েছে।'

বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি দেবীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া জাহ্নবীদেবী আবার বলিলেন, 'কলা দেখিয়ে যাবো একদিন পালিয়ে ওই সোনারচাঁদ ছোঁড়াটাকে নিয়ে বৃন্দাবনের দিকে। তখন বুঝবি মজা।'

দেবীর উত্তর চাপা পড়িয়া গেল মাণিকের কথায়। মাণিক বলিল,— 'থামো এইবার, দেখচো না দিদিমণি রেগে গেছেন। সত্যিই যদি তল্পিতল্পা বেঁধে সোনার চাঁদটিকে একবার ডাক দেন ত', চাঁদটি কিন্তু পারবে না সে অনুরোধ ঠেলতে। রাধাশ্যামের ঝুলি নিয়ে সেও বেরিয়ে পড়বে বৃন্দাবনের দিকে।'

আহ্লাদে গদগদ হইয়া জাহ্নবীঠাকুরাণী বলিলেন, 'শুন্‌লি, বড় যে রূপের গরব করিস, শুনলি এইবার ? এখন থেকে মুখ সেলাই ক'রে থাকিস। আর বলিসনে ছোটমুখে বড় কথা।'

দেবী হাসিতে হাসিতে ঠাকুরমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'না গো না, আর তোমাকে কিছু বলবো না ঠাকু'মা, জিত্ তোমারি হয়েছে। কিন্তু কিইবা বলেছি? গুরুজনের নাম নিতে নেই, এই ত' বলেছিলাম। তোমার কাছেই ত' শিখেছি।'

হাসির বেগ থামিয়া আসিলে দেবী বলিল, 'ঠাকু'মা বলো না তোমার সেই ভাসুরঠাকুরের গল্পটি। এক দুর সম্পর্কের ভাসুরের নাম নিয়ে তোমরা কি কাণ্ডটাই না করেছো! বলো না ঠাকু'মা আবার সেই গল্পটি!'

উদ্গ্রীব হইয়া মানিক জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গল্প ঠাকু'মা?'

'ওগো ভারী মজার গল্প। বলো না ঠাকু'মা। ভদ্রলোক শুনতে চাইছেন। তোমার পায়ে পড়ি, বল।'

দেবীর অনুরোধের ঘটা ও ছেলেমানসি আব্দার দেখিয়া ঠাকুরমা নাত-জামাইর সম্মুখে কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়াই উঠিলেন। ঠাকুরমার ঝুলিতে নূতন কিছু আর নাইও। কিই বা আর তিনি বলিবেন। দেবীর এতটুকু বয়স হইতে শুনিয়া শুনিয়া সে আর কিছু বাকী রাখে নাই। মেয়েটি আদায় করিয়া লইতেও জানে।

তাহার ঠাকুর্দ্দার জোড়া ভুরু ছিল, নাকটা ছিল বাঁশীর মতন, হাটিত বুক ফুলাইয়া, কথা বলিত টস্ টস্ করিয়া, ভালবাসিত কতখানি, এমন কি শেষ বয়সে তাঁহার মাথায় কয়টি চুল পাকিয়াছিল,—তা পর্য্যন্ত আদরের নাতনীটি খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া জানিয়া লইয়াছে। তবু তাহার জানার বিরাম নাই। কথা প্রসঙ্গে কথা উঠিতেই সে বলিয়া বসিত, 'হ্যাঁ ঠাকু'মা বলো সেই গল্পটা, আবার শুনি।'

ভাসুর ঠাকুরের গল্পটাও এমন কিছুই নয়। তবু বলিতে হইল।

জাহ্নবীদেবীর শাশুড়ীর আমোলের আইনকানুনটা যে কত শক্ত ছিল তাহা তাহার বধূজীবনের মধ্য দিয়াই পরীক্ষা হইয়া গেছে। গুরুজনের নাম

নিলে তখনকার দিনে জিহ্বা কাহারো খসিয়া পড়িয়াছিল কিনা জানি না; কিন্তু ও-নাম লইতে নাই, ইহাই ছিল সেদিনের সংস্কারগত বদ্ধ ধারণা। জাহ্নবীদেবীর সে সংস্কার আজো যায় নাই। আজও তিনি লক্ষ্মীপুরকে পক্ষীপুর বলিয়া থাকেন। গুরুস্থানীয়া লক্ষ্মীদেবীর নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া এই গ্রামের নামকরণ হইলেও উচ্চারণ করিতে যেমন তাঁহার বাধে, ভাসুরঠাকুরের কাহিনীটিও ঠিক এইরূপ। গোবিন্দ গোঁসাই নামে এক ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন জাহ্নবীদেবীর সম্পর্কের সেই ভাসুর। ভাসুরের নাম লইবার প্রয়োজনও করিত না, লইতেনও না। কিন্তু গোল বাধিল ভোজ্যদ্রব্যের একটা পিষ্টকের নাম লইয়া। ছানার তৈয়ারি গোবিন্দ-ভোগ ছিল এই বাড়ির জলখাবারের থালার মধ্যে একটা নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ। সুতরাং এহেন পদার্থের নাম লইতে হইত প্রায়শঃই। জাহ্নবীদেবী এবং তাহার সমসাময়িক ছোট ছোট ভ্রাতৃবধূরা সকলেই বলিতেন — 'ভাসুরঠাকুর-ভোগ'। গোঁসাইজির স্ত্রী বলিতেন — 'কর্ত্তাভোগ'।

সঙ্ক্ষেপে এই হইল গল্প।

তবু দেবী ইহার মধ্যে কী যে রস পায়, তাহা দেবীই জানে। হাসিতে হাসিতে সেই এতটুকু মেয়ের মতই দেবী লুটাইয়া পড়ে ঠাকুরমার কোলের উপর।

হাসির অশান্ত বেগ আবার তখনই থামিয়া যায়, যখন বৈষয়িক গুরুতর আলোচনা আসিয়া ক্ষেত্রটির গুরুত্ব বাড়াইয়া দেয়। স্বচ্ছ সরল শিশুর সে সারল্য উড়িয়া যায়। গাম্ভীর্য্যে বুদ্ধিমত্তায় মুখের চেহারা বদলাইয়া যায়। বচনে ভাসনে আসে সংযত নিষ্ঠা।

মাণিক একে একে সব খুলিয়া বলিল। জাহ্নবীদেবী আদ্যপান্ত সব শুনিয়া দেবীরাণীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'পারবে দিদি, পারবে তুমি জমিদারী চালাতে। তোমার ঠাকুর্দা যা পারেননি, আমার ছেলে যা পারেনি,

তুমি যদি তাই পারো — তাতেও ত' আমার দুঃখ হবেই না, লজ্জাও হবে না। আশীর্ব্বাদ করি তোমার ইচ্ছা জয়যুক্ত হোক্।'

দেবী ঠাকুরমার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা ঠাকু'মা, তাঁরা কেবল টাকাই জমিয়ে গেছেন, জমিদারী যাতে বাড়ে সে দৃষ্টি তাঁদের কেন ছিল না বলতে পারো?'

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'পারবো না দিদি। পক্ষীদেবীর পরও দু'চারটে নূতন সম্পত্তি কেনা হয়েছে, কিন্তু তারপর থেকেই কর্ত্তারা শুধু টাকাই জমিয়ে এসেছেন। ওদিকে কোন খেয়ালই ছিল না। ওঁদের নির্ব্বিকারচিত্ত হয়ত ওতেই খুশী ছিল বেশী। সম্পত্তি কেনার ঝঞ্চাটও ত' আছে, সেই দিকে হয়ত পা বাড়াতে সাহস পান্নি,—এমনও হতে পারে।'

আপনমনেই দেবী বলিল, 'তা হবে, ঝঞ্চাটও ত' আছে। তবে কি আমিও ওতে হাত দেব না ঠাকু'মা, কি বলো?'

'কেন দেবে না? তোমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর আমার বিশ্বাস আছে দিদি। আমি শত হলেও সেকেলে বুড়ী, সব সময় সবটা ভালো বুঝে উঠ্তে পারি না। তুমি পারবে; তোমার নাম কাম বাড়লেই আমার আনন্দ। সাহেব আছে, সোমনাথ ও মাণিক আছে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যদি ভালো বোঝ ত' নিশ্চয়ই একাজ তুমি করবে।'

দেবীর মনে দ্বিধা ছিল, হয়ত বা শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরমা স্বীকৃত হইবেন না। ঘরের সঞ্চিত অর্থ বাহির করাটা হয়ত তিনি মনে করিবেন একরূপ অপব্যয়। কিন্তু পিতামহীর অনুমতি ত' দেবী অনায়াসেই লাভ করিল, পক্ষান্তরে তাহার সঙ্গে সে লাভ করিল একটা সতেজ নির্ভীক উদ্দীপনা।

*   *

*

এগারো

লক্ষ্মীপুরের জমিদারীর উপস্বত্বও যেমন বৃদ্ধি হইল, জমিদারীর আয়তনও বিস্তৃত হইয়া পড়িল রাণীখণ্ডের গড় পর্য্যন্ত। গড়ের মধ্য দিয়া জিলা বোর্ডের যে বড় সরকটি জিলাশহরের সাহেবপাড়ার পিছটাল শহরতলীর রাস্তাটির সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে, সেই সরকেরই অপর প্রান্ত পাল চৌধুরীদের নবাবগঞ্জ কাছারির সুমুখ দিয়া গিয়া মিশিয়াছে মহকুমা শহরে। যমুনার শাখা বৈরাননদীর উভয় তটেই যত গ্রাম খাল বিল দহ সবই এখন দেবীরাণীর জমিদারীর অন্তর্গত।

পাকা আমিনের হাতে-আঁকা নূতন মহালের একটি চিত্রিত সুন্দর নক্সা হাতে করিয়া দেবী পিতামহী জাহ্নবীদেবীকে বুঝাইয়া দিতেছিল।

পালঙ্কের উপর ঢালা ফরাসে মখমলের তিনচারটি তাকিয়া পায়ে পিঠে ঠেকা দিয়া, নাত-জামাই'র ভক্তিশ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত একটি মুর্শীদাবাদি দামি বালাপোষ অষ্টেপৃষ্ঠে গায়ে জড়াইয়া একবার নক্সার দিকে একবার দেবীর মুখের দিকে তাকাইয়া গোটা নতুন জমিদারীটা তিনি আয়নার মত বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

দেবী বলিল, 'বুঝলে ত' সব, এখন বলো কবে যাবে?'

নবাবগঞ্জ কাছারির সুমুখের রাস্তাটির উপর আঙ্গুল দিয়া দেবী বলিল, 'এই যে বড় সরকটি দেখচো, এরই সঙ্গে এসে মিশেছে এই দুটি গ্রাম্য সরক। একটি এসেছে ইস্‌পিঞ্জারপুর হতে আর একটি এসেছে কালীদহ হতে। তিনটি রাস্তার এই বুকের ওপর পুঁতবো সেই বট-পাকুর। এইখানে বসে তুমি সেই বট-পাকুরের বিয়ে দেবে। বলো ঠাকু'মা এখন কবে যাবে?'

ঘটনা-বিবৃতির প্রারম্ভ হইতে দেবীর স্বতঃউচ্ছ্বসিত বারম্বার অনুরোধের ঘটা ও আব্দারের সে সতেজ ভঙ্গী দেখিয়া জাহ্নবীদেবী তাকাইয়া আছেন দেবীর পানে তেমনি বিস্ময়ে! নব নব উদ্ভাবন নব নব পরিকল্পনার সে মৃদুমধুর বর্ণনা একাগ্র তন্ময়তার সঙ্গে শ্রবণ করিতে করিতে জাহ্নবীদেবী এই কথাই ভাবিতেছিলেন — মেয়েটিকে সৃজন করিয়াছেন কোন্ দেবতা? অনন্যসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, দীপ্যমান প্রতিভা, অপরিমিত সাহস, পুরুষোচিত তেজবীর্য্য, অসাধারণ সংযম নিষ্ঠা সব দিয়া লীলাময়ী এই নারীটিকে একাধারে যিনি সৃজন করিয়াছেন, আমাদের জাতের সবাই কি তাঁহারি হাতের স্বাক্ষর লইয়া ধরার বুকে নামিয়া আসিয়াছি? আসিয়াছি শুধু কি পুরুষের করুণার তলায় আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন ধারণের গ্লানি লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে?

স্মৃতির পটে আজ ভাসিয়া উঠে কত কথা কত ছবি! মনে পড়ে পরিত্যক্ত দিনের সেই জীর্ণ-ইতিহাস। মনে পড়ে দেবীর পিতামহের সেই উজ্জল গৌরকান্ত সৌম্যমূর্ত্তি। স্বামীর হস্তরেখাটুকু মাত্র সম্বল করিয়া একদা যার হুকুমে এই জমিদারীটাই চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মানুষ জানে, তাহা যে কত বড় মিথ্যা একথা তাহার চেয়ে আর বেশী জানে কে? পুরুষের পাকা বুদ্ধির তলায় নিজের বিবেক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার কাঁচা ভিতটা কতবার ভূমিকম্পের ধাক্কার মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীবুদ্ধি তখন স্বামীর কাছে একান্তে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়াছে। তা করুক, লজ্জাটুকু শুধু চোখের কাছেই কৈফিয়ৎ বহিয়া বেড়াইয়াছে, মনের তারে সে স্পর্শ যতবারই আসিয়া লাগিয়াছে, ততবারই পুরুষের শ্রীপাদপদ্মে নিজের ব্যক্তিত্বহীনতার দুর্ব্বলতাটুকু ঢালিয়া দিয়া দুঃখ বোধ করে নাই; বরং গর্ব্বই অনুভব করিয়াছে।

ইহাই যে নিয়ম।

নিজের স্বত্বা বলিতে যা-কিছু সব ঢালিয়া দিতে হইবে পুরুষের পায়ের তলায় — ইহাই নিয়ম। শুধুমাত্র পুরুষের ঘরে এ-ঘর হইতে ও-ঘরে আসবাবের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হইবে — ইহাই নিয়ম। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে পুরুষ খড়্গাহস্ত হইয়া ওঠে। সুতরাং যাহাদের শক্তি নাই তাহাদের থাকিতে হইবে ওইখানেই, নির্বীর্য্য পুরুষের অক্ষম অযোগ্য ছায়াতলেও।

তা থাক্, দুঃখ তাদের জন্য হয় না, হয় শুধু যখন ভাবি, যথার্থ শক্তিও ক্ষয় হইয়া যায় দুর্ব্বল পুরুষের পঙ্গু পায়ের নখাগ্রের সামান্য খোঁচাতে — শুধুমাত্র সৃষ্টির প্রভেদ লইয়া !

দেবী আবার বলিল, 'এই তিনটি গ্রামই নূতন ক'রে প্রতিষ্ঠা করবো ঠাকু'মা। কি কি নাম দেবো বলো ত' ?'

ঠাকুরমা অবাক হইয়া নাত্নীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আমি কি ক'রে বলবো। তুই বল, আমি শুনি।'

'নবাবগঞ্জ নামটা যে কি হবে, সেটা আমি এখনও বলবো না। আর বাকী দুটো বলচি, শোন। কালীদহের নূতন নামটা হবে —

একটু ইতস্ততঃ করিয়া দেবী বলিল, 'হবে অমুকদহ।'

'সে কি রে, অমুকদহ আবার কি ?'

দেবী আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বুঝলে না ? তুমি যেমন বোকা মেয়ে ! আরে তোমাদের সেই কর্ত্তাভোগের গল্পটি মনে আছে ত' ? সেই হিসেবে ধরে নাও ওই গ্রামটার নাম হবে—কর্ত্তাদহ।'

রসিকতায় জাহ্নবীদেবীও কম জান না। সেকেলে মেয়েমানুষ, রসিকতার একটু গন্ধ পাইলে সহজে ছাড়িতে চান না। বুঝিয়াও তিনি না বুঝার ভাণ করিয়া বলিলেন, 'তবু ত' বুঝলাম না দিদি, কর্ত্তাদহ, সে আবার কি ?'

দেবী এইবার হাসির তুফান তুলিয়া দিল। হাসির বেগ থামিয়া আসিলে বলিল, 'ওগো দহের আগে সেই বাবুটির নাম গো, যে বাবুটির নাম আমার নিতে নেই।'

'ওঃ তাই বল, মাণিকদহ! বেশ বেশ; কিন্তু ওই যে আর একটা গাঁয়ের একটা অদ্ভুত নাম বললি, তার নাম কি হবে ?'

'কর্ত্তাদহের বা-দিকের গ্রামটার যে কি নাম হতে পারে সেটা আমি এখনও ভেবে দেখিনি। কারণ আমি জানি ও-নামটা তুমিই রাখবে। তুমিই বলো কি নাম হবে ?'

'বুঝেছি দিদি, আমার মুখ দিয়ে ও-নামটা কবুল করিয়ে নিতে চাস। বেশ ওটা হবে দেবীপুর।'

ইস্‌পিঞ্জারপুর হবে দেবীপুর। কালীদহ হইবে মাণিকদহ। কিন্তু নবাবগঞ্জের নামটা যে কি স্থির হইয়াছে তাহা দেবীর মনেই জানে।

দেবী বলিল, 'বলো ঠাকু'মা এখন যাবে কবে ? আমার আর তর সইছে না।'

শীতের প্রবেশের রন্ধ্রগুলি বালাপোষটা দিয়া আরও সযত্নে ঢাকিয়া লইয়া জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'যে শীত, খাট থেকে পা সরাতে গিয়ে পা হিম হয়ে আসে এখন কি আর হয়ে উঠ্‌বে ? তারপর কিছুদিন ধ'রে হাঁপানিটাও যেরূপ বেড়ে উঠেছে·········

এমনি সময়ে মণির মা ও সুখদা দুইটি দাসী দুইটি আগুনের ধুনচি বহন করিয়া লইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ঠাকুর আসিয়া আহ্নিকের জায়গা দিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। জাহ্নবীদেবী এইবার বালাপোষটা মুড়ি

দিয়া গিয়া বসিবেন ওই আসনে। দুই দিকে আগুন জ্বলিতে থাকিবে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত যতক্ষণ আহ্নিক শেষ না হয়।

দেবী বলিল, 'এই নাও, তোমার শীত নিবারণী ভাণ্ড দুটি এসে পড়েছে, ওঠো এখন। কিন্তু কবে যাবে বললে না ত' ঠাকু'মা? তা হ'লে তুমি যাবে না বল?'

ঠাকুরমা বলিলেন, 'ও বাবা, দেবীরাণীর রাজত্বে বাস ক'রে যাবো না বলবো কোন্ সাহসে? কিন্তু শীতটা কেটে যাক্ দিদি, তার পর একটা ভালো দিন দেখে যাওয়া যাবে'খন।'

বারো

পৌষ মাঘ অতিক্রান্তের কোঠায় সরিয়া যায়, শীতের হিম হাওয়া আর বহেনা। তবু জাহ্নবীঠাকুরাণীর আরামপ্রিয় [illegible] পীড়িত দেহে তখনো জড়াইয়া থাকে শৈত্যের মৃদু আপত্তি। দেবীর সঙ্কল্প বাধা পড়িয়া যায় বৃদ্ধার মানসিক অসচ্ছন্দতায়।

আসে বসন্ত। চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া সে যেমন আসে, নিঃশব্দে একদিন তেমনি করিয়াই সে চলিয়া যায়। বসন্তের বিনয় নম্র আতিথেয়তায় এ দেশের লোক তুষ্ট হয় না। হয় শুধু বাঙলা দেশের কবির দল। ভরিয়া উঠে তাহাদের অসংখ্য পাণ্ডুলিপি [illegible] বসন্তের মর্ম্মরধ্বনিতে।

তাহার পর একদিন গ্রীষ্মের প্রধূমিত তপ্ত হাওয়া উড়াইয়া লইয়া যায় পুরাতন মৃত সব ছিন্নপত্র ধূলিকণা। গরম বাতাসের নালিশ জানাইয়া জাহ্নবীঠাকুরাণী দেবীকে ক্ষান্ত করেন আরও কিছুদিনের জন্য।

কিছুদিন পরে বর্ষণমুখর কর্দমাক্ত পল্লীর পথঘাট ঋতুর নিকৃষ্টতা প্রমাণ করিয়া বর্ষা একান্তে পড়িয়া থাকে সকলের অবহেলার মাঝখানে। আষাঢ়ের খণ্ড খণ্ড মেঘ শুধু ভাসিয়া চলে কাব্যলোকের কোন্ সুদূর সন্ধানে। মর্ত্তের লোক সে-আনন্দে সাড়া দেয় না।

তাহার পরেই শরতের শেফালীর গন্ধ বহন করিয়া আনে এক মহোৎসবের বাণী। মহামায়ার আগমন বার্ত্তায় দেশ উঠে মাতিয়া। সর্ব্বজনীন আনন্দের ঢেউ মিশিয়া যায় আবার বিজয়ার শ্রান্ত সন্ধ্যায়।

অবশেষে আসে হেমন্ত। দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেতের শ্যাম শোভায় মানুষের চোখে লাগে নেশা! পাকা ধানের শীর্ষে মৃদু বাতাসের মন্দ মন্দ ঢেউ আসিয়া দোলা দিয়া গাহিয়া যায় অন্নব্রহ্মের সনাতন পদাবলী।

তারই সঙ্গে এক হেমন্তের মধ্যাহ্নে দুই ধারের ধানের ক্ষেতের মাঝে সরু মেঠো পথ কাঁপিয়া উঠে অগণ্য লোকের পদভারে।

দেবীরাণীর বিরাট বাহিনী চলিয়াছে নবাবগঞ্জের দিকে। বাহিনীর পুরোভাগে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে সাদা বাব্ড়ি চুল উড়াইয়া, নিম্ন হইতে অতিধীরে উচ্চগ্রামে কণ্ঠ তুলিয়া দিয়া নানাপ্রকার ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চলিয়াছে বুড়া লাঠিয়াল সাহেবউল্যা জমাদার। এক হাতে তাহার বল্লম আর এক হাতে তাহার ঢাল। সাবু ...িলের পিছনে পর পর সাজানো হলঙ্গা সুলপি ঢাল ভল্লধারী সর্দ্দার লাঠিয়াল পাইকের একটা ছোট্ট মিছিল। মিছিলের পরে বন্দুকধারী দুইটি ভোজপুরী সেপাই। তাহার পরেই বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত একটি বড় পাল্কী।

পাল্কীতে বসিয়া মাণিক।

ঐশ্বর্য্যের মার্ত্তণ্ড তাপে বেচারী মাণিক ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পথচারীদের সশ্রদ্ধ—সেলাম কুড়াইয়া লইতে লজ্জায় মুখটা তাহার মাঝে মাঝে রাঙা হইয়া উঠে। বারম্বার প্রত্যাভিবাদন গ্রহণ করিতে অনভ্যস্ত

হাত ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া উঠে। কিন্তু দেবীরাণীর হুকুম। সশ্রম কারাদণ্ডের মত এ শাস্তি কিম্বা পুরস্কার তাহার ভোগ করিয়া যাইতেই হইবে নবাবগঞ্জ না পৌঁছা পর্য্যন্ত।

মাণিকের পাল্কীর পশ্চাতে আবার দুইটি বন্দুকধারী সেপাই। সেপাইদের পরে লাল ও সবুজ বনাতের টোপ ঘেরা একটা মস্ত বড় পাল্কী।

পাল্কীর ভিতর নরম তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া অতি ক্ষুদ্র মখমলের কান-বালিসে কান রাখিয়া মহাআরামে নিদ্রা যাইতেছেন জাহ্নবীদেবী।

তাহার পর আবার বন্দুকধারী ছয় ছয়টি ভোজপুরী সেপাই। সমান তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে ছোট্ট রেজিমেণ্টটি। সেপাই-সঙ্ঘের পিছনেই লাল মখমলের উপর জরির কাজ করা টোপ-ঘেরা পাল্কী। পাল্কীর দুইধারের উন্মুক্ত দরজার উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে কালো রেশমের জাল। সেই জালের ভিতর দিয়া গন্তব্যপথের দুইদিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে দেবীরাণী।

সকলের পশ্চাতে ঘোড়সোয়ার গণি খাঁ। অগণিত জনসঙ্ঘের সে দ্রুত পদশব্দ, বেহারাদের অজস্র দুলকি বুলি, সর্দ্দারদের হল্লাধ্বনি সব মিলিয়া যেন ঐশ্বর্য্যের ধূলি উড়াইয়া চলিয়াছে।

যাত্রা সমারোহের সে বিক্ষিপ্ত গুঞ্জন ক্রমশঃ বিলীন হইয়া থামিয়া যায় গ্রাম্য কৃষক রাখাল ও পথচারীদের স্তম্ভিত শ্রবণদ্বারে।

নানা কথায় লাগিয়া যায় সরলবুদ্ধির গ্রাম্য প্রতিযোগীতা।

কেহ বলে—মাঝের পাল্কীতে রাণী গেছে।

তাহাকে থামাইয়া অপর একজন বলিয়া উঠে, 'আমি দেখেছি শেষের পাল্কীতেই রাণী গেছে। দেখিস্‌নি ওইটেই ছিল জরির টোপ-ঘেরা। পাল্কীর ডাণ্ডায় ছিল রূপার হাঙ্গর। ওটার আগে ছিল ছ ছ'টি সেপাই। আমি কিন্তু ওই পাল্কীতেই সেলাম জানিয়েছি, রাণী ওইটেতেই গেছে!'

গ্রাম্য বাক-বিতণ্ডা থামিয়া যাইতে যাইতে যত সময় পার হইয়া যায়, সেই সময়ের মধ্যে পশ্চিমে সূর্য্য ডুবু ডুবু হইয়া উঠে। পূর্ব্বে নবাবগঞ্জ কাছারি হইতে গাদাবন্দুকের ক্রম দ্রাম শব্দ জানাইয়া দেয় দেবীরাণীর পৌছসংবাদ।

নবাবগঞ্জের নূতন নাম হইয়াছে জাহ্নবীগঞ্জ!

দেবী এই নামটাই পিতামহীর কাছে গোপন করিয়া গিয়াছে তাঁহাকে একটু আশ্চর্য্য করিয়া দিবে ভাবিয়া। কিন্তু দীর্ঘ শোভাযাত্রা যখন দেবদারুপাতা দিয়া সুসজ্জিত প্রবেশদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন তোরণের গায়ে ছোট করিয়া লেখা স্বাগতমের উর্দ্ধে লাল শালুর উপর জাহ্নবীগঞ্জ নামাঙ্কিত বড় বড় অক্ষরগুলি বৃদ্ধা পিতামহী পাল্কীতে বসিয়া থাকিয়া দেখিতে পাইলেন না। নাই বা পাইলেন, পরে কানে শুনিয়া দেবীর বুদ্ধির প্রশংসাও করিয়াছিলেন, খুশীও নিশ্চয়ই হইয়াছিলেন।

তোরণদ্বার হইতে কাছারিবাড়ি পর্য্যন্ত দুইধারে কলাগাছের সাড়ি। প্রত্যেকটি কদলীবৃক্ষের উপর একটি করিয়া লাল পতাকা। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে জড়ানো সব লাল নীল বেগনী কাগজের শিকলের মালা। বিচিত্র রং-বেরংয়ের সেই শিকল কাছারি দালানের রূপালি ও সোনালি বাদলায় জড়ানো থামের বাঁকে বাঁকে গিয়া মিশিয়াছে। দালানের কার্পেট বিছানো সোপানের দুই ধারে দুইটি আলিম্পন আঁকা ডাব ও আম্রপল্লব সংযুক্ত মঙ্গলকলস। সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন ডেভিস সাহেব ও সোমনাথবাবু।

মাণিকের পাল্কী আসিয়া থামিল সেইখানে।

মাণিক পাল্কী হইতে নামিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ডেভিস সাহেব হাত বাড়াইয়া দিলেন মাণিকের দিকে। সোমনাথবাবু দুই হাত তুলিয়া অভিবাদন জানাইলেন।

সুমুখের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তিনসহস্রাধিক উপস্থিত প্রজাবৃন্দ ও দর্শকের জনতা যখন একে একে হাত তুলিয়া সেলাম জানাইতে আরম্ভ করিল, মাণিক তখন মনে মনে বলিল—অসহ্য! কিন্তু বাহিরে তাহার হাত তুলিয়া রাখিতে হইল না জানি কতক্ষণ!

ইতিমধ্যে দেবী ও জাহ্নবীদেবীর পাল্কী পাশ দিয়া চলিয়া গেল কাছারি দালানের পশ্চাতে নবনির্ম্মিত অস্থায়ী বাসভবনে। সেখানে সিমেন্ট করা টিনের আটচালা দুইটি বড় ঘর। ছোট্ট একটু আঙ্গিনা। আঙ্গিনার আর এক পাশে পূজার ও রান্নার জন্য ছোট ছোট তিনটি ঘর। অদূরে দক্ষিণপ্রান্তে কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত ছোট একটু প্রান্তরের উপর পড়িয়াছে একটা বড় তাঁবু। চতুর্দ্দিক টিনের বেড়া দিয়া ঘেরা। বাজে লোক যাহাতে আশে পাশে কোথাও উঁকিঝুকি মারিতে না পারে সেজন্য অষ্ট-প্রহর চতুর্দ্দিক পাহারা মোতায়েন আছে।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর মাণিক বাইরের দেখা সাক্ষাৎ শেষ করিয়া ভিতরে আসিল। আটচালা দক্ষিণদ্বারী বড় ঘরটার বারান্দায় বসিয়া দেবী জাহ্নবীদেবীর সঙ্গে হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া কত কি বলিতেছিল।

মাণিক আসিয়াই বলিল, 'ঠাকু'মা আমাকে দিয়ে আর পোষাচ্ছে না। এইবার আপনার নাত-জামাইগিরি পদ হতে ইস্তফা নিতে হবে; বরং এই পদে সুযোগ্য দেখে আর কাউকে নিযুক্ত করুন।'

জাহ্নবীদেবী দেবীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ওরে দেবী এ কান-কাটা সেপাই বলে কী! ছেলেটা পাগল নাকি!

মাণিকের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া আবার বলিলেন, 'কি গো বাবু, এমন দিগ্বিজয়ী রাণী থাকতে ইস্তফা নেবে! সে কি গো?'

'রাণীর ওপর মহারাণী আপনি, আপনার কাছেই বিচারপ্রার্থী হচ্ছি। করুন বিচার। এই যে হাজার হাজার লোক এই অপদার্থ মানুষটাকে রাজাবাবু ভেবে হাত নামাবে আর ওঠাবে,—আর তার দণ্ড ভোগ করবো আমি? - যার ন্যায্য পাওনা তিনি থাকবেন পাল্কীর টোপের মধ্যে কিম্বা চিকের আড়ালে লুকিয়ে, আর আমার হাত ব্যথায় টন্ টন্ ক'রে উঠবে। সত্যি ঠাকু'মা এই দেখুন ডানহাতটা আমার ফুলে গেছে।'

হাসিয়া দেবী বলিল, 'কৈ দেখি? সত্যি তো। বড় কষ্ট পেয়েছো। এখন এক পেয়ালা চা খাও সেরে যাবে। তাতেও যদি না সারে ওই সঙ্গে কিছু জলযোগ।'

মাণিক বলিল, 'তাতেও যদি না সারে?'

দেবী বলিল, 'তাতেও যদি না সারে, দেবীদাসী ত' আছেই, রাত্রে বসে বসে মালিস ক'রে দেবে।'

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'এইবার আর না সেরে যায় না মাণিক। ওই কথাটুকু শোনবার জন্যই না যাদুমণির এই দীর্ঘ ভূমিকা। ঢং ও জানো বাপু!—ওই যে তোমার খাবার এসেছে, বসে যাও।'

সুখদা ঝি আসিয়া বারাণ্ডায় আসন পাতিয়া দিয়া গিয়াছে। একজন খানসামা একটা রূপার ট্রে করিয়া চা ও জলখাবার লইয়া আসিল। মাণিক আসিয়া আসনে বসিতেই দেবী ট্রে হইতে চা ও জলখাবার তুলিয়া লইয়া মাণিকের সুমুখে ধরিয়া দিল।

জলখাবারের থালার দিকে একবার চক্ষু বুলাইয়া লইয়া মাণিক বলিল, 'এও কি লক্ষ্মীপুর থেকে সঙ্গে এসেছে নাকি? এত খুব এলো কোথা হতে?'

দেবী বলিল, 'তার চেয়েও এই গুলোর মূল্য বেশী। এ সব এখানকার রাজভক্ত প্রজাদের ভক্তির ডালা। সুতরাং একটাও ফেলতে পারবে না।'

'বলো কি এত সব ?'

'যা পারো খাও। খেয়ে দেয়ে তাঁবুর ভেতর গিয়ে একবার দেখে এসো কত সব এসে জমেছে।'

'জমবেই। বাইরে থেকেই তার আভাস পেয়ে এসেছি। কিন্তু আর খেতে পারচিনে, এত মিষ্টি মুখ মেরে নিয়ে আসচে। ঠাকু'মা— ?'

'আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কোন লাভ হবে না ভাই, বরং রাণীর হুকুম নাও যদি অনুমতি দেয়,— নাই বা আর খেলে।'

মাণিক বলিল, 'প্রতি পদে অত হুকুমের প্রত্যাশা ক'রে থাকলে রাণির আমার জাঁক্ আরও বেড়ে যাবে ঠাকু'মা। সুতরাং দরকার নেই—উঠি এইবার।'

বলিয়া মাণিক দেবীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিতে লাগিল।

দেবী বলিল, 'দরকারই যদি না থাকে, আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কিসের প্রত্যাশা করচো ? আর যদি দরকার থাকে মনে করো—তাহ'লে ওই নারকেলের তৈরী গলদা-চিংড়ি আর এই গঙ্গাজলীটা খেতেই হবে।'

যথাসম্ভব দেবীর অনুরোধ রক্ষা করিয়া মাণিক উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেবী বলিল, 'চলো ঠাকু'মা এইবার ভদ্রলোকটিকে একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি তাঁবুর জিনিষগুলো।'

'তোরা যা দিদি। সন্ধ্যা হয়েছে, এইবার একটু জপতপে না বসলে রাত্তির হয়ে যাবে অনেক। ভদ্রলোক একটু লাজুক, তা হোক—তুই সাথে আছিস, ভয় নেই কিছু।'

তাঁবুর ভিতর স্তরে স্তরে সাজানো কত যে শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ উপঢৌকন তার আর ইয়ত্তা নাই। গৃহশিল্পের একটা ছোটোখাটো প্রদর্শনী

বলিলেও চলে। হাতে কাটা মিহি সুপারি ভর্ত্তি বেতের ডালা হইতে আরম্ভ করিয়া বেতের চেয়ার, ফুলের ডালি, কার্পেটের আসন, ভূম্যাধিকারিণীর নামাঙ্কিত রাশি রাশি রুমাল, তোয়ালে, কত রঙের কত নমুনার ফুলের মালা— তার আর সংখ্যা করা চলে না! তাঁবুর ভিতরে চতুর্দ্দিকে টাঙানো বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠান হইতে দেয় গন্থে এবং পদ্যে ছাপানো অভিনন্দন-পত্রের সংখ্যাও বড় কম নয়।

প্রজাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার ও ভালবাসার এমন নিবিড় পরিচয় পাইয়া মাণিকের দুই চক্ষু জুড়াইয়া গেল।

বলিল, 'বেশ চমৎকার! এ দেশের লোকের প্রাণ আছে দেবী। আর থাকবেই বা না কেন—

আত্মপ্রশংসা শোনার লোভ সম্বরণ করিয়া মাণিকের মুখ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া দেবী বলিল, 'বুঝেছি, থামো। ও-সব বলবার জন্য মাইনে-করা লোক জমিদারী সেরেস্তায় ঢের আছে। তারা বলবে এবং তাদের মুখেই ও-কথা মানায় ভালো।'

মাণিক অস্বীকার করিতে পারিল না। শুধুমাত্র বলিল, 'ধর্ম্মমতে কথাটা অগ্রাহ্য করা চলে না বটে; কিন্তু এত জনে এত কথা বলে — স্বামী দেবতাটির মুখ দিয়ে কিছুই বলতে পাবে না? সামান্য কিছু মৌখিক উপঢৌকন, তাও দেবো না?'

'দেবেই ত'। শুধু মৌখিক কেন? সোনার পাত দিয়ে সেদিন তোমার ওই মুখখানা মুড়ে দেবো — যদি তোমার উপঢৌকন সত্য হয়।'

কথাটা বলিতেই যেন দেবীর মুখ কী একটা অনাস্বাদিত স্বর্গীয় পুলকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। লজ্জামিশ্রিত একটা গভীর আনন্দে রাঙা মুখখানা আরও রাঙা হইয়া উঠিল।

মাণিক বিস্মিত হইয়া বলিল, 'সে কি গো? কি সে উপঢৌকন?'

কোন এক পল্লীবালার নিপুণ হস্তের গাঁথা সন্ধ্যামালতীর মালাটি হাতে লইয়া দেবী মাণিকের গালে সেটা দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, 'যাও, সব কথাই বুঝি আমি বলতে পারি ! ঠাকু'মাকে জিজ্ঞাসা কোরো।'

কথাটা মাণিক এইবার পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়া বলিল — যেটুকু বুঝবার বুঝে নিয়েছি দেবী ; কিন্তু সত্যি কি —

'কে জানে, হয়ত সত্যি। এবারের যাত্রাটাই উপঢৌকনের বরাত নিয়ে এসেছি কি না ? এই দেখচো না সব !'

'সে ত দেখছি। কালকে যখন কাছারিতে চিকের আড়ালে গিয়ে বসবে—তখনো ত' কত সোনার মোহর আধুলি সিকি এসে পড়তে থাকবে সুমুখে পাতা সোনার থালে। সেও দেখবো। কিন্তু এ সবই নকল, আসল কথাটি বলো।'

দেবী ফুলের মালাটিকে হাতে করিয়া বলিল, 'এই সন্ধ্যাফুলের মালাটিও সাক্ষী আছে। এরি সুমুখে ঠাকুরমা এই কিছু আগে বলে গেলেন।'

'কি বলে গেলেন দেবী ?'

'এই মালাটিকেই না হয় জিজ্ঞাসা করো।'

'ওর হয়ে তুমি বললেই, আমি ভেবে নেব যে ওই বলছে। বলো এখন।'

একটু দম লইয়া দেবী বলিল, 'লক্ষ্মীপুর থেকে যাত্রার আগে যে কথাটা আমি টের পেয়েছি, ঠাকুরমার দুটি চোখেও সেই সন্দেহই করেছেন। আশীর্ব্বাদ করো, যদি সত্যি হয়······

লজ্জায় ও আনন্দে দেবী আর বাকী কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কোনরূপে সে মাণিকের পায়ের ধূলিটা মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, 'চলো বাইরে যাই। কাছারির ছাতটায় উঠে যাতে বাইরের সব দেখা যায়, সেজন্য একটা কাঠের সিঁড়ি করতে বলে দিয়েছিলাম। করেছে কিনা

এখনো দেখবার সুযোগ পাইনি। জানো ত' আমার ছাতে উঠবার সখটা একরূপ ব্যাধির মত। তাতে আবার নূতন জায়গা।

রাণীর হুকুম ঠিকই তামিল হইয়াছে। মাণিক ও দেবী কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া কাছারি দালানের ছাতের উপর গিয়া উঠিল।

পরের দিন সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে বটপাকুরের বিবাহ উৎসব সুরু হইল।

ইস্পিঙ্গারপুর ও কালীদহের নাম কবে কিভাবে এবং কোন্ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভব হইয়াছিল জানি না। কিন্তু বিগত কালের পুরাতন স্মৃতি ও দাবী সব মুছিয়া গিয়া গ্রাম দুইটির নূতন নাম হইয়াছে দেবীপুর ও মাণিকদহ। সেই দেবীপুর ও মাণিকদহ হইতে যে দুইটি রাস্তা আসিয়া মিশিয়াছে জাহ্নবীগঞ্জের বড় রাস্তাটার সঙ্গে সেই তিনটি নব নামাঙ্কিত সঙ্গমস্থলে আজ বিরাট সমারোহ! চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য। আশপাশের গ্রামগুলি হইতে ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে সহস্র সহস্র লোক।

বড় একটা শামিয়ানার তলে সুসজ্জিত বিবাহসভা।

বিক্রমপুর নবদ্বীপ ভট্টপল্লী কাশী ও দ্রাবিড় হইতে সভায় আহূত হইয়াছেন খ্যাতিমান পণ্ডিত কুলীন ঘটক।

বর্ণশ্রেষ্ঠ ভূদেববৃন্দের ললাটে চন্দনলেখা। গলায় অর্দ্ধস্ফুট বেল ফুলের মালা।

শামিয়ানার সম্মুখে জরির ঝালর দেওয়া ছোট একটি পৃথক চন্দ্রাতপ।

চন্দ্রাতপের নীচে শ্বেতমর্ম্মরের নবনির্ম্মিত বেদী। বেদীর চতুর্দ্দিকে বিবাহের উপকরণ যথারীতি সজ্জিত।

জমিদার বাড়ির দ্বারপণ্ডিত যদুনাথ পঞ্চতীর্থ জাহ্নবীদেবীর প্রতিভূ স্বরূপ সম্প্রদাতার আসনে সমাসীন।

বড় সরকের সম্মুখেই একটা খোলা জায়গার উপর আর একটা ছোট তাঁবু পড়িয়াছে। সে স্থানটিও বিবাহমণ্ডপের একান্ত সংলগ্ন। তাহার সম্মুখভাগে চিকের আব্রু। চিকের অন্তরালে বহু কুমারী সধবা বিধবা পরিবেষ্টিত জাহ্নবীদেবী ও দেবীরাণী।

বিবাহকার্য্য সুরু হইল।

হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ও বিবিধ বাদ্যবাজনায় পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল।

শামিয়ানার তলায় উচ্চ দক্ষিণার প্রত্যাশায় উপবিষ্ট হাস্যোজ্জ্বল পণ্ডিত কুলীন ঘটক চূড়ামণি-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ বা দেবীরাণীর কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ বা রৌপ্যমণ্ডিত হুকাটির সহিত সমাদরে আলাপ করিতেছেন।

সম্প্রদানের আসনে পঞ্চতীর্থের মুখে সু-উচ্চারিত মন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই একটা ঘেরা-টোপে ঘিরিয়া দেবী ও জাহ্নবীদেবী চন্দ্রাতপের নীচে পায়ে হাটিয়া চলিয়া আসিলেন। জাহ্নবীদেবী স্বহস্তে সাদামার্ব্বেল বাধানো বেদীর মধ্যস্থলে মাটির উপর বটপাকুরের ছোট ছোট গাছ দুইটি একত্র করিয়া পুঁতিয়া দিয়া বেদীর উপর মাথা রাখিয়া গলবস্ত্রে ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন :

অশ্বত্থরূপী ভগবান্
প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ।
দৃষ্টামে হরতে পাপং
স্পৃষ্টা হয়ুর্ব্বির্দ্ধতে॥

আগামী কালের দাবী লইয়া দূরাগত পথিকের শ্রান্তি দূর করিতে, শতাব্দীর পর দেবীরাণীর কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতে দুইটি শিশুবৃক্ষ আজ স্বামী-স্ত্রীর

সম্পর্ক বহন করিয়া অবিচ্ছেদ্য আত্মার মত জড়ীভূত হইয়া রোপিত হইল সেই মর্ম্মর বেষ্টিত ভূমিখণ্ডের উপর !

জাহ্নবীদেবীর স্বর্গারোহণের সিঁড়ি ভাঙ্গিবার পরিশ্রম কতটুকু লাঘব হইল বলিতে পারি না ; কিন্তু শাস্ত্রদর্শী মুনির প্রবুদ্ধ বাক্য পালন করিয়া বংশের রত্ন দেবী তাঁহার অনেকদিনের অভিলাষ পূরণ করিলেন।

ঋষিরা বটপাকুড় প্রভৃতি সুবৃহৎ চৈত্য বৃক্ষের রোপণ, জলদান, পূজা স্তুতি ও স্পর্শ ইত্যাদি কার্য্যকলাপ বিধান করিয়াছেন। স্বয়ং নারায়ণ অশ্বত্থবৃক্ষে নিয়ত বিরাজ করেন। লক্ষীরূপা পাকুড়ের সঙ্গে ভগবানের উদ্বাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার ভাগ্য লাভ করিয়া নারীজন্ম বুঝি এতদিনে সার্থক হইল। অন্ততঃপক্ষে পুণ্যবতী জাহ্নবীর মনের ধারণা এই।

রাত্রি আটটার মধ্যে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

আসর ভাঙ্গিয়া গেল।

ভাঙ্গা-আসরে রাত্রি নয়টায় কলিকাতা হইতে আগত শ্রেষ্ঠ যাত্রার দল আসিয়া আবার আসর জমাইয়া বসিল।

পৃথক্ পৃথক্ আরও দুইটি শামিয়ানার তলে কবি ও জাড়ি গান সুরু হইয়াছে।

আলোকমালায় উদ্ভাসিত জাহ্নবীগঞ্জে হয়ত আজ সারারাত্রিব্যাপি এমনি আনন্দ-উৎসব চলিতে থাকিবে।

কথা ছিল তিনরাত্রি বাস করিয়া দেবীরাণী লক্ষ্মীপুর চলিয়া যাইবে। সপ্তাহব্যাপি যে উৎসব চলিবে দেশের দরিদ্রপ্রজারা তাহাতে প্রাণ খুলিয়া যোগদান করুক এবং যাঁহার অকৃপণ সহায়তায় এই আনন্দ মেলার আয়োজন তাঁহার উপস্থিতির প্রয়োজন এক্ষেত্রে কিছুই নাই। কিন্তু গুণমুগ্ধ প্রজাবৃন্দ

দলে দলে আসিয়া দেবীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়া এমন ভাবে ভিড় জমাইতে সুরু করিল যে সে প্রাণের ডাক অবহেলা করিবার সাধ্য দেবীর রহিল না। মাত্র দুইটি দিন থাকিয়া গেলেই যদি এত লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, সহস্র অসুবিধাও সেখানে দেবীর কাছে নগণ্য। বিশেষতঃ চতুর্থ দিনের ভোজন-উৎসবটিও দেখিয়া যাইবার সাধ মিটিয়া যায়। দেবী যাওয়া স্থগিত করিল।

আজ সেই দিন।

কাছারি বাড়ির দক্ষিণ প্রাঙ্গণে দুই সারি প্রায় শত সংখ্যক চুল্লি প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের রন্ধনশালার সারি সারি চুল্লির সে দৃশ্য যে দেখে নাই, তাহার পক্ষে এই বিরাট আয়োজন কল্পনা করাও শক্ত। চুল্লির উপরে সব খল্লার ছাউনি। চতুর্দ্দিক বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা।

ভোর না হইতেই শহর হইতে আগত যত সব পাচক ব্রাহ্মণ আসিয়া চুল্লির ভিতর আগুন ধরাইয়া দিয়া একটা বিরাট মহোৎসবের সূচনা ঘোষণা করিল। বৃদ্ধ সোমনাথবাবু ও মাণিক নিজে দাঁড়াইয়া সব ব্যাপারেই তদ্বির করিতেছেন। বেলা একটা নাগাদ রন্ধন-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

চতুর্দ্দিক হইতে আগত নিমন্ত্রিত জনস্রোত আসিয়া ভিড় জমাইয়া ফেলিল।

জাহ্নবীগঞ্জের বড় পুষ্করিণীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত বড় খেলার মাঠটার উপর সমগ্র ভূমিতে পৃথক পৃথক ভাবে চন্দ্রাতপ খাটানো হইয়াছে।

সোমনাথবাবুর তত্ত্বাবধানে সরকারের অধীনস্থ যত সব জমানবিশ সুমারনবিশ দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা উৎসবের তদ্বিরকারক হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং তাদেরি অধীনে নিম্নতর সরকার গোমস্তা ও বহু গ্রাম্যযুবক

দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল কোমরে গামছা বাঁধিয়া পরম উৎসাহভরে কাজে লাগিয়া পড়িয়াছে।

সবই প্রস্তুত। শুধুমাত্র কাঁহার যেন আগমন প্রতীক্ষায় সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। ঠিক এমনি সময়ে দুইটি পাল্কী মাঠের এক কোণে স্থাপিত তাঁবুর সুমুখে আসিয়া বসিল। পাল্কী হইতে নামিয়া গিয়া তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল জাহ্নবীদেবীর হাত ধরিয়া দেবীরাণী।

যে মহীয়সী মহিলার সদাব্রত অনুষ্ঠানে বৃহৎ পরগণার পথেঘাটে যশঃস্তম্ভ গড়িয়া উঠিতেছে, তিনি লোকচক্ষের অন্তরালে থাকিলেও লোকে জানে সকল কার্য্যেই চলিয়াছে তাঁহারি অখণ্ড আদেশ ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা, সকলের অলক্ষ্যে বসিয়াই ওই দুইটি স্নিগ্ধ ও তীক্ষ্ণ চক্ষুই সকল কার্য্যের উপর খবরদারি করিতেছেন! সুতরাং ফাঁকি দিবার কাহার ইচ্ছাও হয় না, সাহস ত' হয়ই না।

দীয়তাং ভোজ্যতাং বহুকণ্ঠের মিশ্রিত রবে ভোজন-আসর মুখরিত হইয়া উঠিল।

এই দিকে লুচি—

এক নম্বর চাঁদোয়ায় মাংস—

তিন নম্বরে ছ্যাঁচ্‌রা—

পাঁচ নম্বরে আলুবোখরার চাট্‌নী—

বিবিধ শব্দে পরিবেশনকারীদের মধ্যে উদ্যম উৎসাহের একটা বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল।

মাণিক সব জায়গায় ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার সাধ্যমত তদারক করিয়া বেড়াইতেছিল। সোমনাথবাবু মাঝে মাঝে তাঁবুর ভিতর হইতে আহ্বান পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া চিকের কাছে একবার কান পাতিয়াই আবার ছুটিয়া

যান নিমন্ত্রিত আসরে। ডাকিয়া বলেন, 'ওহে নিবারণ রাণীমা ডেকে বললেন এই দিকটায় নাকি ভুণী-খিচুড়ি কিছু কম পড়েছে।'

একটা চমৎকার শৃঙ্খলা এবং সুব্যবস্থার সঙ্গে ভোজন-উৎসব চলিতে লাগিল।

উদরপরায়ণ ব্যক্তিদের হর্ষ ও উৎফুল্লতা একটা আতিশয্যের রূপ ধরিয়া ভোজন-আসর মাতিয়া উঠিল।

তিন নম্বর চন্দ্রাতপ হইতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুখনিঃসৃত প্রাণমাতানো খণ্ড খণ্ড বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া সমবেত ভোজন-বিলাসী কণ্ঠ এক করিয়া দিল।

গদগদকণ্ঠে হরি প্রেমের জয়গানে মত্ত হইয়া উদরের ক্রিয়া আরও প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইল।

চিকের অন্তরালে জাহ্নবীদেবী এই দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়াবেগের আধিক্যে দেবীর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'বেচে থাক্ দিদিমণি, আমার মাথায় যত চুল তত তোর পরমায়ু হোক্।'

ভোজন-উৎসব শেষ হইল।

এইবার বিদায়-উৎসব সুরু হইল।

পরের দিন মধ্যাহ্নে বিরাট শামিয়ানার তলে অনুমান দশসহস্র প্রজাবৃন্দ সমবেত হইয়াছে।

শামিয়ানার দক্ষিণপ্রান্তে কাছারি দালানের সংলগ্ন স্থানটুকুতে একটি সুসজ্জিত মঞ্চ নির্মিত হইয়াছে। তিন দিকই তাহার সুদৃঢ় আবরণ দিয়া ঘেরা। সম্মুখে ঘন চিক। তাহারি মধ্যস্থলে দেবীরাণী।

দেবীর মঞ্চের বামদিকে একটা উন্মুক্ত পৃথক মঞ্চের উপর ডেভিস সাহেব দাঁড়াইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙলায় দেবীরাণীর ঘোষণা পাঠ করিতেছিলেন।

কিন্তু সেই জমিদারী খাতা খুলিয়া পাঠ করিবার সময় আমাদের নাই। শ্রবণের ধৈর্য্যও ততটুকুই আছে যতটুকু না শুনিলে নয়।

তাই চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠাব্যাপি লিখিত ভাষণের সার মর্ম্মটুকু শুধু বলিব। এবং তাহা এই ঃ

দেবীরাণীর জমিদারীতে প্রজাবৃন্দ সুখে শান্তিতে যাহাতে বাস করিতে পারে মহামহিমান্বিতা শ্রীশ্রীদেবীরাণীর ইহাই অন্তরের যথার্থ অভিলাষ।

কোন রাজকর্ম্মচারী অত্যাচার পীড়ন করিলে যে কোন প্রজা নির্ভয়ে বরাবর রাণীর খোদ দরবারে বেনামী চিঠি দ্বারা পেশ করিলেও তাহার প্রতিকার তিনি অবশ্যই করিবেন।

নূতন জমিদারীর উন্নতিকল্পে, রাস্তায় রাস্তায় কূপখনন, গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণী, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠশালা, উচ্চবিদ্যালয়, খেলার মাঠ এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য প্রাথমিক সাহায্য বাবদ রাণীমাতা দশসহস্র মুদ্রা দান করিলেন।—

ডেভিসসাহেবের বিবৃতি শেষ হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে উল্লাসধ্বনিতে সভামণ্ডপ ভাসিয়া গেল।

সর্ব্বশেষে প্রজাগণের মুখপাত্রস্বরূপ হাজি সমসের মণ্ডল একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন।

অভিনন্দন পাঠ শেষ হইলেই অজস্র করতালির সঙ্গে সভা ভঙ্গ হইল।

দেবীরাণী সজলচক্ষে পাল্কীতে গিয়া উঠিল।

জাহ্নবীগঞ্জের কাছারিবাড়ি হইতে ঘন ঘন তোপধ্বনি ছাড়িয়া দেশবাসীকে দেবীরাণীর বিদায়বার্ত্তা জানাইয়া দিল।

জাহ্নবীগঞ্জ হইতে বৈরানের নদীতট অর্দ্ধক্রোশও নয়। দেবীর সুদীর্ঘ বাহিনী নদীরধারে আসিয়া পৌছিতেই সম্মুখে অসংখ্য জনতা আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। অন্দরমহলের জনৈক বেতনভোগী খিদমৎগার দেবীর পাল্কীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'দেবীপুর হতে দশখানা ছিপ্ নৌকো এসেছে। ওদের ইচ্ছে আপনাকে বাইচ-খেলা দেখাতে দেখাতে মাণিক-দহের সীমানা পর্য্যন্ত পৌছে দেবে।'

দেবী খুশী হইয়া বলিল, 'বেশ ত', ওদের সবাইকে বলে দিও আমাদের পৌছে দিয়ে যেন সদর কাছারিতে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে বকশিস নিয়ে আসে। আর ঠাকুরমা হয়ত শুয়েই পড়েছেন, তবু তাঁর পাল্কীতেও খবরটা দিও।'

পাল্কীর উন্মুক্ত দরজার উপর ঘনকৃষ্ণ রেশমের জালের মধ্য দিয়া দেবী দেখিতে পাইল জনতা আগাইয়া আসিয়া একে একে অদূরে দাঁড়াইয়া প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়া পাল্কীতে উপবিষ্টা রাণীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাবনতশিরে সেলাম জানাইতেছে।

প্রসন্নচিত্তে দেবী সেলাম গ্রহণ করিল। নিজে জানাইল ভক্তিভরে বিধাতার শ্রীচরণে সেলাম,—সরল রাজভক্ত প্রজাদের দীর্ঘজীবনের জন্য, অটুট স্বাস্থ্যের জন্য, অনাড়ম্বর নিষ্কণ্টক জীবনযাত্রার জন্য।

নদীর ধার দিয়া আঁকাবাঁকা গ্রাম্য সরক মাণিকদহ পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছে। সেই সরক ধরিয়া দেবীর বাহিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

জলপথে অপ্রশস্ত বৈরানবক্ষে পাশাপাশি দশখানা ছিপ্ নৌকা বাইচ-খেলায় মাতিয়া উঠিল।

প্রায় এক'শ হাত দীর্ঘ হাঙ্গরমুখো কুম্ভীরমুখো কিম্বা ময়ূরপঙ্খী রং বেরংয়ের নৌকাগুলির বিচিত্রতার দিকে দু'দণ্ড চাহিয়া থাকিতে হয়। অদ্ভুত এবং অপূর্ব্ব তার গঠনচাতুর্য্য।

প্রত্যেকটি ছিপের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া একটি করিয়া লোক দেহটাকে জাড়িগানের তালে তালে নাচাইয়া ধরিয়াছে সারি গান। গানের প্রতিটি ছত্র গ্রাম্যপদ ও ছন্দে বাধা দেবীরাণীর গুণকীর্ত্তন। সঙ্গে সঙ্গে টিকারার বাজনা বাজিতেছে। ওই সঙ্গে প্রত্যেকটি ছিপের শতাধিক করিয়া বাইচ-খেলোয়ার দাঁড় ও বৈঠার তালে তালে প্রধানের অনুসরণ করিয়া ধুয়া গাহিয়া চলিয়াছে। সারিগানে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিল। সে একটা অভিনব দৃশ্য। গ্রাম্য লোকগুলির প্রাণঢালা উৎসাহ ভক্তির সে প্রস্রবণ গানের ধুয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ তুলিয়া বৈরানের জল কাঁপাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরান্তর হইতে ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্থলপথে রাণীমাতার স্থলবাহিনীর মন্দগতিকে কিঞ্চিৎ উপহাস করিয়া পুনরায় সজোরে প্রতিযোগীতার সাড়া তুলিয়া দেয়।

তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া দীর্ঘ শোভাযাত্রা স্থলপথে ধূলা উড়াইয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া মাণিকদহ পর্য্যন্ত পৌছিলে দেবীর বাহিনী বৈরানের পোলের উপর দিয়া অপর তটে গিয়া বড় সরকে পড়িল ঝাউতলার দিকে।

দশটি ছিপ্ নৌকা তখন একত্রে হঠাৎ সেখানে থামিয়া গিয়া গানের সঙ্গেই বিদায়-সেলামের বন্দনা গাহিতে সুরু করিয়া দিল।

ক্রমশঃ দেবীর বাহিনী বাক্ ঘুরিতেই একজন সমৃদ্ধশালী গৃহস্তের বড় বাড়িটার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাজভক্ত প্রজাদের ধুয়াগানের সে অস্পষ্ট সুর তখনো দেবীর কাণে আসিয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়া এক সময় মিশিয়া গেল।

তেরো

পিতামহীর কাছ হইতে যে মৃদুলাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে, তাহার প্রতিকার সাধন করিবার হাত দেবীর ছিল না।

এত বড় একটা বিস্তৃত জমিদারী শাসনে যে দক্ষতা ও অসামান্য প্রতিভার পরিচয় সে দিয়াছে, তাহা একটা অভাবিত বিস্ময়জনক ব্যাপার বলিলেও চলে। বৃহৎ পরগণা ও আশে পাশের দুই চারটি জিলা হইতে খ্যাতির যে বিপুলতা তাহার মস্তকে যশের মুকুট পরাইয়া দিয়াছে সে তুলনায় তাহার কতটুকুই বা বয়স?

কিন্তু যে-অক্ষমতার জন্য পিতামহী হাস্য রসিকতার অন্তরালে দেবীকে অম্লমধুর শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছেন, সে তুলনায় তাহার বয়স মোটেই কম নয়!

তা হউক, সে জন্য দেবীকে দোষ দেওয়া চলে না। জাহ্নবীদেবী যাগ-যজ্ঞ মন্ত্র-তন্ত্র কবচ-মাদুলী নানা প্রচেষ্টায় বংশরক্ষার জন্য বহু তপস্যাই ইতিমধ্যে করিয়াছেন। কিন্তু হাতে হাতে ফললাভের আশা যখন ব্যর্থ হইয়াই গেল, তাহার কিছুদিন পরেই, কুড়িতে বুড়ী হইয়া যাইবার বয়সটাও যখন চলিত-অপবাদের পার ঘেসিয়া মাত্র আসিয়াছে, এমনি সময়ে জাহ্নবীগঞ্জে রওনা হইবার পূর্ব্বে জাহ্নবীদেবী অতর্কিতে এমন কিছু আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, যাহাতে তাঁহার মনে হইল আনন্দের অর্থ অভিধানে কি লেখা আছে একবার খুলিয়া দেখিতে!

জাহ্নবীগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আনন্দের মাত্রাটা তাঁহার আরও পূর্ণ হইল যখন জানিলেন গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দ্দন এবার সত্য সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন।

কয়টি মাস কাটিয়া গেল বহুতর উৎকণ্ঠায়, একটা উদ্বেলিত অনাগত আনন্দের রঙিন কল্পনায়!

বর্ষ শেষ হইয়া গেল।

নববর্ষ আরম্ভ হইল।

তাহার পর বৈশাখের এক সন্ধ্যায় নবম মাসের মধ্যভাগে ব্যথার ভারে দেবী যখন পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল, তখন অন্তঃপুরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লেডি-ডাক্তার, পাশ করা ধাত্রী, নার্স সব আসিয়া জমায়েৎ হইল সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে।

অদূরে একটা ঘরের মধ্যে ঘড়ি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে মাণিক। জন্মলগ্নটুকু বলিয়া দিবে যে যন্ত্রটি তাহারই পানে সে বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতেছে।

সংসারের সর্ব্বময়ী বৃদ্ধা কর্ত্রীটি একাগ্রচিত্তে কান পাতিয়া রহিয়াছে —ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশুটি কখন কাঁদিয়া উঠিবে এই আশায়।

বাহিরের উঠানে জমিদার সরকারের ছোট বড় কর্ম্মচারীবৃন্দ ও গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত লোক, ভিতর হইতে কখন কি খবর আসে উদ্বিগ্নচিত্তে সাগ্রহে তাহারই অপেক্ষা করিতেছে।

মালখানার সম্মুখে সিংহদরজায় স্যালুটিং কামানে বারুদ ভরিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে জমাদার রঘুনন্দন তেওয়ারী। বৃহৎ গ্রামখানার ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কান খাড়া করিয়া রহিয়াছে—কখন রঘুনন্দন বারুদে আগুন দিবে! কখন গুরুম গুরুম করিয়া কাঁপিয়া উঠিবে গণ্ডগ্রামটা!

যাহার আগমনে এত ঘটা সে আসিল।

কিন্তু সে কুমার নয়।

কুমারী!

জাহ্নবীদেবী হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মেয়ে! যদি বা ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেন ত হলো একটি মেয়ে!'

তা হউক মেয়ে। দেবীর প্রথম সন্তান, মানের আসনে তাহার মর্যাদা কম নয়। জাহ্নবীদেবীর আন্তরিক অভিলাষ যদি বা কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, রাজপরিবারের সম্ভ্রম মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা চলে না কোন মতেই।

তাই বংশের নূতন অতিথির আগমনে আনন্দের ত্রুটি হইল না মোটেই।

কিন্তু অনুষ্ঠানের বাহ্যরূপটির সঙ্গে দেবীর পিতামহীর মনের মিল হইল না। অনেক দিনের চাপা কান্না তাঁহার মনের মধ্যে জমা হইয়া ছিল; সংসারের যাবতীয় আনন্দ-কোলাহলের মধ্যেও সে কান্না অন্তঃসলিলার মত একান্ত নিঃশব্দে বহিয়া গেছে। দেবীর সতর্ক চক্ষুও তাহার সন্ধান পায় নাই। কিন্তু এইবার দেবীর মনেও সন্দেহের ছায়া আসিয়া পড়িল।

ছোট্ট একমাসের শিশুটিকে পিতামহীর কোলে তুলিয়া দিতে গিয়া দেবী লক্ষ্য করিল, জাহ্নবীদেবীর মুখের উপর মনের দর্পণটা তাঁহার সতর্কতার ফাঁক দিয়াও যেন প্রত্যক্ষ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে চায়।

দেবী বলিল, 'এই মেয়েটি তোমার দেবীরই মেয়ে ঠাকু'মা। কাজেই তাকে খেলনার মত হেলাফেলা করতে পারো না। করলে মেয়ের মা কিন্তু রাগ করবে।'

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'সেই কি সুধু আমার ভয়? আর কি কিছু ভয় নেই দিদি?'

'আর আবার কিসের ভয় ঠাকু'মা?'

'এ বংশে মেয়েদের পরমায়ু শুনেচি এক'শ বছর পর্য্যন্তও হয়েছিল। যত খাটো আয়ু এ বাড়ির কর্ত্তাদের। সুতরাং আমি যে আরও দীর্ঘ দিন বাঁচবো, সে বিষয়ে ত' সন্দেহ নেই। তোমার ওই মেয়ে যখন বড় হয়ে শুনবে তোমার ঠাকুরমা তাকে নিয়ে হেলাফেলা করেছে—সেও কি আমার কম ভয় রাণী ?'

'তাই যদি হয়, তা হ'লেও……

'তা হ'লে ভয় আছে বলেই হেলাফেলা আমি করিনি দিদি। সে আমি করতেও পারি না। তবে বড় আশা ছিল তোর কোলে একটি ছেলের মুখ দেখবো। কত কাল ধ'রে ও-মুখ দেখিনা জানিস ত'? বুকটা আমার শুকিয়ে গেছে রাণী। আজকের কথা নয়! শ্বশুর থাকতেই এ সংসারে এসেছিলাম। তিনি চলে গেলেন, তারপর গেলেন তিনি, তোর ঠাকুর্দ্দা। তারপর একমাত্র পুত্র তাকেও খেয়ে বসে আছি। সকলের শেষে যে কাণ্ডটা হলো—তা ত' কোনো দিন কোনো কালেও শুনিনি। একমাত্র নাতিটাকে ছেলেটা আমার জন্মের মত বিলিয়ে দিয়ে এলো সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে। এই চোখে পর পর কতগুলো দৃশ্য ভোজবাজির মত এসে মিলিয়ে গেল নানা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে। তবু ত' বেঁচে আছি দিদি, তবু ত' যারা গেছে তারা আমার মুখের হাসি কেড়ে নিয়ে যেতে পারেনি।'

বলিতে বলিতে জাহ্নবীদেবী তাহার কোলের ভিতর সদ্যোজাত শিশুটিকে একটু আদর করিয়া বলিলেন, 'হোক তোর মেয়ে, সেই কি কখনো আমার ফ্যাল্‌না হতে পারে রে দেবী ? ছিঃ ও-কথা কখনো ভাবিসও না।'

দেবী বলিল, 'তা না হয় নাই ভাবলাম, কিন্তু ঠাকু'মা তোমার দেবীর বয়স কি এতই বেশী হয়েছে যে তোমার মনের সাধ পূরণ হবার সময় আর নেই ? বিশেষ ক'রে যাগ-যজ্ঞ কবচ-মাদুলীর ঝোঁক্

এবার হয়ত এমনই বেড়ে যাবে যে ছেলে একটি না এসে আর পারে না ঠাকু'মা।'

জাহ্নবীদেবীর মনের সঙ্গে মুখের মিলটা যে এখানে কিছু কম তাহা দেবী স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। কিন্তু দেবীর নিজের দিক হইতে মেয়েটার প্রতি ব্যবহারের তারতম্য কিম্বা কোনরূপ অবহেলা তাচ্ছিল্যের লক্ষণ পাওয়া যায় না। যাহার জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত নারী ও পুরুষের কুঞ্চিত নাসা ও কৃপণ দৃষ্টির তলায় বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যাহাকে মানুষ ভাবে শুধু মাত্র একটি রক্তপিণ্ড, ভাবে জীবকুলের মধ্যে একটা নিকৃষ্ট অবদান,—দেবী নিজেও যে সেই জাতেরই, এত বড় সত্যটা সে ভুলে কি করিয়া ?'

ভুলিতে পারে না বলিয়াই যেন সে এই একচোখো মানুষগুলির উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই আরও বেশী করিয়া মেয়েটাকে আদর করিয়া সোহাগের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। বাড়িতে দাসদাসী ও আশ্রিত আত্মীয় আত্মীয়ার অভাব নাই। কিন্তু কেহ বড় একটা মেয়েটার কাছে ঘেঁষিতে সাহস পায় না। দেবী যেমন মাতৃত্বের অধিকার লইয়া স্তন্যভারে সমুচ্ছিত স্তনাগ্র বোঁটাটি শিশুটির মুখে পুরিয়া দেয়, তেমনি করিয়াই নিপুণ হস্তে এক ফোঁটা মেয়েটিকে কোলে বসাইয়া তেল মাখাইয়া দেয়, চীনা মাটির স্নানপাত্রে সূর্য্যতপ্ত নাতি-উষ্ণ জলে তোয়ালে ভিজাইয়া স্নান করাইয়া দেয়, চোখে দেয় কাজল, কপালে দেয় টিপ,—সব শেষে তু'টি গালে এক'শটি করিয়া গুনিয়া চুমা খাইয়া জগতের লোকের উপর বাদ সাধে !

এমনি করিয়া মাতৃ আদরে পরিপুষ্ট হইয়া মেয়ের বয়স যখন ছয় মাস পূর্ণ হইল, তখন ঘটা করিয়া এক শুভদিনে জীবনের প্রথম সংস্কার অন্নপ্রাশন কার্য্যটা সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

মেয়ের নাম রাখা হইল মেনকারাণী।

চোদ্দ

প্রতি বৎসর নববর্ষের পয়লা দোসরা ও তেসরা তারিখে লক্ষ্মীপুরের রাজবাড়িতে অতীব ধুমধামের সঙ্গে শুভ পুণ্যাহ উৎসব সম্পন্ন হয়। তিন দিন তিন রাত্রি ভরিয়া গীতবাদ্য কাঙ্গালীভোজন নানারূপ আমোদপ্রমোদে কাটিয়া যায়। তৃতীয় দিবসে স্বয়ং জমিদার বাবুরা আসিয়া কাছারি বাড়ির গদিতে বসিয়া ষ্টেটের কর্ম্মচারীবৃন্দ ও মাতব্বর প্রজাদের নিকট হইতে নজরানা লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই হইল ইহাদের চিরাচরিত রীতি। সে রীতি ভঙ্গ হইয়া যায় দেবীর আমোলে। পর্দ্দানশীন মহিলার পক্ষে প্রকাশ্য সভায় বসিয়া অমন একটা দৃশ্যের সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয় বলিয়াই বহুকালের এই প্রথা আজ দশ বৎসর ধরিয়া উঠিয়া গেছে। দেবী তাহার স্বামীকে এ জন্য কত অনুরোধই না করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

মাণিক বলিয়াছিল,—'একটা প্রকাশ্য সভায় বসে এমন একটা প্রহসনের পালা আমাকে দিয়ে তুমি সাঙ্গ ক'রে নিতে চাইলেও আমি রাজি হতে পারি না। আমার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠবে, মাথায় ঠাসতে হবে মধ্যম নারায়ণ; সুতরাং এ অন্যায় হাস্যকর অনুরোধ তুমি আমাকে কোরো না দেবী। করলেও আমি পারবো না রাখতে।'

'কী জেদী মানুষ! নিজের প্রাপ্য অধিকারটাকে পায়ের তলায় এমন নির্দ্দয়ভাবে মাড়িয়ে যেতে পারে, এমন মানুষও আছে!'

'কিন্তু অধিকারটা যে আমার মোটেই প্রাপ্য নয় দেবী।'

'আমার প্রাপ্য ত!'

'হাজার বার।'

'তা যদি হয়, তা হ'লে তোমারও প্রাপ্য। আমার অধিকারেই তোমার অধিকার।'

মাণিক সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল, 'মোটেই নয়। ধনীর মেয়ের পদসেবা ক'রে যে সব পরান্নভোজী আশ্রিত তার বিত্তের প্রত্যাশা করে, তোমার যুক্তি তাদের জন্য। কিন্তু সে শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আমার মিল নেই। স্ত্রীর প্রধান কর্ম্মচারী হয়ে থাকতে আমি পারবো না। বরং আমি বলতে চাই আমার অধিকারেই তোমার অধিকার। তোমার অধিকারে আমার দাবী সবক্ষেত্রে খাটে না। এখানেও না।'

দেবী বলিয়াছিল, 'মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, ভুল করেছি ওইখানে. অপরাধ আমার ওইটুকুই। কাজেই তোমার কথার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে একটা মস্ত পাপ। সে চেষ্টাও করবো না। তুমি তোমার পৌরুষের গর্ব্ব নিয়ে হিমাদ্রির চূড়ায় বসে তপস্যা করো, আর তাতে বাধা দেবো না। দয়া ক'রে বরং সাহেবকে বলে দিও, সেই বসবে গদিতে আমার হয়ে।'

অবনত মস্তকে মাণিক দেবীর সে আদেশ পালন করিয়াছিল। এবং তখন হইতেই দেবীরাণীর প্রতিভূস্বরূপ ডেভিসসাহেব তৃতীয় দিবসে গদিতে বসিয়া নজরানার প্রাপ্য সম্মানটা বহাল রাখিয়া আসিয়াছে। এই দীর্ঘ কয় বৎসরের মধ্যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

কিন্তু ধীরে ধীরে যখন দেবীরাণীর মেয়ে মেনকার বয়স দু'বছর পূর্ণ হইয়া তিন বছরে পা দিল, তখন দেবীর মনের অনেক দিনের সঙ্কল্প প্রকাশ হইয়া গেল।

মাণিক বসিয়া জাহ্নবীদেবীর সঙ্গে সেই কথাই বলিতেছিল।

'শুনেছেন ঠাকু'মা, রাণীর নূতন বিজ্ঞপ্তিটা !'

জাহ্নবীদেবী মাণিকের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'কি ?'

মাণিক বলিল, 'এবারকার পর্ব্বদিনে মেয়েটাকে গদিতে বসাবে !—কিন্তু এটা কি সঙ্গত হবে ঠাকু'মা ? ভেবে দেখুন।'

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'ভেবে ত' দেখলাম মাণিক ; কিন্তু আমিই কেবল ভাববো ? তুমিও ত' বাবু ভালো মন্দ দুটো বলতে পারো।'

'পারি ঠাকু'মা। কিন্তু আমি খানিকটা নিয়মকানুন মেনে চলি। ইংরেজীতে যাকে বলে প্রিন্সিপ্‌ল্‌। জীবনের চলার পথ বড়ই জটিল, তাই বিবাদ বিসম্বাদ এড়িয়ে চলতে হলে একটু শক্ত না হলে উপায় থাকে না। স্বামীত্বের অধিকার নিয়ে ওর ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর পারতপক্ষে কোন প্রতিবাদ করবো না—এই আমার পণ। শুধুমাত্র আমার এই বপুটাকে নিয়ে টানাটানি করলে একটু আপত্তি আছে এবং সেই আপত্তিটুকু শুধু পালন ক'রে যেতে চেষ্টা করবো।'

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'বেশত, তুমি তোমার বপু রক্ষা ক'রে তোমার আপত্তি নিয়ে থাকো, সেও তার খুশীমত চলুক। মাঝখান থেকে আমার এই জীর্ণ দেহটাকে নিয়ে কেন টানাটানি! দোহাই তোমাদের, আমাকে শান্তিতে থাক্‌তে দাও।'

মাণিক বলিল, 'এটা হলো আপনার রাগের কথা ঠাকু'মা! দেবীকে আপনি কত ভালবাসেন সে দেবীও জানে আমিও জানি। নাতনীর ওই মুখটি দেখলে যে আপনি সব ভুলে যাবেন, একথা কি আপনিও অস্বীকার করতে পারেন ?'

'সেই ত' হয়েছে ভাই বিপদ। নাতনীর ওই মুখটি দেখে যেমন ভুলে যাই, নাতজামাইর এই মুখটি দেখলেও আবার তেমনি ভুল হয়। কিন্তু নাতনীটি যেমন পাগলী, নাতজামাইটিও হয়েছে ঠিক তেমনি পাগল! কাকে কি বলি বলো ?'

'কে পাগল ঠাকু'মা ? তোমার ওই নাতজামাইটি ? হ্যাঁ পাগলই

ত'! একথা যে স্বীকার না করবে তার মত পাগল ভূভারতে নেই!'—বলিতে বলিতে মেনকাকে কোলে করিয়া প্রবেশ করিল দেবী।

এসব হাল্কাকথায় যোগ দিবার মত মনের অবস্থা জাহ্নবীদেবীর সব সময়েই থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রের জটিলতায় গাম্ভীর্য্যের আসন অটুটই রহিল। বলিল, 'মেয়েটাকে নাকি এবার পুণ্যাহ্ন গদিতে বসিয়ে ওয়ারিশ সাব্যস্ত করচো দেবী ?'

একটা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া দেবী বলিল, 'কোন মেয়েটাকে ঠাকু'মা ?'

'তোমার মেনকা গো !'

'ওঃ তাই বলো, আমার মেয়েটা ! আমি ভাবলুম বুঝি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া অন্য কোন মেয়ের কথাই বলচো ঠাকু'মা !'

'ঠাট্টা রাখ্ দেবী। সব সময় রঙ্গরস ভালো লাগে না বাপু। এত ছেলে মানুষ তুই নস্। যা করবি অগ্রপশ্চাৎ ভেবে করাই ভালো নয় কি ?'

'নিশ্চয় ভালো ; কিন্তু তোমার দেবী খেয়ালের বশে এপর্য্যন্ত কোন কিছুই করেনি ঠাকু'মা। যা সে করেছে অনেক ভেবেচিন্তেই সে করেছে।'

'কি ভেবেছিস বল্ তো ?'

'ভেবেছি তোমার যাগযজ্ঞির যেমন ধুম পড়ে গেছে, তোমার এই নাতজামাইটির একটি পুত্ররত্ন লাভ অবশ্যম্ভাবী এবং তাই যদি একদিন সত্য হয়, তা হ'লে ওয়ারিশের সূত্রটি নিয়ে একদিন গোলযোগ বেধে যাবে। এইটুকুই আমি ভেবেছি, আমি জানি তোমাদের ভাবনাও তাই, কিন্তু ভাবনার ধারাটা আলাদা।'

অবাক হইয়া ঠাকুরমা পৌত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'এর দায়িত্ব অনেক বেশী রাণী। এ হাসিঠাট্টার কথা নয়, ছেলে-খেলাও নয়।'

দেবীর অবিচলিত স্থৈর্য্য পিতামহীর উষ্ণবাক্যচ্ছটায় বিন্দুমাত্রও টলিল না। পূর্ব্বের মতই সে অপ্রিয় সত্য যথাসম্ভব নম্রতা ও দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতে লাগিল।

'মোটেই নয় ঠাকু'মা, ছেলে নিয়ে ছেলেখেলা যারা করে, আমি শুধু তাদের দলেই নয় ঠাকু'মা। আমি নিজে মেয়ে হয়ে মেয়ে নিয়ে একটু খেলবো না, বলো কি? এ মেয়েটাও আমার পেটে হয়েছে, যদি কেউ আসে সেও এই পেটেই হবে।'

জাহ্নবীদেবীর স্নেহের পর্দ্দাটা এইবার খসিয়া পড়িল। অনেকদিনের গ্লানি বোধকরি জমা হইয়া ছিল, তাই বুঝি বাহির হইয়া পড়িল চিরাগত সংস্কারের ধরাবাঁধা রাস্তা দিয়া।

বলিলেন, 'ছেলে ও মেয়ের পার্থক্যটাকে তুই ঘুচিয়ে দিতে চাস নাকি? বিধির বাঁধন ডিঙিয়ে যাবি ভেবেচিস?'

তেমনি নির্ভীক-কণ্ঠেই দেবী উত্তর দিল, 'এমনি ক'রে তুমিও একদিন আমার হাত ধরে বাপের গদিতে বসিয়ে দিয়েছিলে! বিধির বাঁধন সেদিনও তোমার হাত হতে আল্গা হয়ে খসে পড়ে গিয়েছিল।'

জাহ্নবীদেবী এই কথার উত্তর দিতে গিয়া কথাটা তাহার রসনার তলায় চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু দেবীই সে কথার জবাব দিল, 'জানি ঠাকু'মা, দায়ে পড়েই তোমার হাতের রাজদণ্ডটা সেদিন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাই তুমি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে। কিন্তু আমার মনে সে দুর্ব্বলতা নেই ঠাকু'মা।'

মাঝখানে মাণিক বলিয়া উঠিল, 'থামো না, কি সব বলচো?'

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'রাণী, তুই কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাস?'

দেবী বলিল, 'মোটেই নয়। যেদিন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবো, সেদিন এ রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে শ্বশুর-ঘর করতে চলে যাবো। কিন্তু তা

নয় ; আমি শুধু বলতে চাই, তোমার পায়ে পড়ে ভিক্ষা চাই — আমার এই সঙ্কল্পে তুমি বাধা দিও না।'

একটু থামিয়া অনেকটা আত্ম-সমাহিতভাবে তদগতচিত্তে দেবী বলিয়া উঠিল, 'উঃ ভগবান! কী বিপন্ন করেই না এই মেয়েজাতটাকে সৃষ্টি করেছিলে! একটি পা বাড়াতেই যার এত বাধানিষেধ, তাদের মুক্তি হবে কবে?'

জাহ্নবীদেবী একটু নরম হইয়া বলিলেন, 'রাণী, দিদি আমার, ভুলে যাচ্ছিস যে এই মেয়েটা বড় হয়ে যখন শুনতে পাবে —

ঠাকুরমার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া দেবী বলিল, 'বড় হয়ে যখন শুনতে পাবে, তখন, যার জন্মাবার আগে থেকেই সরিকী চলেছে, আদৌ যে আসবে কিনা ঠিক নেই, — ওর সেই ভাইটির সঙ্গে এই মেয়েটিও সমান বখরাই পাবে। সুতরাং শুধুমাত্র আশা দিয়েই বাড়িয়ে তুলবো ঠাকু'মা — এমন মায়ের পেটে এ মেয়ে জন্মায়নি!'

'তা হ'লে সত্যি তুমি মনে মনে এমনি একটা কিছু ঠিক ক'রে বসে আছো! কিন্তু শাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধের অধিকারী পিণ্ডাধিকারীকে বঞ্চিত করলে কি পাপ হয় জানো?'

'জানি না। আমি শুধু জানি, বিত্তের লোভ দেখিয়ে প্রকারন্তরে ঘুষ দিয়ে যে ছেলের হাত হতে পিণ্ডি আদায় ক'রে নিতে হবে, তেমন পিণ্ড আমি কোন কালেই পেতে চাই না ঠাকু'মা। চতুর্থীর অধিকারী এই মেয়েটা [illegible] ভক্তিভরে [illegible] পচা জলও দুই অঞ্জলি ভ'রে তুলে [illegible] — তাই যেন আমি বায়ুভূত নিরাশ্রয় হয়ে যেথানেই থাকি না কেন একটু যেন পাই।'

জাহ্নবীদেবী দেবীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, — 'দিদি, লক্ষীটি, ভেবে কথা বলতে হয়। এই কি দেবীর মত কথা বললে!

ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সেই ভেবে এখন হতেই যে তার ব্যবস্থা করতে হবে এমন কোন কথা নেই।

দেবী বলিল, 'সে ভয়ে ত' তোমাদেরই ঘুম হচ্ছে না ঠাকু'মা! আমি ত' তেমন কিছু ভেবে কোন ব্যবস্থাই করছি না।'

জাহ্নবীদেবী আর কথা বলিলেন না। তাঁহার পক্ষাশ্রিত মাণিক বলিল, 'কিন্তু এখনি হতেই মেনকাকে ওই আসনে বসিয়ে দিয়ে যে ব্যবস্থাটা তুমি করতে চাইছো তার অর্থটা শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াবে বলতে পারো দেবী?'

'শেষ পর্য্যন্ত অর্থটা যে কি দাঁড়াবে সত্যি বলতে পারিনে। কিন্তু বর্ত্তমান অর্থটা বলতে পারি। সেটা হলো এই যে, জমিদারীটা ডেভিস-সাহেবের নয়। যার, তার সুবিধে ওখানে গিয়ে বসবার কোন দিনই হবে না। তার পরিবর্ত্তে তুমিও গিয়ে বসবে না, তোমার আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। পূর্ব্বপুরুষের নিয়মটা এতকাল ধামাচাপা দিয়ে চালিয়ে এসেছি; কিন্তু বর্ত্তমানে সেটা বদলে দেবার সুবিধে হাতে পেয়ে ছেড়ে কেন দেবো, বলো?'

মাণিক বলিল, 'কিন্তু আজকার এই সুবিধে ভবিষ্যতে যে একটা প্রকাণ্ড বড় অসুবিধায় পরিণত হতে পারে—সেটা ভেবে দেখেছো?'

দেবী অবিচলিতকণ্ঠে বলিল, 'ভেবে দেখিনি। দেখার প্রয়োজন করে না। তুমি একজন পণ্ডিত মানুষ হয়েও একথাটা কি ক'রে বল্‌চো আমি শুধু এইটেই ভেবে পাইনে! আমি যে কাউকেই কিছু দিয়ে যাবোনা। দেবার মালিক ত' আমি নই, মালিক রাজা। রাজা দিয়ে গেছে, মায়ের সম্পত্তি ভাগ পাবে সবাই। সুতরাং আমি ত' তাদের দিতে পারি না। আমি শুধু পারি একটা উইল ক'রে তাদের বঞ্চনা করতে। আমি পারি রাজার দেওয়া মুখের গ্রাস ওর মুখ থেকে কেড়ে নিতে। সে পাপ আমি করবো না ঠাকু'মা। আমাদের চক্ষু অন্ধ হলেও ধর্ম্মের দু'টি চক্ষু আজো অন্ধ হয়নি। এত বড় পাপ ধর্ম্মে সইবে কেন?'

কিন্তু শ্রোতাদের ধর্ম্মচক্ষু ইহাতেও উন্মীলিত হইল না। তাহারা হিমাদ্রির মত অচল হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সংস্কারাচ্ছন্ন বিবেকবর্জ্জিত যুক্তি দ্বারা যে সব কথার অবতারণা করিল, তাহাতে তাহারা নিজেই সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু দেবী তুষ্ট হইল না। বরং তাহার স্বাভাবিক স্থৈর্য্যের ভাবটা এইবার সত্য সত্যই খসিয়া পড়িল। উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেবী বলিল, 'এই নাও মেয়েটি। দিয়ে গেলাম ওকে তোমাদের কাছে। ওর ভাগ্যের বনেদ গাঁথবার ভার তোমাদের। জামাই আছে, তুমি আছো—যা ইচ্ছে তোমরা করো। মনুর নীতি রাজার নীতি সব কিছুকে উল্টে দিয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহারসিদ্ধ ব্যবস্থাকেই যাঁরা আঁকড়ে ধরে' থাকবে — তাদের দলে আমি নেই।'

বলিয়াই মেনকাকে জাহ্নবীদেবীর কোলে ফেলিয়া দিয়া দেবী দ্রুতপদশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* *

*

জাহ্নবীদেবী দেবীর পদশব্দের দিকে তখনো কান পাতিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়াছিলেন। হয়ত বা এমনি করিয়া তাকাইয়া থাকিতেন আরও কতক্ষণ। মাণিকের আহ্বানে তাঁহার যেন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

মাণিক বলিল, 'একজন ত' রেগে বেরিয়ে গেল ঠাকু'মা, আপনিও কি আবার কাশীযাত্রার জন্য তল্পিতল্পা গুছোতে সুরু করবেন নাকি?'

'কাশী! কি বললে মাণিক, কাশী?'

প্রশ্নটা যেন ঠিক ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারেন নাই,

এমনি একটা নৈরাশ্যজনক নির্লিপ্তভাবে জাহ্নবীদেবী উত্তর দিলেন যে মাণিক কি ভাবিয়া হাসিতে গিয়াও হাসিতে পারিল না।

বলিল, 'হ্যাঁ এমনি একটা কিছু বলেছিলাম বটে ; কিন্তু দেবী যদি এদিকে অনশনব্রত সুরু ক'রে দেয় ত' তীর্থবাসের কল্পনা আপনার ঘুচে যাবে, দু'দিনেই। সুতরাং ও দুঃসাহসের কল্পনা না করাই ভালো।'

দেবীর মেয়েটা জাহ্নবীদেবীর পরিধেয় বস্ত্রটার একটি প্রান্ত ধরিয়া আঙ্গুলে জড়াইয়া খেলিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। জাহ্নবীদেবী সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তুমি যা বললে আমি শুনেছি মাণিক। তুমি অনর্থক একটা আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছো। রাগ ক'রে কাশীবাসের ভয়টা আমি অনেককে অনেকবারই দেখিয়েছি ; কিন্তু বারবারই সংসারের কাছে স্নেহের কাছে আমার হার হয়েছে। তাই দেবতার নামে শপথ ক'রে পাপের ভার আর বাড়াবো না। তুমি দেবীকে বোলো, তার ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না।'

মাণিক বলিল, 'ঠাকুরমার এ অভিমানের কথা কি দেবী বুঝবে না বলতে চান ?'

জাহ্নবীদেবী হাসিয়া ফেলিলেন। এত শীঘ্র ওই মুখে যে হাসি ফুটিতে পারে মাণিক ভাবিতে পারে নাই। একটু আশ্চর্য্য হইয়াই দিদিশাশুড়ীর মুখের দিকে সে বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

জাহ্নবীদেবী বলিয়া উঠিলেন, 'অভিমান ? আমার অভিমানের দাম দেবে কে মাণিক ? মান-অভিমানের সে-পালা সাঙ্গ হয়ে গেছে বহুদিন আগে তোমার ঠাকুরদা'র স্বর্গে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। তার পরে যা চলেছে—সে ত' শুধু স্নেহের ওপর জুলুম। তাই চলুক, এই আমার শেষ জীবনের পুরস্কার।'

মাণিক বলিল, 'দেবীর স্বপক্ষে আপনার কাছে ওকালতি করতে যাওয়ার কোন মানে হয় না, তবু ওর আজকের আচরণ আমাকেও ব্যথিত

করেছে। একটা দুর্ভাবনাও ছিল, বুঝি বা ঠাকুরমার স্নেহের আসন একটু টলে উঠবে।'

মেনকা আঁচলের খুঁটটি ছাড়িয়া দিয়া ইতিমধ্যে জাহ্নবীদেবীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া নানারূপ কসরৎ সুরু করিয়া দিয়াছে। মেয়েটির ভাবের আতিশয্য অকস্মাৎ এমন প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিল যে জাহ্নবীদেবীর গালে একটা চুমা খাইয়াই ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের গাল বাড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, 'বুলোমা, আমি একটা টুমো খেলাম, তুমি একটা খাও।'

জাহ্নবীদেবী ছোট্ট মেয়েটাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গালে একসঙ্গে অনেকগুলি চুমা খাইয়া বলিলেন, 'শুনলে ত' জামাই বাবু? শুধুমাত্র তোমার গিন্নী নয়, তার মেয়েটা পর্য্যন্ত বাদ সাধতে সুরু ক'রে দিয়েছে। কাজেই এ আসন যেদিন টলবে, তার আগে বোধকরি চিতার আগুনে এ দেহটা মিশে যাবে। সুতরাং আমার কাছে ওদের জিৎ হবে চিরকাল।'

মানিক বলিল, 'ঠাকু'মা হারজিতের প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে একটা সত্য কথা আজ স্বীকার না ক'রে আর পারি না। দেবীর এই মতবাদের মূলে যে অভিযোগ জমা হয়ে রয়েছে, তাকি শুধুই ভুয়ো? শুধুই কি সেগুলো মিথ্যাশ্রিত মনের বৃথা আস্ফালন? তাই কি? পিণ্ডাধিকারীর স্বপক্ষে মনুর দায়ভাগের নীতির মিথ্যা দোহাই দিয়ে — তাকে ঠেকিয়ে রাখবো কত কাল? তবু যদি বা রাখা যেত; কিন্তু বর্ত্তমান কালের যে-সব মনু পরাশর সুস্থদেহে বিরাজ করছেন, তাঁদের কালভেদে উদার ব্যাখ্যাটুকু কাঞ্চনমূল্যের একটা অখণ্ড প্রভাববলে চাপা পড়ে গিয়ে মানুষকে যে বিদ্রোহ ক'রে তোলে ঠাকু'মা। পুঁথির ভাষা তাই হৃদয়হীন যুক্তিতর্কের আবর্ত্তে পড়ে ভেসে যায়। মানুষের অন্তরের বেদীমূলে যে অন্তর্যামী নিয়ত

বাস করছেন, তাঁরই শোনা কথা যেন মানুষ তখন শুনতে পায় বেদবাণীর মত! বিবেকবুদ্ধি হৃদয়ের সমন্বয়ে শাস্ত্রীয় একটা উদার ব্যাখ্যা তখন গড়ে ওঠে। অবশেষে তাকেই মেনে চলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। আপনার দেবীর অবস্থাও বোধকরি আজ তাই হয়েছে।'

জাহ্নবীদেবী বলিলেন,—'হয়ত তাই। কিন্তু মাণিক বহুদিনের অর্জ্জিত সংস্কারকে বিসর্জ্জনই বা দেব কোন্ সাহসে? যতই জীর্ণ হোক্ ওই ভাটপাড়ার খাতা, দয়া মায়া ওদের যদি নাও থাকে, পোকায় যদি কেটেও থাকে সেই নথী, তবু তার উগ্র ঝাজ্‌টা যে ভাই আজও মিলোয়নি। তাই ভয় হয়, সংশয়ে মন যায় পিছিয়ে। সব চেয়ে বড় কথা মাণিক, মেয়ে হয়ে পুরুষের সঙ্গে লড়াই করবো এ যে ভাই মনেও আনতে পারি না! চেয়ে থাকতে হয় ওই ওঁদেরই মুখের পানে, যাঁদের অনুশাসনের প্রতিটি অক্ষর বুঝি বা না বুঝি মেনে চলতেই হবে।'

মাণিক এই বিদুষী মহিলার অকপট স্বীকার-উক্তিতে খুশী হইয়া বলিল, 'ঠিকই বলেচেন ঠাকু'মা। আপনারা নারী হয়েও নারীর প্রতি কতটুকু সমবেদনা জানাতে পারেন, কতটুকু পারেন বিবেকবিরুদ্ধ একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে? কিন্তু এ সাম্যবাদের কথা নয়, দেবীও তা বলে না। তার প্রতিবাদ সনাতনী এই প্রথা কিম্বা সংস্কারের বিরুদ্ধে, যার মূলে আছে স্বার্থপরতা। কতগুলো জটিল ও তীক্ষ্ণ বাক্য দিয়ে সে-মত হয়ত খণ্ডন করা চলবে; কিন্তু ধর্ম্মের দুটি চক্ষু যে অন্ধ হয়নি—এ কথা আমিও বিশ্বাস করি ঠাকু'মা। প্রকৃতির রুক্ষ অভিশাপে তাঁর যোগ ভঙ্গ হবে। পরিণাম তার ভয়ঙ্কর! আচ্ছন্ন বুদ্ধি ও স্থূলদৃষ্টির কুজ্‌ঝটিকা ভেদ ক'রে সে পরিণাম মানুষ দেখতে পায় না বটে, কিন্তু এ দায় হতে যে মানুষ মুক্তি পায় না এ দিবালোকের মতই স্পষ্ট। সুতরাং এ স্বার্থপরতা কেন? যাদের অভ্যুদয়ে পুং নামক নরক হতে উদ্ধার লাভ করা যায়,

সেই পুংনামক জীবগণ কালক্রমে যখন তাদের জীবনী লাম্পট্যে ব্যাভিচারে হৃদয়হীনতায় কলুষিত ক'রে তোলে, তখন অনুশাসনের [illegible] কুম্ভকর্ণের দেশে ছুটে পালায় কেন বলতে পারেন? সুতরাং যে মনেপ্রাণে অসত্যটা বর্জ্জন ক'রে সত্যটা গ্রহণ করতে পেরেছে—তার ভয়ই বা কিসের? সে যদি বিদ্রোহী হয়েই ওঠে সে তার শক্তিবলেই উঠবে। আমাদের মত দুর্ব্বলাত্মার সেখানে ভীরুর মত বিচরণ ক'রে শুধুমাত্র লজ্জিতই হতে হবে। সুতরাং কাজ নেই একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি ক'রে। যা ভাল বুঝে করুক সে।'

পনেরো

ভালবাসা যেখানে যত গভীর দ্বন্দ্বও সেখানে তত বেশী। একান্তই সাময়িক দুর্ব্বলতার উপর আশ্রয় করিয়া যেমন দ্বন্দ্ব ও বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়, আবার তেমনি করিয়াই একান্ত অসঙ্কোচে তাহা মিলাইয়া যায় স্নেহের নিবিড় বাহুপাশে।

দেবীর সতেজ নির্ভীক ও উদার মনের ইচ্ছা সংস্কারগত প্রবহমান যুক্তিতর্কের কাছে যদি বা হার হইয়া থাকে; কিন্তু স্নেহশীল অন্তরের কাছে সে অপ্রত্যাশিতভাবেই জয়লাভ করিল!

ফাল্গুনের শেষাশেষি পশ্চিম হইতে দুইজন কৃতকর্ম্মা অভিজ্ঞ কারিকর আসিয়া উপস্থিত হইল। বড় হল ঘরটার দেয়ালের গায়ে বড়-রাজার যে

দুইটি সুবৃহৎ শ্বেতদন্ত বহুদিন ধরিয়া লৌহশৃঙ্খলের দৃঢ় বন্ধনে লম্বিত ছিল, তাহার একটি নীচে নামাইতেই নবাগত কারিকরের হাতে গিয়া পড়িল।

বড়-রাজা দীর্ঘপ্রস্থে যত বড়ই হউক তাহার দন্ত কি এতই সুবৃহৎ যে সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করিয়া লৌহশৃঙ্খল এতকাল তাহার ভার বহন করিয়া আসিয়াছে ; যদিও জাতিতে সে নর !

কিন্তু জাতিতে নর হইলেও সে মনুষ্যপদবাচ্য নয়, ছিল নরহস্তী। আদর করিয়া স্বর্গীয় কর্ত্তারা নাম রাখিয়াছিলেন বড়রাজা। বাবুরা কবে স্বর্গে চলিয়া গেছেন, পোষাহাতীটাও মরিয়া গিয়াছে কিন্তু বাবুদের দেওয়া-নাম বড়-রাজা আজও মরে নাই। তাই বলিতেছিলাম বড়-রাজা।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাটালির খুট্ খুট্ শব্দে হাতীর দাঁতের হাতী তৈয়ারী হইতেছে। সূক্ষ্ম কাজ সহজে আগাইতে চায় না। তবু সময় আর নাই, ইহার মধ্যেই শেষ করিতে হইবে। ফাল্গুন শেষ হইয়া গেছে। চৈত্রও শেষ হয় হয়। আর পক্ষাধিক কাল পরেই নববর্ষের পুণ্যাহ সুরু হইবে।

চতুর্দ্দিকে মহালে মহালে তহশীলদার চাক্‌লাদার ইজারদারের নামে নামে চলিত-পত্র চলিয়া গেছে। কাছারিদালানের চুন ফেরানো হইতেছে। রাজধানীর রাস্তাঘাটের সংস্কার হইতেছে। দেবীরাণীর শিশুকন্যা মেনকারাণী এবারকার পুণ্যাহে জননীর প্রতিভূস্বরূপ গদিতে গিয়া বসিবে, তাই অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবারকার গুরুত্ব ও বিশেষত্ব অধিক। গ্রামের সংস্কার ও রাজবাড়ির সাজসজ্জাও এবার অনেক বেশী।

হাতীর দাঁতের হাতীটির জন্য অন্দর হইতে দেবীরাণীর তাগিদ আসিয়াছে। হাতী তৈয়ারী সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার হাওদা তৈয়ারী হইতেছে। আর কয়টা দিনের মধ্যে শেষ না করিলেই নয়। তাই অবিশ্রাম কাজ চলিতেছে।

চৈত্র সংক্রান্তির গাজনউৎসবের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গা-বর্ষের শেষ দিন বিদায় লইল। নতুন সালের নূতন প্রভাতে লক্ষ্মীপুর রাজবাড়ির নহবতে আবার সানাই ভৈরবী ধরিয়াছে।

পয়লা ও দোসরা কাটিয়া গেল যথারীতি গতানুগতিকতার মধ্য দিয়া। তৃতীয় দিবসের সমারোহে ছিল একটা নতুন প্রচলনের অভিনবত্ব!

নিজ হাতে দেবী পরিপাটিরূপে মেনকাকে সাজাইতে বসিয়াছে। মেয়েটি মায়ের রূপে রূপবতী! তাহার উপর কলাসঙ্গত অঙ্গরাগ সাজ সজ্জার একটা স্নিগ্ধ দীপ্তিতে প্রাসাদ কক্ষ আলোকিত হইয়া উঠিল।

শিরোপরি প্রথমেই লক্ষ্য হয় ওই গৈরিকরঞ্জিত নক্ষত্রখচিত শিরস্ত্রাণ। পরণে সবুজ রঙের বেনারসী সিল্ক। পরিধানের পদ্ধতিটা যথাসম্ভব পশ্চিম দেশীয়। কোমলদেহ জড়াইয়া আছে কমলারঙের সিল্কের কামিজ। তারই উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে লম্বমান হইয়া একটা বেগুনী উত্তরীয়। নীবিবন্ধে একটি লাল সিল্কের ওড়না। পায়ে জরির সেলিমসাহী নাগরাই। ললাটের উপর পাগড়ির মধ্যস্থলে মসৃণ একগুচ্ছ পালক সংযুক্ত হীরার ব্রুচ্। গলায় নবরত্নের হার।

কাছারিদালানের সম্মুখে ডেভিস্সাহেব সোমনাথবাবু ও বহু রাজকর্ম্মচারী নতুন নতুন পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল রাজকুমারী মেনকারাণীর আগমন প্রতীক্ষায়।

অদূরে তখন অগ্রগামী জনতাবহুল মিছিলের দিকে একই সঙ্গে সকলের দৃষ্টি পড়িল!

সর্ব্বাগ্রে জরির পোষাক পরিহিত রাইফেল কাঁধে করিয়া ছয়ফিট্ উচ্চ যে মানুষটি মিলিটারী পদক্ষেপে আগাইয়া আসিতেছে, তাহারই নাম জমাদার রঘুনন্দন তেওয়ারী।

তাহার পরেই মেনকার প্রিয় ভৃত্য নন্দ ঘোষ বাহকরূপে মেনকাকে স্কন্ধে তুলিয়া মহানন্দে বক্ষ স্ফীত করিয়া আসিয়া পৌছিল কাছারি দালানের সিঁড়ির কাছে।

হলের মধ্যে জরির সুবৃহৎ মসলন্দের উপর নবনির্ম্মিত হাতীর দাঁতের সেই হাতীটি। তাহারি উপর সেই হাওদা।

সোমনাথবাবু আগাইয়া আসিয়া নন্দ খানসামার কাঁধ হইতে মেনকাকে তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিতে গিয়া ব্যর্থ হইলেন। দুইটি হাত দিয়া রাজকুমারী তখন ভয়ে প্রিয় অনুচরের কেশবিরল মস্তকটিকে জোরে সাপটাইয়া ধরিয়াছে। হাসিতে হাসিতে তখন ডেভিসসাহেব আগাইয়া আসিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঠেলাগাড়ীতে চড়িয়া বাংলোয় আসিয়া সাহেব ও মেমসাহেবের সঙ্গে এক ঘণ্টা ছুটাছুটি করিয়া যে সখ্যতা জন্মিয়াছে, তাহাতে সাহেব হাত বাড়াইতে পারেন।

কিন্তু মেনকা আজ বহুলোক দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সাহেব তখন যে লাল মোহরটি মেনকাকে নজর দিবে বলিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেইটি পকেট হইতে বাহির করিয়া মেনকার হাতে তুলিয়া দিলেন।

কাঞ্চনমূল্যের যে বশীকরণ শক্তি দৈবশক্তিকেও হার মানাইয়া দেয়, তাহাতে আর অতটুকু মেয়ে বশ মানিবে না কেন?

এই অবসরে নন্দঘোষ মেনকাকে হাতীর দাঁতের হাতীর পিঠে হাওদার মধ্যে বসাইয়া দিয়া নিজে মেয়েটিকে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সম্মুখে সোনার থাল। থালার উপর একটা সোনারই আতর দান।

স্বর্ণপাত্রটির উপর সর্ব্বপ্রথম সোমনাথবাবুর গিনিটা নজরস্বরূপ প্রদত্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই সোমনাথবাবুর অনুসরণে ধনী জোতদার ইসমাইল খাঁর একটা সোনার সিকি পড়িল। পর পর জাহ্নবীগঞ্জের হাজি সমসের

মণ্ডল, বানর-গাছির দীনুদাস কৈবর্ত্ত, সোনাপঁচা বিলের ফুব্বরআলি খলিফা প্রভৃতি যত সব সম্ভ্রান্ত মাতব্বর প্রজা, তহশিলদার, কর্ম্মচারীবৃন্দ যার যার পদবীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নজর ছড়াইয়া দিতে লাগিল ওই সোনার থালাটার উপর। সেই সঙ্গে কেহ বা মেনকারাণীর হস্তে সন্তর্পণে তুলিয়া দিল গুটি কয়েক বেলুন। কেউ দিলে কর্ক-আঁটা পাঁচশিশি লেবেনচুস, প্রমাণ সাইজের মস্ত বড় একটি আলুর পুতুল। কেউ বা দিলে তুলার তিত্তির পক্ষী, হাওয়া গাড়ী, হাউই-জাহাজ, মাটির পুতুল·········আরও কত কি!

নজরানার শেষের ভেটগুলিই যে মনিবের সুনজরে পড়িয়াছিল, তাহা দুই হাত জোড়া লেবেনচুষের শিশিগুলি ধরিবার নমুনা দেখিলেই বুঝা যায়।

উপঢৌকন পর্ব্ব শেষ হইতেই নন্দঘোষ মেনকাকে হাওদা হইতে কোলে তুলিয়া লইল। এই দিকে তৎক্ষণাৎ চারপাঁচজন লোক হাওদাসহ হাতীটি ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া আসিয়া রাজবাড়ির বড় ও আসল হাতীটির হাওদার মধ্যস্থলে আনিয়া বসাইয়া দিল। মেনকা তাহাতে বসিল, অতি সন্তর্পণে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া নন্দ ঘোষ তাহার পাশেই বড় হাওদার একদিকে বসিল। অপর দিকে বসিলেন ডেভিস সাহেব ও সোমনাথবাবু। রঘুনন্দন রাইফেল উঁচু করিয়া বসিল মাহুতের পশ্চাতে।

হাতীর আগে পাছে রওনা হইল একটা প্রকাণ্ড মিছিল। পুরুষানুক্রমিক চলন সাজাইয়া এমনি করিয়া কাছারি হইতে রাজবাড়িতে যাওয়ার প্রথা আজ আরও বিশেষ জাঁকজমকে সজ্জিত হইয়াছে।

লক্ষ্মীপুরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত বেশ্যাপল্লী হইতে আসিয়াছে যত সব গণিকা। গ্রাম্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বরণডালা হাতে করিয়া মিছিলের সর্ব্বাগ্রে চলিয়াছে সেই সব গ্রাম্য নটীর দল। শুভযাত্রার পুরোভাগে এমনি করিয়াই বরাবর তাহারা স্থান পাইয়া আসিয়াছে। তাহার পর পর

দেশী ঢুলির দল ও বিলাতী ব্যাণ্ড। বাজকরের পশ্চাতে চলিয়াছে রূপার আসাসোটা, হাঙ্গরমুখো সোনার গিল্টিকরা দণ্ড, জরির মস্তবড় রাজছত্র বহন করিয়া যত সব পদাতিক সঙ্ঘ। তাহাদের পিছনে আসিতেছে কর্ম্মচারীবৃন্দ। প্রত্যেকের মাথার উপর চাঁদির টাকা পরিপূর্ণ আলিম্পন-আঁকা মাটির গোলক। গোলকের পৃষ্ঠে অঙ্কিত সেই মাঙ্গল্য-চিত্র বোধ করি সম্বৎসরের ধনাগমের শুভসূচনা ঘোষণা করিতেছে। সর্ব্বশেষে মেনকারাণীর রাজকীয় ভূষণে সজ্জিত হস্তীটি। ঐশ্বর্য্যের একটা চোখ ঝলসানো দীপ্তি ঝলমল করিতেছে হাতীটার সর্ব্বাঙ্গে। হস্তীর পশ্চাতে প্রজাবৃন্দের একটা বিপুল জনসঙ্ঘ!

লক্ষ্মীপুরের প্রকাণ্ড বড় দীঘিটা প্রদক্ষিণ করিয়া মিছিল যখন প্রায় রাজবাড়ির আঙ্গিনায় আসিয়া পৌছিল, তখন দেবী ও জাহ্নবীদেবী ছাত হইতে নীচে নামিয়া চিকের অন্তরালে হলঘরটায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হলঘরটার সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আসিয়া মিছিল থামিয়া পড়িল। হাতীটা হাঁটু ভাঙ্গিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িতে একে একে সকলেই নীচে নামিয়া পড়িল। রঘুনন্দন দুইধারের লোক সরাইয়া দিয়া রাস্তা করিয়া দিল! উড়ন্ত বেলুন হাতে মেনকারাণী নন্দ ঘোষের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ সম্মুখের দিকে আগাইয়া যাইতেই দুই দিক হইতে অজস্র জনতার অভিবাদন ও জয়-ধ্বনির মধ্য দিয়া হলঘরের বারেণ্ডায় গিয়া পৌছিল।

এই দিকে ডেভিস সাহেবকে পুরোভাগে রাখিয়া টাকাভর্ত্তি মাটির গোলক-গুলি মস্তকোপরি বহন করিয়া চলিল কর্ম্মচারীবৃন্দ খাজাঞ্চী কোঠার দিকে।

মেনকারাণী ততক্ষণ অন্দরে পৌছিয়া নন্দের কাঁধ হইতে ঝাঁপাইয়া গিয়া উঠিয়াছে মাতৃঅঙ্কে। দেবী অজস্র চুম্বনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জাহ্নবী-দেবীর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'মিনু মা এইবার বুড়ো মায়ের পায়ের ধুলো নাও।'

কিন্তু মিনুমা অনেক দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছে। মার কোলটা আর সে এখন ছাড়িতে রাজি নহে। তাই সে পুনরায় ঝাঁপাইয়া উঠিল মায়ের কোলে।

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'পায়ের ধূলোয় দরকার নেই, অমনি বেঁচে থাক। বড় হয়ে যেন মায়ের নাম রেখে যেতে পারে এই আশীর্ব্বাদ করি। তা পারবে দেবী। মেয়েটি কম সেয়ানা নয়। এতটুকু মেয়ে আমি ভেবেছিলাম বুঝি বা কেঁদেকেটে কি কাণ্ডই না ক'রে বসে। যা হোক মেয়ে তোমার মান রেখেছে।'

'তা রেখেছে।' আশীর্ব্বাদ করো ঠাকু'মা। লক্ষ্মীপুরের ভাবী লক্ষ্মী হয়ে বেঁচে থাক।'

লক্ষ্মীপুরের ভাবী লক্ষ্মী হইবে মেয়েটা! এতবড় আশীর্ব্বাদ বোধকরি ঠাকুরমা — মনেপ্রাণে কিছুতেই করিতে পারিলেন না।

ষোল

ঐশ্বর্য্যের অপর্য্যাপ্ত সম্ভারে পরিপূর্ণ যে সংসার, সেখানেও ব্যথা বেদনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগ আসিয়া এক এক সময় এমন বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিয়া তোলে যে তাহার উপর হস্তক্ষেপের অধিকার দরিদ্রের যেমন সাজে না, ধনীর ঐশ্বর্য্যের রক্তচক্ষুও স্তিমিত হইয়া আসে প্রাকৃতিক সুখ দুঃখের অনির্দ্দিষ্ট বিধানে।

দেবীর আদর্শ সংসারেও এমনি একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছিল একটা ছেলে ও একটা মেয়ের সমস্যা লইয়া। দেবীর বুদ্ধি বিদ্যা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গর্ব্বিত তেজে সে মেঘ হয়ত কাটিয়া গেল; কিন্তু সেটা সাময়িক।

দেবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, সেটাও হয়ত সাময়িক। বাঙলাদেশের মেয়েরা যে ভাগ্য লইয়া মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হয় তাহাতে তাহাদের ভাগ্যে জুটে অভিভাবক অভিভাবিকাদের মর্ম্মান্তিক তাচ্ছিল্যের একটা বিকৃত রূপ! মেয়েদের ভাগ্যে অভ্যর্থনার এই একঘেয়ে রীতিটা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ম দেবীর মনে একটা যথার্থ ই পীড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। ছোট্ট মেনকার জীবনটা উত্তরাধিকারীর সমান সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া দেবী হয়ত মনে মনে ভাবিল, 'যে যাই বলুক, ভেঙে দিয়েছি একদর্শী এই নিষ্ঠুর নীতিটা। মানবতার দিক দিয়ে এর দক্ষিণা সে আজ না পেলেও আগামীকালের দাবী তার রইলই।'

হয়ত রইলো। কিন্তু বহুদিনের সংস্কারের উপর গা ভাসাইয়া দিয়া মানুষের দুইটি চক্ষু যে সত্যই অন্ধ হইয়া গেছে; — হঠাৎ তাহাদের চোখের ছানি কাটিয়া না দিয়া অত অপর্য্যাপ্ত আলো ধরিলে তাহা সহিবে কেন? জাহ্নবীদেবী তাহার বুদ্ধিকে ভয় করিয়া চলেন, স্নেহের কাছেও তাহার দুর্ব্বলতা কম নয়! সুতরাং দেবীর অনুরোধ উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিল না; কিন্তু মনের পুরাতন তারে হয়ত নূতন বাজনা কিছুতেই বাজিল না। ওই যে মাণিক, তর্কের খাতিরে সেদিন দেবীকে তাহার অলক্ষ্যে বসিয়াই কত না সমর্থন করিল; কিন্তু মেনকার মুখের দিকে চাহিয়া শুধু তাহার সন্তানবাৎসল্যই জাগিয়া উঠে, পুত্র-মুখ সন্দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাটা ত' কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না!

জাহ্নবীদেবীর যাগযজ্ঞের ধূম এইবার আরও বাড়িয়া গেছে। এমন কি সুদূর কোকিলামুখ আশ্রম হইতে কোন এক সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছ হইতে ভিক্ষা চাহিয়া একরত্তি শিকড় আনিয়া তাহাও বাটিয়া খাইতে দিয়াছেন দেবীকে।

* *

*

লোকে বলে তাহাতেই বুঝি দেবীর আবার সন্তান সম্ভাবনা হইয়াছে।

কিন্তু সিদ্ধপুরুষের প্রদত্ত শিকড় কিম্বা যাগযজ্ঞ হয়ত শুধুমাত্র উপলক্ষ্য। দেবতা হয়ত মনে মনে ভাবিলেন, 'তোদের ধন আছে, তাই আড়ম্বর করেছিস্; কিন্তু তোদের আন্তরিকতা দেখে যে আমি প্রসন্ন হয়েছি—এইটেই বড় কথা। তাই বর দিলাম, অভীষ্ট বাঞ্ছা তোদের পূর্ণ হোক্।'

ঊর্দ্ধে বসিয়া স্বর্গের বাতায়ন খুলিয়া দেবপুরুষ যে কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন এতদিনে বুঝি তাহার নিবৃত্তি হইল।

বৎসর ঘুরিয়া না আসিতেই সম্ভাব্য সন্তানের জননী হইয়া দেবীরাণী এই দশটি মাস যে উৎকণ্ঠায় পার করিয়া দিয়াছে, তাহার অবসান হইল একটা বিপুল উল্লাসে, অবিশ্রান্ত আনন্দের মুক্তধারায়!

জাহ্নবীদেবীর মুখখানা দেখিলে আজ স্পষ্টই মনে হয়, সুদীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে তিনি অনেক হাসি হাসিয়াছেন, দেবীর কীর্ত্তিগরিমার উজ্জ্বল দিনগুলি তিনি উপভোগ করিয়াছেন বহু তৃপ্তির সঙ্গেই; কিন্তু অদ্যকার এ হাসি এ তৃপ্তির সঙ্গে যেন তাহার কোন তুলনাই হয় না।

ছোট্ট মেয়েটির মত এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 'ওরে ছেলে হয়েছে, দেবীর আমার ছেলে হয়েছে! ওরে তোরা কে আছিস্, মাণিকটা গ্যালো কোথায়?'

পাশের ঘর হইতে হাসিভরা লজ্জিত মুখখানা বাহির করিয়া মাণিক বলিল, 'এই যে ঠাকু'মা, আমি এখানেই বসে আছি।'

'বসে আছো! আজকে কি বাপু বসে থাকবার দিন! যাও, এই নাও মোহরের পাঁচটি থান, ছেলের মুখ দেখে এসো। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, ওরে নন্দ, সোমনাথবাবুকে ডেকে আন। কাছারি ছুটি দিয়ে দিক্। তোপ্ ছাড়তে বল। বিলিতি বাজনা আনতে বল। ময়রার দোকানে বায়না দে।'

সূতিকাঘর হইতে দেবীর খিন্নকণ্ঠ ভাসিয়া আসে।

বলে, 'ঠাকু'মা মেনকাকে দেখো। জাহ্নবীদেবীর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার খোলা থাকবে আজ সারাদিন, কিন্তু ওই মেয়েটার পেটে হয়ত সময়মত দু'মুঠো ভাতও পড়বে না।'

জাহ্নবীদেবী গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'চুপ্ কর্ বজ্জাত্ মেয়ে। আজ যা করবার আমি করবো। এ দশ দিনের রাজত্ব আমার হাতে জানিস্?'

দেবী হাসিয়া বলিল, 'শুধু দশটা দিন কেন দিদিমণি? দেবী যতদিন বেঁচে থাকবে রাজত্ব তোমার হাতে ততদিনই থাকবে। দেবী শুধু তোমার বাঁদী।'

'বেশ ত' বাঁদী যদি বাঁদীর মতই থাক্‌বি।'

বলিয়াই জাহ্নবীদেবী দ্রুতপদশব্দে অন্যত্র চলিয়া যান। ধনজনের কিছুরই অভাব নাই। কাজও এমন কিছু পর্ব্বতপ্রমাণ জমা হইয়া নাই। তবু যেন আজ জাহ্নবীদেবীর ছুটি নাই। কাজ থাক্ বা না থাক্ অকারণে ছুটাছুটি করাটাই শুধু আজ তাঁহার কাজ।

* *

*

একমাস পর একমাসের শিশুটিকে কোলে লইয়া জাহ্নবীদেবী রোদে বসিয়া তেল মাখাইয়া দিতেছিলেন।

শীতের রৌদ্রে পিঠ পাতিয়া দিয়া পিতামহীর কাছে দেবীও বসিয়াছিল।

সদ্যপ্রসবজনিত অবসন্নতায় তাহার মুখের উপর একটা ম্লান সৌন্দর্য্যের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। চোখের পাতা দুইটি যেন ঘুমের মাদকতায় ভারী হইয়া উঠিয়াছে, টানা চক্ষুর সে তন্দ্রাজড়িত দৃষ্টি যেন আরও ঢুলু ঢুলু হইয়া উঠিয়াছে অর্দ্ধস্তিমিত একটা ঝিমাইয়া-পড়া ভাব লইয়া।

একদৃষ্টে তাকাইয়া দেবী লক্ষ্য করিতেছিল বৃদ্ধ ঠাকুরমার নবজাগ্রত উদ্যমশীলতা। তেলমাখা সন্তর্পিত হাতটির প্রতিটি টানে যেন স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে ছোট ছেলেটির কাঁচা অঙ্গে।

এমনি সময়ে মণির মা আসিয়া বলিল, 'দিদিমণি, জামাইবাবু তোমায় ডাক্‌ছে, কি একটা জরুরী কথা আছে, এক্ষুণি যেতে হবে।'

ঠাকুরমা বলিলেন, 'নিয়ে যা খোকাকে এই সঙ্গে, জামাইকে বলিস, ঠাকুরমা খোকার নাম রেখেছে জহরলাল।'

দেবী হাসিয়া বলিল, 'ঠাকুরমার যেন আর তর সইছে না। মুখে-ভাতের দেরী আছে এখনো পাঁচ ছ'মাস। এরই মধ্যে নাম পর্যান্ত ঠিক হয়ে গেল!'

'অভিধান খুলে নাম ঠিক করতে জামাইবাবুর যে সময়টা লাগতো, বলিস তাই বাঁচিয়ে দিলাম। এখন যা শুনে আয় কি জরুরী কথা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় জরুরী কথা কিই বা এমন তোদের, আমাকে ত' আর শুনতে দিবিনে। তা না দিলি, শুনে এসে বলিস কি কথা, কি তার সুর, কত জলে তার তরঙ্গ ওঠে।'

'ঠাকুরমার হিংসে দেখে আর বাঁচি না।'

'দূর ছুঁড়ী হিংসে করবার কি আর বয়স আছেরে। নাতজামাই'র সঙ্গে একটু রঙ্গরসও কি করতে পাবো না? ওঠ্ বাপু গা তোল এখন।'

দেবী উঠিয়া ঠাকুরমার কোল হইতে ছেলে তুলিয়া স্বামীর ঘরের দিকে পা বাড়াইল।

তরল পরিহাসে উচ্ছ্বসিত দেবীর আনন্দোজ্জ্বল চোখে মুখে তখনো হাসির আভা লাগিয়াই ছিল। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়াই স্বামীর অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখখানা দেখিয়া দেবীর মুখের হাসি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

দেবীর নির্ব্বাক প্রশ্নের উত্তরে মাণিক বলিল, 'বাবার খুব অসুখ। আমার আজকেই বাড়ি রওণা হতে হবে, এই দ্যাখো চিঠি।'

চিঠি পড়িয়া দেবী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আজকে তোমার যাওয়া হবে না, আজ খোকার জন্মবার; কিন্তু আর দেরীও ত' করা চলে না। দিন ভালো হোক মন্দ হোক কালকে তোমার যেতেই হবে।'

'আজকে তাহ'লে তার ক'রে দিই, মনটা ভারী উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে।'

'তা ত' রয়েইছে; কিন্তু তোমার এই উদ্বিগ্নতায় ভাগ বসাবার অধিকার আমারও আছে। ভাব্‌চি কি ক'রে তা সমাধান করা যায়?'

মাণিক বিস্মিত হইয়া দেবীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'তুমি কি বলতে চাও ঠিক বুঝলাম না!'

'বলতে চাই ধনীর মেয়ে বলে' শ্বশুর শাশুড়ীর সেবাটাই না হয় নাই করলাম; কিন্তু তাঁদের মুখটাও জীবনে একবার দেখতে পাবো না? এই অসুখের সময়েও কি আমার আভিজাত্যের ধুয়া নিয়ে বসে থাকলে ভালো দেখায়?'

মাণিক বলিল, 'কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব! জমিদারের মেয়ে তুমি, নিজে জমিদার! তোমাদের শ্বশুরবাড়ির জেলার [illegible] পা ফেলা নিষিদ্ধ।'

'সেই কথাই ভাব্‌চি। ভাব্‌চি সেই নিষিদ্ধ রীতিটা ভেঙে দেবার মত সাহস আমার আছে কি না?'

'ও বড় শক্ত সাহস, ওতে হাত দিও না দেবী। যতসব সংস্কারের গোড়া কেটে দিয়ে তুমি ঠাকুরমাকে জালিয়ে দিও না দেবী। একবার মেনকাকে নিয়ে বাধিয়ে তুললে একটা মস্ত হাঙ্গামা। আবার শ্বশুরবাড়িতে পা বাড়াতে গেলে তোমাদের সাতপুরুষের তেজদর্প ফণা তুলে ছোবল মারবে

তোমার ওই পায়ে। তোমাদের ঘরে জামাই এসে শ্বশুরঘর করবে, তোমরা কেন যাবে, ছিঃ!'

'শ্বশুরঘর করতে যাবো সে অদৃষ্ট ক'রে আসিনি; কিন্তু বিপদের সময়েও তাঁদের গিয়ে একবার দেখতে পাবো না — এই বা কেমন কথা?'

মাণিক হাসিয়া বলিল, 'সত্যি তাই, এই বা কেমন কথা? মনে মনে এই কথাটাই একদিন খুব বড় ক'রে দেখেছিলাম, তাতেই না প্রথম প্রথম তোমাদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারিনি। জাহ্নবী ঠাকুরাণীর পৌত্রীর ছেলে হয়েছে তাতেই তিনি আহ্লাদে আটখানা! আর আমার মা, তাঁর মনের আহ্লাদ খুশী সব চাপা পড়ে যায় ধনীর মানদণ্ডের শক্ত চাপে।'

একান্ত সংযত কণ্ঠে ছেলেটির মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া দেবী বলিল, 'এই মুখটি দেখলে তোমার মা খুশী হবেন নিশ্চয়, কি বলো?'

'খুশী হবে না? বলো কি দেবী! কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, সুতরাং ও-হাঙ্গামায় পা বাড়িও না।'

'নিশ্চয়ই সম্ভব। খুশী যখন হবেন, খুশী তাঁদের হতেই হবে, হাঙ্গামা তাতে যতই হোক্।'

'হতেই হবে!'

'হ্যাঁ হতেই হবে। তোমার বাবা ভালো হয়ে উঠুন ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। নাতির মুখ আজ হোক কাল হোক তাঁরা দেখতে পাবেনই।'

'তুমি কি বলচো দেবী? তোমাদের রাজ-পরিবারের সাতপুরুষের ধারাটা ত' আর তুমি বদলাতে পারো না!'

'পারি। তুমি কি জানো না, আমার মা-ই সে ধারা ভেঙ্গে দিয়ে গেছেন।'

'জানি। কিন্তু দেবী সে কাজ হয়েছিল সমানে সমানে। আমার শ্বশুর বিয়ে করেছিলেন তেমনি একটি অভিজাত পরিবারে। তাতেও

শুনেছি, ঠাকুরমা আপত্তি জানিয়েছিলেন; কিন্তু এক্ষেত্রে ত' আগুন জ্বলে উঠবে। অমন কাজ কোরো না। জানো ত' আজ পর্য্যন্ত আমার শাশুড়ী ছাড়া এ বাড়ির কোন বৌ বিয়ের পর বাপের বাড়ি যাবার ছাড়পত্র পাননি!'

'কিন্তু আমি এ বাড়ির বৌ নয়।'

'নাই বা হ'লে বৌ, লক্ষ্মীপুরের রাণী ত'।'

কিন্তু লক্ষ্মীপুরের রাণীর অবিচলিত কণ্ঠস্বর যে মত ঘোষণা করিল, তাহাতে মাণিক মনে মনে যতই প্রসন্ন হউক, একটা আসন্ন আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিল।

দেবী বলিল, 'ওগুলো গোঁড়ামি! আভিজাত্যের ওই ভাঙ্গা কাঠামে মূর্ত্তি গড়ে যাঁরা পূজো ক'রে এসেছে, তুমি ত' জানোই তাঁদের ওপর আমার কোন সহানুভূতিই নেই। তাঁদের ভালো যেটা মাথা পেতে নিয়েছিও নেবও; কিন্তু যেটা গর্হিত বিবেকবিরুদ্ধ যা শুধু রাজসিকতার দুর্গন্ধই ব'য়ে বেড়ায়, তাকে প্রশ্রয় দিয়ে আত্মার অবমাননা করতে আমি কোনদিনই পারবো না।'

'কিন্তু দরিদ্রের মেটো ঘরে হাতীর পা পড়লে যে সে ঘর ভেঙে পড়বে রাণী।'

'খোকার মুখে ভাতটা হয়ে গেলেই সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখা যাবে। তুমি যাও, শ্বশুরঠাকুর কেমন থাকেন গিয়েই তার ক'রে জানাবে।'

'তা জানাবো। কিন্তু সত্যি কি তুমি যাবে? আমরা গরীব জানো ত'? আমার স্ত্রীর সম্মানটুকু অবশ্যই আমি দিতে পারবো; কিন্তু লক্ষ্মীপুরের রাণীর মর্য্যাদা দেওয়া আমাদের পক্ষে শুধু অসম্ভব নয়, বাতুলতা!'

দেবী উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'থামাও তোমার বক্তৃতা। কতবার বলেছি ও-সব কথা তোমার মুখে ভালো শোনায় না।'

অনেকটা আগ্রহ হইয়া একটু চিন্তা করিয়া মাণিক বলিল, 'তা যদি তুমি যাবেই !'

'হ্যাঁ যাবোই। দেবীকে তুমি চেনো না? আমি শুধু যাবো না, ওই বুড়ীটাকেও শুদ্ধ টেনে নিয়ে যাবো।'

'এ্যাঁ! সর্বনাশ! বলো কি! বুড়ীকেও নিয়ে যাবে! ঠাকুরমা তা যাবেন কেন?'

'যাবেই। না গিয়েই পারে না। দেবীরাণীর অসাধ্য কিছু নেই, তুমি দেখে নিও।'

মাণিক রকি-চেয়ারটার উপর দোল খাইতে খাইতে কথাটা আর একবার ভাল করিয়া ভাবিতে বসিয়া গেল। দেবী ঘুমন্ত শিশুটিকে শয্যার উপর শোয়াইয়া রাখিয়া স্বামীর ভাবমগ্ন মুখটির পানে চাহিয়া চাহিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সতেরো

গ্রামের নাম চোদ্দরশি। চোদ্দরশিতে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস। বহু হাকিম ডেপুটি এই গ্রাম হইতে বাহির হইয়া অন্যান্য জেলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গ্রামটি ছোট হইলেও অনেক বিদ্বান ও অর্থশালী ব্যক্তির যশভারে অনেক গণ্ডগ্রাম হইতে বহু অংশে সমৃদ্ধ।

এই গ্রামেরই একপ্রান্তে মাণিকের দরিদ্র ভিটা। আগে ছিল শুধুমাত্র খড়ের ঘর। বর্তমানে টিনের ছাউনী ও ঘরের সংখ্যা দুই চারটি বৃদ্ধি পাইয়া ভিটার রূপ কিছু বদলাইয়া গেছে। সংস্কৃতির মূলে ছিল মাণিকের ধনীর ঘরে জামাই-গিরি পদটা। পদটা মাণিকের ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে না মিলিলেও

তাহার পিতামাতা যথেষ্ট সমাদরেই এই অযাচিত সৌভাগ্য বরণ করিয়া লইয়াছেন। সমাজের উচ্ছিষ্টস্বরূপ এই দরিদ্র পরিবারের উপর এককালে গ্রামের লোকের বহু উৎপীড়ন চলিয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের পিছনে যে শক্তি সর্ব্বদাই আভিজাত্যের সুতীক্ষ্ণ সঙীন্ উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহার ভয়ে সকলেই এখন সন্ত্রস্ত ত' বটেই, অনেকে সুবোধ বালকটির মত খাতির জমাইতেও আসে! গ্রামালোকের ওই ভীরুচিত্ত ও ঈর্ষাপরায়ণ চোখের দৃষ্টিগুলি মাণিক উপভোগ করে এখন একান্ত বুদ্ধিমানের মতই। শুধু এইটুকুই তাহার সান্ত্বনা। কিন্তু তাহার মনের ক্ষোভটুকু আজও মিলাইয়া যায় নাই।

মাণিকের পিতা পীতাম্বরবাবু আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তাই নিশ্চিন্ত মনে মায়ের সঙ্গে বসিয়া মাণিক আজ সেই সব কথাই আলোচনা করিতেছিল।

মা বলিতেছিলেন, 'এম, এ, পাশ করেও তুমি বসে থাকতে আরও কতদিন, তারও কিছু স্থিরতা ছিল না। এক্ষেত্রে যদি তুমি বড় ঘরে বিয়ে ক'রে তোমার বাপমা'র কিছুমাত্রও দুশ্চিন্তার লাঘব করতে পেরে থাকো —সে কি তোমার খুব অন্যায় হয়েছে মাণিক?'

মাণিক বলিল, 'দুটি চক্ষের স্থূল দৃষ্টি দিয়ে এ অন্যায়ের বিচার করা চলবে না মা। মনের সূক্ষ্মতারে ব্যক্তিত্ব হারানোর যে আলাপটুকু শুনতে পাই, তা যে শুধু আমিই পাই। সে খবর তোমরা জানতেও পাও না, দুঃখও তোমাদের কিছু নেই। মাসে মাসে দু'শ ক'রে টাকা লক্ষ্মীপুর কাছারি হতে মাসোয়ারা আসে; সুতরাং দুঃখের ত কিছু কারণ নেই।'

উত্তরে মা বলিলেন, 'এইটুকু দুঃখ যে সেজন্য বাবা তোমার খোঁটা সইতে হয়েছে অনেক। বিয়ের পর পালিয়ে এসে তুমি যে লাঞ্ছনাটা তোমার বুড়ো বাপের উপর করেছো তাও সয়ে গেছি শুধু মাত্র সংসারকে নিত্যভিক্ষার

উপদ্রব হতে রক্ষা করার জন্য। নইলে ও-টাকা হাতে তুলে নিতে আমাদের ঘৃণা হয়েছিল।'

পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া মাণিক লজ্জিত হইল। মাণিকের মা একটু থামিয়া আবার বলিলেন, 'আর সে জন্য তোমার ত' কোন লজ্জা নেই। তুমি ত' বাবা হাত তুলে কোনদিন সে-টাকা নাও না। মান যদি কিছু খোয়া গিয়েই থাকে সে আমাদেরি গেছে। বরাবর রাজ-ইষ্টেট্ হতে দু'শটাকার হুণ্ডি পিয়নের হাত হতে তুলে নিতে হয় ওই বেহদ্দ বুড়োমানুষটাকেই। সুতরাং আমার মানী ছেলের মান ত' তেমনি খাড়া আছে।'

'বৌটি তোমার খুবই ভালো। তাই বুঝি মান অপমানের কথাটা ভুলেই গেছি। নইলে তুমি যাই বলো না মা, ঘর-জামাইগিরি করার মত অপদার্থ জীবন যেন আমার শত্রুরও না হয়। ছি ছি কী লজ্জার কথা! যখনি ভাবি স্বামীত্বের মাইনেস্বরূপ দুশো ক'রে টাকা মাসে মাসে মাইনে পাই, তখনই মনে হয় পৌরুষের সমস্ত গর্ব্ব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে মানুষকে এত বড় সাহসের প্রশ্রয় যারা দিয়েছে তাদের আমোল কেটে যাবে কবে?'

মাণিকের মা লেখাপড়া জানেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদও তাঁহার কিছু নাই; সুতরাং দুর্ব্বোধ্য ভাব ও ভাষা দিয়া তাঁহার পক্ষে মাণিকের কথার প্রতিবাদ করিতে যাওয়া একরূপ দুঃসাহসের কথা। তাঁহার পুঁজি জন্মগত সংস্কার কিম্বা চোখে দেখা দেশকালের শাস্ত্রীয় আচার ও পদ্ধতি। একান্ত মর্ম্মাহত হইয়াই তিনি বলিলেন, 'মাণিক তুই লেখাপড়া শিখেচিস্, তোর সঙ্গে কথা বলতে আমি পারবো কেন বাবা? তবে আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ হলেও এইটুকু বুঝি, এ বাবা তোমার ন্যায্য অধিকার। তোমার শ্বশুরবাড়ি টাকায় যতই বড় হোক ঘর তারা ছোট। তুমি নিজে নিকষ কুলীনের ছেলে! ওই খাটো ঘরে বিয়ে ক'রে তুমি যে তাদের কুলে তুলে দিয়েছো এ কথা তুমি স্বীকার না করলেও, সমাজ স্বীকার করবে, তারাও

করবে! আগে তাদের চিনতো কে? ওই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে যাদের আগে লোকে ধোপার বামুন ব'লে চিনতো, তারাই ত' কালে কালে সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীনদের জাত মেরে জাতে উঠেছে। সুতরাং এমনি ধরণের মাসিক বৃত্তিটা তাঁরাই দিয়ে থাকে, যাঁদের এমনি ছেলে নেবার সামর্থ আছে। একে মাইনে বলা চলে না। অমন রাজার মেয়ের জন্য কি বাঙলাদেশে ছেলে জুটতো না? কুলে রূপে শিক্ষায় যাকে খুঁজে নিয়েছে, তার যোগ্যতার এই দক্ষিণাটা তুমি বাবা যে চক্ষেই দ্যাখো, আমরা বুঝি ওটা তোমার প্রাপ্য ওটা তোমার সম্মান।'

মাণিক হাসিয়া একান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, 'ওসব কথায় আর কাজ নেই মা। কৌলিণ্যের এই মোটা চামরায় ফোস্কা আর পড়বে না, ধাতস্থ হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি অন্য কথা বলো। সত্যি যদি বৌ আসে, তার আতিথেয়তার অতিরিক্ত আয়োজন তুমি কিছুতেই করতে পাবে না, এই কথাটা তোমায় আমাকে দিতে হবে।'

'বলিস কি তুই মাণিক। রাজার মেয়ে, হোক সে তোর বৌ, বাহিরের চোখে তার যে সম্মান তা তাকে দিতেই হবে।'

'মোটেই না। সে তোমার ছেলের বৌ, প্রথম আসচে, তাই যতটুকু প্রয়োজন আমাদের সাধ্যমত করবো। তা ছাড়া রাজার মেয়ে বলে' যে সে শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর কাছ হতে নজরানা আদায় ক'রে নিয়ে যাবে, এ সেও চায় না, তোমরাও দিতে পারবে না।'

মাণিকের মা বলিলেন, 'সে আসুক ত'। আসবে কিনা তারই ঠিক নেই। বড়লোকের খেয়াল; হয়ত এতক্ষণ মিটে গেছে।'

মাণিক হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল, 'না মা, দেবী তোমার সে জাতের মেয়ে নয়! একবার যখন মুখ দিয়ে বের করেছে সে নিশ্চয়ই আসবে। খোকাকে একবার তোমাদের না দেখিয়ে সে ছাড়বে না।'

খড়মের খট্ খট্ শব্দে মাণিক মুখ ফিরাইয়া দেখিল তাহার পিতা পীতাম্বরবাবু সেইদিকেই আসিতেছেন। মাণিক উঠিয়া দাঁড়াইতেই পীতাম্বরবাবু বলিলেন, 'লিখেছিস্ মাণিক, বৌমাকে যে খবরটা দিতে বলেছিলাম চিঠি দিয়ে জানিয়েছিস্ কি?'

'সেইদিনই লিখেছি। আজকালের মধ্যেই জবাব পাবো। আর জবাব যা পাবো সে ত' আমি আপনাকে আগেই বলে দিয়েছি। জমিদারী কেনার খবর পেলে একবার সে যাচাই ক'রে দেখবেই।'

মাণিকের মা পীতাম্বর বাবুর দিকে আশ্চর্য্য হইয়া খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'কিসের জবাব গো, জমিদারীই বা কিসের?'

পীতাম্বরবাবু অন্যত্র চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, 'তোমাদের জমিদার গণেশ রায়ের এই সোনার খনি গো। শোন সব মাণিকের কাছে, বলবে'খন।'

পীতাম্বর বাবু চলিয়া গেলে মাণিক তাহার মার কাছে সব খুলিয়া বলিল।

নামটি তাহার গণেশ রায়।

অভিজাত মহলে কিম্বা সাহেব পাড়ায় কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া নাম হইয়াছে গাণেশ রায়। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে বাবু গণেশচন্দ্র। কেহ বা বলে রায় গাণেশ।

মহাশয় ব্যক্তিটি গোটা গ্রামটারই মালিক। আশপাশের আরও পাঁচ সাতখানা গ্রাম সমেত মালিকানা স্বত্বের মোট বাৎসরিক হিত পনেরো হাজার টাকা। তালুকটি ছোট হইলেও, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও হিন্দু প্রজার আধিক্যই বেশী। আদায় পত্রের দিক দিয়াও ইহার তৎপরতা যেমন অন্য কোন মহালের সঙ্গে তুলনা হয় না, সম্মানের দিক দিয়াও ইহা তেমনি লোভনীয়। মহালের নামকরণের বিশিষ্টতাই তাহার প্রমাণ। গাণেশ রায়ের স্বর্গীয় পিতা মহাদেব রায় মহালের নাম রাখিয়াছিলেন সোনার খনি। জমিদারী খাতাপত্রে ও লোকের মুখে আজপর্য্যন্ত ওই নামেই চলিয়া আসিয়াছে!

এমন একটি সম্পত্তি যাঁহার দেনার দায়ে বিক্রী হইতে চলিয়াছে তিনিই হইলেন বাবু গণেশচন্দ্র! কলিকাতার নিন্দিতপল্লীর একজন খ্যাতনামা রসিকপুরুষ। এই গাণেশ রায়ের বৈষয়িক বুদ্ধি যখন তাঁর লাম্পট্য ও [illegible] তলায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন একে একে খণ্ড খণ্ড তালুক এমনি করিয়াই পরের হাতে চলিয়া যাইতেছে। এবার সোনার খনিও শৌণ্ডিকালয়ের দেনার ডাকে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। পীতাম্বরবাবু তাই মাণিককে ডাকিয়া একদিন [illegible] 'দেখিস্ ত' বৌমাকে লিখে। যদি কেনে এই মহালটা ত' ভালো হয়। একটু দূর হয়ে যায়, তা হোক্ আমরা ত' আছি। দেখবার শোনবার অসুবিধা হবে না। একটা ডিহি কাছারি ক'রে দিলেই চলবে।'

মাণিকের মা সব শুনিয়া বলিলেন, 'সত্যি লিখেচিস্ ত' ?'

'হ্যাঁ মা লিখেছি। আর লিখবোই বা না কেন? আমার আর লজ্জা সরম কিছুই নেই। এবার নিজের স্ত্রীর ভিটেবাড়ির প্রজা হবো। তা হই হবো, তবু ত' গ্রামের লোকগুলোর ওই হিংসুটে চোখমুখ দেখে একবার আনন্দ উপভোগ করতে পারবো — এইটেই আমার আনন্দ।'

মা প্রসন্নচিত্তে গদগদ হইয়া বলিলেন, 'তোমার লজ্জাসরমের বালাই নিয়ে তুমি বসে থাকো বাবা, সে খোঁজের আমার দরকার নেই। কিন্তু বৌমা কি রাজি হবেন? তুই নিশ্চয় জানিস্?'

'নিশ্চয় জানি। রাজি আবার হবে না? শ্বশুরের আমোলে শুনেছি জমিদারীর আয় ছিল প্রায় লক্ষ টাকা, এই সাত আট বছরের মধ্যে তার আয় বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। তার পর এই সম্পত্তি কেনার প্রস্তাবটা যাচ্ছে যার কাছ থেকে, দেবী তাকে দেবতার মত ভক্তি করে মা। তার কাছ থেকে এমন অযাচিত উৎসাহ পাওয়াটা সে ত' প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। যদি বা শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে, অবহেলা করবার শক্তি তার নেই।'

পুত্রের মুখে উত্তর শুনিয়া পীতাম্বরবাবুর স্ত্রী হয়ত মনে মনে স্বামীর মতই হাতে হাতে স্বর্গলাভের একটা কল্পনায় আহ্লাদিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার গদগদকণ্ঠ কি একটা কথা বলিবার জন্য মাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক এমনি সময়ে মাণিকের ভগ্নী কালীদাসী একটা চিঠি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, 'এই যে নাও দাদা তোমার বৌরাণীর চিঠি। প্রতি সপ্তাহে পিয়নের হাত হতে তিনখানা ক'রে চিঠি এনে তোমার হাতে তুলে দিই। প্রতি চিঠিতে একখানা ক'রে সন্দেশ দেবে বলেছো তা হ'লে এই তিন মাসে ক'টা সন্দেশ পাওনা হলো দাদা ?'

মাণিক হাসিয়া বলিল, 'তা অনেক হলো। কিন্তু তোর দাদা গরীব। দেনার দায়ে তাকে জড়িয়ে ফেলচিস্ দিন দিন,—এ আমি কেমন ক'রে শুধবোরে কালী ?'

দুইটি চক্ষু কপালে তুলিয়া কালীদাসী বলিল, 'তুমি গরীব !'

'গরীব নয় ? তোরা যদি গরীব, তোর দাদাও গরীব। কাজেই তোর ও-দেনা আমি শুধতেও পারবো না, আমার কাছে দাবীও করিসনে কালী। তার চেয়ে বরং বৌরাণী আসুক, তোর যা পাওনা তার চেয়ে তিন গুণ আদায় ক'রে নিস্।'

'মা শুনেছো ? বৌরাণী আসতে যাচ্ছেন আমাদের এই গরীবের ঘরে। এমনি ক'রে ভুলিয়ে ভালিয়ে তুমি আমাকে সন্দেশ দেবে না ? না দিলে, আমি চিঠি লিখে তোমার রাণীর কাছ থেকে সুদ সমেত পাওনা আদায় ক'রে নেব।'

'আরে পাগ্লী, সে সত্যি আসবে। সুদে আসলে আদায় ক'রে নিবি তখন এই গরীবের ঘরেই। বিশ্বেস না হয় মার কাছেই জিজ্ঞেস কর।'

মার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া কালীদাসী এইবার সত্যসত্যই বিশ্বাস করিল। তাহার দাদার রাণীবৌ সত্যই আসিবে। কথাটা শুনিয়া কালীদাসী আনন্দে

যে এখন কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। দাদার মুখে একথা সে আরও দুইচারবার শুনিয়া শুধুমাত্র পরিহাস ভাবিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু এইবার মার মুখে কথাটা নিশ্চিতভাবে শুনিয়া লইয়া আনন্দে একরূপ নৃত্য করিতে করিতেই অদূরে উন্মুক্ত জানালা দিয়া রাখালের মুখটি দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওরে রাখাল বৌদি আসবেরে রাণী বৌদি আসবে।'

ছোটভাই রাখাল অঙ্কের খাতা হইতে মাথাটা তুলিয়া একবার মাত্র আনন্দের কথাটা শুনিয়া লইল। কিন্তু ইহার চেয়ে বেশী আনন্দ প্রকাশ করিবার সামর্থ তাহার নাই। কারণ জানালা দিয়া দাদার দুইটি চক্ষু স্পষ্ট দেখা যায়। একে রাখাল দাদাকে ভয় করে বাঘের মত, দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা আসন্ন।

সুতরাং রাখালের কাছে যতটা উৎসাহ পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল তাহা না পাইয়া কালীদাসী তাহার ছোট দাদা রমেনের বৌ নন্দাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতে লাগিল, 'শুনেচো বৌদি আমাদের বড় বৌদি [illegible]নবেন ?'

মাণিকের মা বলিল, 'দেখচিস্ মাণিক তোর বোনের [illegible] একটা আস্ত পাগলী!'

মাণিক বলিল, 'পাগলী বলেই ত' ওর বড়দার কাছে ওর দাবী বেশী।'

'হ্যাঁ তা মিলেছে ভালো। যেমন পাগল দাদা তেমনি তার বোন। কিন্তু বৌমা চিঠিতে কি লিখেছে পড়ে এসে আমাকে শিগ্গীর ক'রে জানিয়ে যাবি। ওই সম্পত্তিটা কেনার কথা কিছু আছে কিনা, সেইটেই জানতে চাই বাবা।'

উৎকণ্ঠিত প্রশ্নটি মাণিকের কানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলিয়া দিয়া মাণিকের মা কাজের অজুহাতে উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

মাণিক দেবীর চিঠি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

দেবী এক দীর্ঘ চিঠি লিখিয়াছে। লিখিয়াছে :

শ্রীচরণেষু,

তোমার চিঠি পেলাম। কিন্তু তুমি একটা সর্ত্ত ভঙ্গ করেছো। সপ্তাহে তিনখানা ক'রে চিঠি দেবার অঙ্গীকার আমি ভঙ্গ করি নাই; তুমি করেছো। গেল সপ্তাহে মাত্র দু'খানা চিঠি পেয়েছি। এ অপরাধ তোমার অমার্জ্জনীয়! সুতরাং শাস্তি তোমার পেতেই হবে। কি শাস্তি তুমি চাও, তাও কি আমার জানা নেই ভেবেছো?

তার পর লিখেচো, 'খোকাকে যেন যত্ন করি।' কথাটার তাৎপর্য্য ঠিক উপলব্ধি করতে পারলেম না। তোমরা কি ভাবো? মেনকাকে ভালবাসি বলেই ছেলেটিকে কম ভালবাসবো বা যত্ন কম করবো একথা কি ভুলেও আমার মুখ দিয়ে তোমরা কোনদিন শুনেছো? ঠাকুরমা না হয় বুড়ো হয়েছেন, ভীমরতি ধরেছে; কিন্তু তোমার মত পণ্ডিত লোকও এমন শ্লেষ করতে পারলে কি ক'রে ভেবে অবাক হতে হয়! মা হয়ে ছেলেকে কি ক'রে যত্ন করতে হয় তাও কি শিখবো পরের কাছ থেকে? ছেলের জন্য মনে মনে মানৎ কি আমিও করিনি? করেছি আর যখন পেয়েওছি অবহেলা করবো না এতটুকু। তবে তোমাদের মত পার্থক্যের আতিশয্যটা আমি সমর্থন করতে পারি না, কোনদিন পারবোও না। তোমাদের বলবার ভঙ্গিটা বড়ই নিষ্ঠুর বড়ই সোজা। তোমরা যেন ডেকে চোখে আঙুল দিয়ে বলতে চাও, 'ওরে এটি মেয়ে, একে একটু কম ভালোবাসবি!—ওটি ছেলে, ওকে রাখবি চোখের মণি ক'রে!' চোখের পর্দ্দা ফেলে দিয়ে মণি ক'রে রাখার সে এক চোখোমি বিদ্যেটা আমি কোনদিনই আয়ত্ত করতে পারবো না। বারম্বার এ নিয়ে আমাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া একেবারেই বৃথা। মেয়ে প্রসব করতে প্রসূতির যতটুকু গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, ছেলের বেলায় সে হিসেবে বিধাতার করুণা উথলে ওঠে নাকি? তোমরা সে কথা বুঝবেও না, তা নিয়ে তর্ক করেও তোমাদের সঙ্গে আমি পেরে উঠবো না কোনদিন। সুতরাং ওকথা থাক্।

তুমি কবে আসবে? শ্বশুরমশায় ত' ভালো হয়ে গেছেন অনেকদিন, এমন দেরি ত' তোমার কোনবার হয় না! দেবীকে ভুলে গেলে নাকি? না কি অন্য কোন নূতন দেবীর মায়ায় জড়িয়ে পড়েছো? ব্যাপারটা কি?

ঠাকুরমাকে রাজি করিয়েছি। কথাটা শুনে তুমি অবাক হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। অবাক হবার কথাই বটে! কিন্তু তোমাকে ত' পূর্ব্বেই বলেছি, দেবীর অসাধ্য কিছু নেই।

আমি জানতাম ঠাকুরমাকে সোজাসুজি শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার প্রস্তাবটা দিলে বাতিল ক'রে দেবেনই। তাঁর নিজের কথা ত' উঠতেই পারে না। তাই দুই রাত্রি ভেবে চিন্তে ঠাকুরমাকে

একদিন বলেই ফেললাম। বললাম, 'ঠাকু'মা অনেকদিন বাড়িতে বসে আছি, চলো একটু বেড়িয়ে আসি।' ঠাকুরমা বললেন, 'কোথায় রে আবার বুড়ো বয়সে বেড়াতে বেরুবো?' বললাম, 'যাবো গঙ্গাস্নানে। তীর্থদর্শনও হবে, বেড়ানোও হবে। বর্ষায় বজরা ভাসিয়ে দেবো, একেবারে মুর্শিদাবাদের কাছে, ত্রিরাত্রি গঙ্গায় বাস ক'রে আবার ফিরবো। বলো যাবে? অনেক দিন দেশে পড়ে আছি, মন ভেপ্‌সে গেছে, চলো ঠাকু'মা, তোমার পায়ে পড়ি……' দেবীরাণীর আব্দার এমনি চলতে থাকতো যতক্ষণ না তার কার্য্য সিদ্ধ হতো; কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। বুড়ো বয়সের মন তীর্থযাত্রার নামে এক কথাতেই রাজি হয়ে গেছেন। বাকী কথাটা আর বলিনি, এখন বলবার প্রয়োজনও মনে করি না। এটা ঠিক যদি একবার মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ওপরে গিয়েই পড়তে পারি, গুরুপীঠটা দর্শন না ক'রে ফিরে আসবো না। রাস্তায় বসে বসেই ঠাকুরমাকে মানিয়ে নেব। সে জোর আমার আছে। সুতরাং তুমি নিশ্চিত জেনো খোকার অন্নারম্ভ শেষ হয়ে গেলেই আষাঢ়ের শেষে নৌকা ভাসিয়ে দেব তোমাদের দেশের দিকে।

সর্ব্বশেষে যে কথাটা লিখবো তা পড়ে তুমি নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। তোমার প্রস্তাবে রাজী হতে আমি পারলেম না। অর্থাৎ তোমার দেশের নূতন তালুকটা কেনায় আমার মত নেই। দেবীরাণীর অমৃতে অরুচি হয়েছে কথাটা সত্যি নয়। কথাটা হয়েছে এই যে, তুমি কি বলতে চাও, শেষকালে স্বামীর পুণ্যপীঠ দর্শনের মিথ্যে অজুহাতে মহাল পরিদর্শনে বেরুবো? ছি ছি কী লজ্জার কথা! তুমি একথা ভাবলে কি ক'রে? দ্বিতীয়তঃ স্বামীর ভিটে হতে তার খাজনা আদায় ক'রে পতিদেবতাকে একজন সাধারণ প্রজায় সাব্যস্ত ক'রে দেবীরাণীর কীর্ত্তি অক্ষয় করে' রাখবো? আমার জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করবার যত সখই থাকুক এমন পাপ আমি পতিদেবতার অনুমতি পেলেও করতে রাজী নয়। সুতরাং এ অনুরোধ তুমি আমার কোরো না। এ আমি কস্মিনকালেও পারবো না।

তবে ভয়ে ভয়ে একটা প্রস্তাব আমি করতে পারি। তা কি তুমি মেনে চলবে? তোমার পৌরুষের গর্ব্বে যদি ঘা না লাগে ত' তালুকটা তোমার নিজের নামে কিনতে পারো। এতে আমার সম্মতি ত' আছেই, উৎসাহও যথেষ্ট আছে। কিন্তু স্ত্রীভাগ্যে ধনলাভ করবার বৃত্তিটা কি তুমি হজম করতে পারবে? মনে ত হয় না। যদি পারো এই একমাত্র পথ আছে। রাজী হবে কি? তোমার এই সম্মতিটুকু পেলে আমি যে কত খুশী হবো, তা কি তুমি জানো না? বড়ই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম তোমার এই সম্মতিটুকু পাবার জন্যে।

শিগ্‌গীর চলে এসো। কত আর দেরি করবে? দিনে দিনে অনশনটা আরও দীর্ঘ ক'রে দিয়ে আমাকে জ্বালিয়ে তুমি কি সুখ পাচ্ছো জানি না। নির্দ্দয়তারও একটা সীমা আছে, সে কথা ভুলে যেও না। এবার এলে তার শোধ তুলে নেব কড়ায় গণ্ডায়।

প্রণাম জেনো, ভালোবাসাও জেনো।

তোমার দেবী।

চিঠিটা পড়া শেষ হইলে মাণিক অর্দ্ধঘণ্টা ঘরের মধ্যে একাকী পায়চারি করিয়া একটা কিছু স্থির করিল। বাহিরে আসিয়া মাকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিয়া বলিল, 'মা আমি আজকেই কলকাতায় যাবো। কলকাতা হয়ে লক্ষ্মীপুর যাবো।'

মাণিকের ডাক শুনিয়া মা ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াই ছেলের পানে উৎকণ্ঠিতদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'হঠাৎ কলকাতায় যাবি! কেন রে? কি লিখেচে বৌমা? সব ভালো ত'?'

'সব ভালো।'

বলিয়াই মাণিক দেবীর চিঠির মর্ম্মার্থ মাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিল।

মাণিক বলিল, 'খোকার নামেই কিনবো মা। তাই ঠিক করলাম। নাবালকের গার্ডিয়ান হ'য়ে থাকবো আমি। তবু এ সম্পত্তিটা কিনবোই। কলকাতায় গিয়ে গনেশ রায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে লক্ষ্মীপুর চলে যাবো।'

মা বললেন, 'বেশ ভালো কথা; কিন্তু তোর ছেলের নামে কেন, তোর নিজের নামে কিনলেই ত' তোর বৌ খুশী হবে বেশী।'

মাণিক কিঞ্চিৎ অধৈর্য্য হইয়াই বলিয়া উঠিল, 'শুধু বৌ খুশী হবে নয়, তোমরা যে আরও বেশী খুশী হবে সে আমি জানি। কিন্তু মা তুমি আমায় কি ভাবো বলো ত'? নিজের পেটের ছেলেকে আজও চিনলে না!

তোমাদের বৌ তার মহত্বটুকু দেখিয়েছে বলেই আমি তার সুযোগ নিয়ে, তুমি বলতে চাও, আমার একান্নবর্ত্তী সংসারের সবাইকে স্ত্রীর টাকায় কেনা সম্পত্তি বিলিয়ে দেবো, আমার নিজের নামে কিনে? ছি ছি কী যে বলো তুমি!"

মাণিকের মা লজ্জিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার আর কোন পথ না পাইয়া বলিল, 'তাই কর বাবা। তোমার স্ত্রীর টাকায় আমার স্বামীপুত্রের স্বার্থ নাই বা বজায় রইলো, তবু ত' গ্রামের উপর মাথাটা উঁচু ক'রে থাকতে পারবো। তাই বা মন্দ কি?'

'মন্দ যে নয় শুধু এই ভেবেই না আমার জেদ চেপে গেছে, নইলে ও-সব বৈষয়িক গোলযোগে মাথা দেবার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না। যাই হোক আজকের রাত্রের গাড়ীতেই কলকাতা যাবো। শিগ্‌গীর ভাত চাপিয়ে দাও।'

মাণিকের মা চলিয়া গেলেন। মাণিক মাথায় হাত দিয়া কথাটা আবার একবার ভাল করিয়া ভাবিতে সুরু করিয়া দিল।

আটারো

কলিকাতার উপকণ্ঠে ঘুঘুডাঙ্গার একটা [illegible] দিবা দ্বিপ্রহরে বাবু গণেশচন্দ্র সবেমাত্র ডিকেণ্টার সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া বসিয়াছেন। মদের নেশা তখনো মগজের অলিগলি দখল করিয়া বসে নাই। সবেমাত্র এক আধ পাত্র পান করিয়া জনকয়েক মোসাহেবের সঙ্গে বসিয়া তরল অশ্লীল আলাপ জুড়িয়া দিয়াছেন। এমনি সময় বেয়ারা আসিয়া সেলাম

করিয়া দাঁড়াইতেই জনৈক ইয়ারবন্ধু তাহার পানে ঘাড়টিকে বারদুই কসরৎ করিয়া বাঁকাইয়া নির্ব্বাক প্রশ্নের এক অভিনব ভঙ্গিতে চাহিয়া রহিল।

বেয়ারা পুনর্ব্বার সেলাম জানাইয়া খোদ মালিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, 'বাইরে একজন বাবু হুজুরের সঙ্গে ভেট্ চাইছেন, ডাকবো কি?'

গণেশচন্দ্র খানিকটা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'জ্বালাতন! এই জ্বালায় কলকাতা ছেড়েছি, তবু রেহাই নেই। ছাখো ত পঞ্চু, এই দুপুরে কোন্ ব্যাটা এলো আবার জ্বালাতে! পাওনাদার হ'লে ব'লে দিও, বাবু চিৎ হয়ে পড়েছেন, এখন দেখা হবে না।'

পঞ্চানন্দ ওরফে পঞ্চুবাবু বাহিরে আগন্তুকের সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া একেবারে তাঁহাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ঢালা গালিচার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া গণেশ রায় যেমন ছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন। আগন্তুককে একটা তুষ্ট কথায় অভ্যর্থনা করিবার সাধারণ ভব্যতা বোধটুকুও তাহার নাই।

আগন্তুক হইলেন আমাদের মাণিকলাল।

কয়দিন গণেশ রায়ের কলিকাতার বাসভবনে হানা দিয়াও তাহার সাক্ষাৎ মেলে নাই, অবশেষে সে বাগানবাড়িতে আসিয়াই হাজির হইয়াছে।

মাণিক হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া বলিল, 'আপনিই গণেশ রায়?'

গণেশ রায় কাচের গেলাসটা হইতে মুখটা নামাইয়া একান্ত নির্লজ্জ ভাবেই বলিল, 'লোকে তাই বলে, বলুন আপনার কি বক্তব্য?'

মাণিক বলিল, 'শুনচি নাকি মহাশয় চোদ্দরশির সোনার-খনি মহালটা বেচে ফেলছেন?'

'রটনাটা মিথ্যে হলেই সুখী হতেম, কিন্তু তা হবার জো নেই, সুতরাং যা শুনেছেন ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু মহাশয়ের আবির্ভাবটা কি শুধু শোনবার জন্যেই?'

'ঠিক তা নয়; বরং হুজুরের দর্শনলাভের জন্য যে শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে তার পেছনে একটা প্রস্তাব থাকাই স্বাভাবিক। সে প্রস্তাবটা মহাশয় নিশ্চয়ই বুঝে থাকবেন।'

'ভালো কথা, তা হ'লে টাকা নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই! কত এনেছেন? এখনই দেবেন ত'? বায়না বাবদ যা-কিছু!'

আশ্চর্য্য হইয়া দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাণিক বলিল, 'ইতিপূর্ব্বে এই প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা আপনার সঙ্গে কিছুই হয়নি; সুতরাং টাকা নিয়ে আসবো কোন্ ভরসায়, আমি ত' ঠিক বুঝতে পারলেম না গাণেশবাবু!'

'ইতিপূর্ব্বে এমনি মুখরোচক প্রস্তাব দু'চারটে শুনেছি; কিন্তু শুধু প্রস্তাব নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো মশাই? আমি চাই টাকা। লম্বা দিন মাস ভরে' দর কষাকষি করবার মত দীর্ঘ অবকাশ আমার নেই। বুঝলেন কিনা?'

'বেশ ত' কথাবার্ত্তা এক্ষুণি পাকাপাকি হয়ে যাক্। তারপর টাকা দিতে আমি মোটেই দেরী করবো না। বলুন আপনি, আপনার ডিমাণ্ড কত?'

'ডিমাণ্ড আমার অনেক। দেনার দায়ে মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে গেছে! কিন্তু সে ত' আমায় আপনি দিতে পারবেন না। বিশ পঁচিশ গুণ, যা হয় একটা ধরে দেবেন। কিন্তু চট্‌পট্ দু'চার দিনের মধ্যে। যত শিগ্‌গীর টাকা দিতে পারবেন তত গুণ কম যাবে। কিন্তু —

একটু থামিয়া একপাত্র সুধা পান করিয়া গাণেশ রায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিন্তু আসল কথাটাই ত' জিজ্ঞেস করা হলো না। নেবে কে?— আপনিই বা কে?'

মাণিক নিজের পরিচয়টা গোপন রাখিয়া স্ত্রীর পরিচয়টা একটু দিতেই গাণেশ রায় বলিয়া উঠিলেন, 'ওহে পঞ্চু, তোমাদের সেই মেয়ে-জমিদারটাহে!

কাগজে যার খুব সুখ্যেতি বেরিয়েছিলো! কি নামটা যেন, ঠিক মনে পড়চে না······হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, বঙ্কিমবাবুর নামটা পর্য্যন্ত বেমালুম চুরি ক'রে নিয়েছে! দেবীচৌধুরাণী গোছের এমনি একটা কিছু, — মেয়েটির কি নাম মশাই?'

'দেবীরাণী।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ দেবীরাণী। মেয়েটি কি ডাকাতি ক'রে বেড়ায় নাকি?'

মাণিক এই নির্লজ্জ উক্তির প্রতিবাদ করিতে গিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িল! বলিল, 'মানে আপনি বলতে চান, একটা উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর নামের খানিকটা মিল আছে বলেই তাকে ডাকাতি ক'রে বেড়াতে হবে? আর দেবীচৌধুরাণীর মত হুবহু চরিত্রটি হতে হবে? আপনার যুক্তিটি ত' ভারী চমৎকার। বাপ-মার দেয়া-নামটাও আপনি বাতিল ক'রে দিতে চান দেখ্‌ছি! কিন্তু সেজন্য ত' আমি আপনার কাছে আসিনি. আমি যে জন্য —

মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বাবু গণেশচন্দ্র বলিলেন, 'চটেন কেন মশাই, শুনুন না। মেয়ে সেপাইটি এত জমিদারী কিনে কি করবে বলুন ত'? শুনেছি পূর্ব্ববঙ্গে তাঁর বাস, একেবারে ধেয়ে আসছেন পশ্চিমবঙ্গ পর্য্যন্ত। কালে কালে গোটা বাঙ্‌লাটাই কিনে নেবেন নাকি?'

মাণিক মনে মনে যতই বিরক্ত হউক কার্য্য উদ্ধারের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া একান্ত সংযমের সঙ্গেই সে উত্তর দিল, 'জানি না। তাঁর সামর্থ থাকলে কিনতেও বা পারেন।'

গণেশচন্দ্র বিকৃত হাস্য করিয়া অত্যাচারে পীড়িত কোটরগত দুইটি চক্ষু মাণিকের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'কি হবে এত জমিদারী কিনে? কোথায় রাখবেন এত টাকা বলুন ত'?'

'জমিদারী দিয়ে কি হয় আপনি নিজে জমিদার হয়ে জানেন না যে আমাকে জিজ্ঞেসা করচেন?'

হো হো করিয়া ততোধিক বিকট হাস্যে হলঘরটি প্রকম্পিত করিয়া গ্যাণেশ রায় বলিয়া উঠিলেন, 'আমি জানি না? বলেন কি মশাই! আমার চেয়ে বেশী জানে কে? দেখচেন না, যার জন্যে মহাশয়ের আজ এখানে পদধূলি পড়েছে! জমিদারদের সদ্ব্যয়ের তালিকার বড় ফর্দ্দটাই ত এই, একান্ত না হ'লে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা গুটিকয়েক উদরের মধ্যে চোখের পর্দ্দা ফেলে যা-কিছু সমর্পণ করা! জমিদারী দিয়ে এর বাইরে যে আর কি হয় আমার ত জানা নেই। বাবার লক্ষ টাকা আয়ের বিত্তটা মদের ফেনা আর বাইজির নূপুরের তলায় পড়ে ফুৎকারে উড়ে গেল। আমার মত একটা জ্যান্ত বীরপুরুষ দাঁত দিয়ে কামড়েও যাকে ধরে রাখতে পারলে না, সামান্য একটা মেয়ের হাতে ক'দিন আর টিকবে বলুন? 'ও ত' ভেসে গেল বলে'! এখন ওঠ্‌বার সময় উঠচেন, আবার যখন পড়বার সময় হবে, তখন ওই চৌদ্দরশিকে হাজার রশি দিয়ে বেঁধে রাখলেও সে পড়বেই, বুঝলেন কিনা মশাই?'

'হ্যাঁ বুঝলাম; কিন্তু দুনিয়ার সব মানুষই ত' মশাই ঘুঘুডাঙ্গায় বসে' ভিটের ঘুঘু চড়ায় না। তাদের আরও কাজ আছে।'

মাণিকের অসহিষ্ণু বাক্যবাণ নিরর্থক হইয়া গেল গ্যাণেশচন্দ্রের কথার চাপে। মাণিকের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া তিনি বলিলেন, 'কাজ তাদের অবশ্যই আছে! তারা ঘুঘু চড়ায় লক্ষ লক্ষ ভিটের ওপর দিয়ে, সেটা আমি পারিনি বলেই নিজের ভিটেতেই নিজে ঘুঘু চড়াচ্ছি। এতপাপেও যদি বা আমি মুক্তি পাই, ওরা পাবে না। আপনাদের মেয়েটি না হয় বুঝলাম খুবই সৎচরিত্রা সুশীলা বালা; কিন্তু তাঁর স্বামী-দেবতাটির মুখ দিয়ে এই গ্যাণেশচন্দ্রের মতই লালা ঝরে পড়ছে কি না কে জানে?'

মাণিক মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, 'আমি ভালো ক'রে জানি, তা পড়চে না এবং কোনোদিন পড়বেও না।'

'ও আপনি জানেন নাকি? জামাইবাবুটি যেখানে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসেছেন, সেখানে ওইটেই সম্ভব কি না? তা আপনি যখন বিলক্ষণ জানেন তখন আর কি বলবো? মশাই কি বাবুটির মোসাহেব, না ষ্টেটের কোন সরকার গোমস্তা?'

'আজ্ঞে না, আমিই সেই উড়ো পাখী, যিনি গিয়ে জুড়ে বসেছেন।'

রায় গণেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাকিয়াটা সরাইয়া দিয়া উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, 'বলেন কি, আপনি! বিলক্ষণ, আগে বলতে হয়।'

ট্রে হইতে একটি সুধাপূর্ণ ভাণ্ড তুলিয়া লইয়া বলিলেন, 'মশাই'র কি সত্য সত্যই ওভ্যাস নেই নাকি, বলেন ত' এক গ্লাস—

'আপনার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্কও আছে।'

'সম্পর্ক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আর সেটা হয়ত আপনি শুনতে পেলে এই মসৃণ কার্পেট থেকে তুলে দিয়ে আমাকে ওইখানে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ দেবেন; সুতরাং আপনার এই অনুরোধটা আরও অসঙ্গত!'

'মশাই হেঁয়ালি রেখে বলুন কি সম্পর্ক?'

'সম্পর্কটা হলো রাজা-প্রজা। আমার বাড়ি চোদ্দরশি!'

'চমৎকার! সে ত' আরো ভালো কথা। দেখুন ত' বিধাতার কি সূক্ষ্ম বিচার! প্রকৃতির অভিশাপ কেমন ক'রে বহন ক'রে নিয়ে আসে! আপনি একজন আমার সাধারণ প্রজা, দুমুঠো হয়ত পেট ভ'রে খেতেও পান্ না, আজকে এসেছেন আমার জমিদারী কিনতে! শুধুই কি আমি বলি ভগবান আছে, — তা এই পঞ্চশালা মানতেই চায় না। তা হোক, আপনি লজ্জিত হবেন না। বরং নিন্ এক গ্লাস—

'মাপ করবেন। প্রথমতঃ ওটা আমি কোনদিনই খাই না, দ্বিতীয়তঃ আপনি উচ্ছৃঙ্খল যতই হোন্ না কেন, আপনার জমিদারীতে আমরা সুখেই

বাস করেছি — সুতরাং একটা কৃতজ্ঞতাও ত' আছে। আপনি দয়া ক'রে কাজের কথা বলুন।'

মাণিকের কাজের কথা শেষ না হইতেই পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—লাস্যভারে পীড়িতা মন্থরগামী একটি স্থূলাঙ্গী যুবতী। সুন্দরী তাহাকে বলা চলে না। শুধুমাত্র সাজসজ্জার একটা গিল্টি করা চাকচিক্যে সেই সব মানুষেরই মন হরণ করে, যারা মনুষ্য পদবাচ্যের একান্তই অযোগ্য!

মাণিক অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমি তা হ'লে উঠি, হুজুরের অমূল্য 'সময়টাও নষ্ট করে' দরকার নেই, আমারও কাজের কথা আপনার অবসর সময়ে আর একদিন হবে।'

গণেশচন্দ্রের চক্ষু এতক্ষণে নেশায় কিছু ভার হইয়া আসিয়াছে। একটু ঝিমাইয়া লইয়া বলিলেন, 'কোথায় এই দুপুর রোদ্দুরে কলকাতার রাস্তায় টো টো ক'রে বেড়াবেন, তার চেয়ে বসুন, একপাত্র নিন্, বাইজির দুটো গান শুনুন।'

'আপনার নেশার মাত্রাটা একটু বেশী হয়েছে, একটু বিশ্রাম করুন।'

'কিছু না। আফিমের গুলিটা আগে গিয়ে পেটের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ সুরু ক'রে দিয়েছে, তারই সঙ্গে সরাবজি মিশে গিয়ে, বুঝলেন কিনা মশাই, একটা বড় রকমের যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাইছে! কিন্তু চাঁদটি একটি নীলকণ্ঠ! যাকে আপনারা বলেন বাবা ভোলানাথ, তাই কোন কিছুতেই……… বুঝলেন কিনা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ বুঝেছি।'

বলিয়াই মাণিক দাঁড়াইয়া উঠিতেই গণেশ রায় চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ও কি! সত্যি সত্যি উঠলেন নাকি? কিন্তু কাজের কথা ত কিছুই বলা হলো না।'

'কৈ হলো? এত কাজের মধ্যে কি ও-সব অকেজো কথা হয় বলুন?'

'তা বটে! কিন্তু আমাকে ত' এই গর্ত্তের বাইরে পাবেন না; কোন্ সময়ে যে চোখ বুঁজে পা পিছলে এই গর্ত্তের ভেতর পড়ে গেছি মনে নেই! ওঠ্‌বার জন্য মশাই বহু ঝুলো-ঝুলি করেছি; শত হলেও মানুষ ত'! কিন্তু করলে কি হবে, গর্ত্তের ভেতর জলে কাঁদায় কাঁটায় এমনি জড়িয়ে পড়েছি যে কার বাবার সাধ্য সে গর্ত্ত থেকে ওঠে! বুঝলেন মশাই এই আমার জগৎ। এই মদের গেলাস, ওই বাইজি এদের মধ্যেই আমি স্বর্গ খুঁজে নিয়েছি! সুতরাং আমার অবসর অনবসর সব এইখানে। তাই বলছিলাম, আপনার ওই — অকেজো কথাটা ত কিছু হলো না!'

'আপনি দয়া ক'রে '

'কিচ্ছু না। আপনার দয়া হলেই বরং আমি বাঁচি। বুঝলেন কিনা আমি চাই টাকা। খাজনার বাজনার সাধ মিটে গেছে, সে আপনার দেবীরাণী বুঝে নিক্‌গে। আমাকে শুধু টাকার হুণ্ডিটা দু'চারদিনের মধ্যে এনে ফেলে দেবেন। কবে আসবেন বলুন?'

'আমি কালকেই আসবো। যদি একান্ত কাল না পেরে উঠি পরশু নিশ্চয়ই আসবো।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসবেন। আমাকে এখানেই পাবেন। দেরি হয়ে গেলে কিন্তু দাম চড়ে যাবে মশাই। সেটা যেন মনে থাকে, বুঝলেন কিনা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটা আমি সবিশেষ বুঝে নিয়েছি।'

মাণিক হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া পা বাড়াইতেই গণেশ রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, 'পরশুদিন আসচেন তা হ'লে? কিন্তু মশাই'র নামটা ত শোনা হয়নি?'

'আমার নাম মাণিকলাল মুখুজ্যে।'

বলিয়াই আর কথার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মাণিক বাহিরে চলিয়া আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

*　　*

*

যত শীঘ্র কাজ শেষ করা যাইবে টাকার অঙ্কটাও ততই কমিয়া যাইবে। রায় গাণেশের নরকে যাইবার পাথের কম পড়িয়া গেছে। অথচ নরকে না গেলেও চলিবে না, জীবন কণ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে, তাই সেখানকার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা চলে না। এ হেন গুরুতর অর্থ সংকটময়তার কালে মাণিকলালের আবির্ভাব গাণেশ রায় অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিল। মাণিকলাল বুঝিল কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত ব্যক্তিটি এখন সোনাকে তামার দরে বিক্রী করিতেও প্রস্তুত। সুতরাং এই সুযোগ অবহেলা করার মত নির্ব্বুদ্ধিতা অন্ততঃপক্ষে বৈষয়িক ব্যক্তির থাকা উচিৎ নয়!

মাণিকলাল বৈষয়িক না হইলেও এই সহজ বিষয়টা বুঝিল। তাই সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া সেই দিনই লক্ষীপুরে চলিয়া গেল। লক্ষীপুর পৌছিয়াও শলাপরামর্শের জন্য অহেতুক সময় নষ্ট না করিয়া মাণিক তাহার পরের দিনই দেবীকে সব বুঝাইয়া বলিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এবার সে একা আসিল না। সঙ্গে আসিলেন ডেভিস সাহেব ও সোমনাথবাবু। যাহাতে দুই চারদিনের মধ্যেই কার্য্যটা শেষ হইয়া যায় এই চেষ্টায় তিনজনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

অবশেষে সম্পত্তিটা মাণিক নিজের নামেই কিনিতে বাধ্য হইল।

দেবী বলিয়া দিয়াছে, 'বলা ত যায় না, তোমার যদি আরও দুটি ছেলে হয়। দ্বিতীয়তঃ এতটুকু ছেলে যার আজ পর্য্যন্ত মুখে ভাত পড়েনি,

নামটা পর্য্যন্ত হয়নি, তার নামে কিছুই চলে না। তুমি বরং তোমার নামে কেন। টাকাটা দেবী তোমায় ধার দিচ্ছে, ধীরে ধীরে শোধ দিও, সুদ সমেত আমি নিতে রাজি আছি।'

গত্যন্তর না দেখিয়া মাণিক অবশেষে নিজের নামেই নতুন সম্পত্তি খরিদ করিল।

দুই একদিনের মধ্যে কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হইয়া গেল। দলিল সম্পাদনও হইল, টাকাপয়সার লেনদেনও হইল।

সোনার-খনি পরের হাতে চলিয়া গেল।

বলিতে গেলে একরূপ জলের দরেই স্বর্গীয় মহাদেব রায়ের সেরা মহালটি কুপুত্রের নরকের পাথেয় সংগ্রহের জন্য বিক্রী হইয়া গেল। বাকীটাও হয়ত এমনি করিয়াই যাইবে।

উনিশ

দুই মাস পর অতীব ধুমধামের সঙ্গে নবজাত শিশুপুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। মাণিকলালের পুত্রের নাম রাখা হইল জহরলাল। আমকাঁঠালের দিনে গ্রামের লোক পরিতোষ সহকারে ভূরি-ভোজন করিয়া দুইহাত তুলিয়া শিশুকুমার জহরের দীর্ঘায়ু কামনা করিতে করিতে বিদায় লইল।

জ্যৈষ্ঠমাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

আষাঢ়ের আকাশে মেঘ জমিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে বর্ষা আসিয়া যমুনার জল ফুলিয়া উঠিয়া দুইকূল ছাপাইয়া ভাসিয়া পড়িল যত ছোট ছোট শাখা নদীতে। শাখানদী হইতে জল

গড়াইয়া ভরিয়া উঠিল যত খাল বিল। দেখিতে দেখিতে সে জল উপচাইয়া আসিয়া পড়িল ক্ষেতের বাঁকে যত সব মেঠোপথের বুকে।

নদীমাতৃকা পূর্ব্ববঙ্গের বর্ষায়, তরুলতায় আচ্ছন্ন পল্লীগুলি জলভরা প্রকৃতির বুকে ভাসিয়া উঠিল।

দূর হইতে লক্ষ্মীপুরকে দেখা যায় একটা ছবির মত। গ্রামের কোল ঘেঁষিয়া বিস্তৃত পরিখা রাজবাড়ির পিছন দিকটা বেষ্টন করিয়া আসিয়া সুমুখের যে দুইটি খালের মোহনায় মিশিয়াছে, তাহার নাম কানমলার খাল ও মামাভাগ্নের খাল! এই অদ্ভুত নামকরণের ইতিহাসটুকু আমাদের জানা নাই। তবে লোকে বলে একটি খাল কাটিতে গিয়া মজুরদের মধ্যে যে কলহের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার শাস্তিবিধান হইয়াছিল দুই পক্ষের সর্দ্দারকে কান মলিয়া দিয়া! কথাটির মধ্যে সত্যতা কতটুকু আছে, কি আদৌ আছে কিনা জানি না, তবে প্রবাদটুকু এই!

দ্বিতীয়টি দুই মাতুল ও ভাগিনেয়র সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাটা হইয়াছিল বলিয়াই তাহার নাম রাখা হইয়াছিল মামাভাগ্নের খাল। হয়ত বা হইবে।

দুইটি খালে চৈত্র বৈশাখের ঘূর্ণি হাওয়া যেমন তপ্ত বালি উড়াইয়া লইয়া যায়, তেমনি বর্ষায় জল ভরিয়া গিয়া স্রোতের তীব্রতা প্রচণ্ড হইয়া উঠে। যমুনার জল প্রথমতঃ ইহাদের একটি খাল দিয়া প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক ছড়াইয়া পড়ে।

এবারও তেমনি দুইটি খালের মোহনায় আসিয়া নূতন জলের প্রথম বেগটা ঘূর্ণাবর্ত্তের মত পাক খাইতে খাইতে স্রোত উদ্দাম হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। ক্রমশঃ খালের জল উপচাইয়া গিয়া পড়িয়াছে লক্ষ্মীপুরের বিদ্যালয়ের সম্মুখের খেলার মাঠে। দেখিতে দেখিতে গ্রামের রাস্তাঘাট ক্রমশঃ ডুবিয়া গেল। শুধুমাত্র জলের উপর ভাসিয়া রহিল

রাজবাড়ির বিস্তৃত সীমানা ও বড় বড় গৃহস্থের বাস্তুভিটাগুলি। এক বাড়ি হইতে অপর বাড়ি যাইতে হইলেও নৌকা কিম্বা ডিঙ্গি ছাড়া যাওয়া দুঃসাধ্য। চতুর্দ্দিকেই কেবল জল আর জল। দুইদিকের সীমারেখা গিয়া মিশিয়াছে ঐ অস্পষ্ট ভাসমান গ্রামগুলির কোল ঘেঁষিয়া। অপর একদিক বড় নদীর সঙ্গে মিশিয়া দূর চক্রবালের শেষ সীমা কোথায় গিয়া হারাইয়া গেছে কিছুই ঠাহর করিবার উপায় নাই। সম্মুখে জল বেষ্টিত সুন্দর তকৃতকে ঝক্‌ঝকে যাহার সৌধের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে জলের নীল স্বচ্ছ বুকে, সেইটিই হইল দেবীরাণীর রাজপ্রাসাদ।

প্রাসাদে আজ হুলস্থূল পড়িয়া গেছে দেবীরাণীর মুর্শিদাবাদ যাত্রার আয়োজনে। মামা-ভাগ্নে খালের উপর ঢাকা হইতে পাঁচ পাঁচখানা বজরা আসিয়া নোঙর করিয়া রহিয়াছে আজ সপ্তাহখানেক ধরিয়া।

ছোট ছোট দেশী নৌকা বোঝাই হইয়া গাদা গাদা জড়ানো বিছানা, জাজিম, বড় বড় তোরঙ্গ, বাসনের প্যাকিং-বাক্স, গদি-আঁটা কৌচ, আরাম-কেদারা, কুশনচেয়ার, ছোট ছোট পালঙ, তাঁবু, ঝাড়-লণ্ঠন, ফুলের টব, ফুলদানি……রত সব রাজকীয় আসবাব চলিয়াছে বজরায় তুলিয়া দিতে।

* বড় বড় দুইটি বজরা জাহ্নবীদেবী ও দেবীরাণীর জন্য বহু মহার্ঘ আসবাব দিয়া অতি যত্ন ও সতর্ক নিপুণতার সঙ্গে সজ্জিত হইয়াছে। প্রতিটি বজরায় তিনটি করিয়া কামরা। কোনটায় খাট পড়িয়াছে, কোনটায় [illegible]ড়িয়াছে মূল্যবান কার্পেটের উপর খাসকামরার উপযোগী আসবাব। খাসকামরায় ঢুকিতেই প্রবেশদ্বারে সারি সারি চীনামাটির টবে [illegible] গাছ। দরজায় [illegible] দামী পর্দ্দা টাঙ্গানো হইয়াছে।

খুদে বক্সীদের কোথাও এতটুকু ত্রুটি নাই।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তিনটি বজরায়, — একটিতে যাইবে গ্রামস্থ আত্মীয় অনাত্মীয় তীর্থকামী দরিদ্র গঙ্গাযাত্রীর দল। একটিতে যাইবে ভাণ্ডার। অপরটিতে যাইবে পাইক বরকন্দাজ সরকার ও যত সব খিদমৎগারের দল।

একপশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। উতলা বাতাস ও বর্ষণের মাতামাতির সন্ সন্ ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ গেল থামিয়া। পূর্ব্ব আকাশে উঠিল ইন্দ্রধনু।

সিক্ত সন্ধ্যার সেই অবসরে দেবীরাণী স্বামীপুত্র কন্যা সঙ্গে লইয়া সুসজ্জিত নির্দ্দিষ্ট বজরায় গিয়া উঠিল। অপরটিতে গুটিকয়েক আশ্রিত ছেলেমেয়ে ও বিধবা সঙ্গে লইয়া উঠিলেন জাহ্নবীদেবী। রঘুনন্দন তেওয়ারী ও সূর্য্যবদন সিং দুইজনে দুইটি রাইফেল কাঁধে করিয়া উঠিল দুই বজরার ছাতের উপর।

ছোট বড় অন্ততঃ পক্ষে শতখানেক ডিঙ্গির উপর দাঁড়াইয়া যে সব গ্রামবাসী আসিয়াছিল দেবীরাণীর যাত্রাসমারোহ দেখিতে, তাহাদের পিছনে ফেলিয়া সাতদিন পর নোঙর তুলিয়া মামাভাগ্নে খালের উপর বজরা ভাসিল বড় নদীর দিকে।

দুই ছাত হইতে দুইটি সেপাই পাঁচটি করিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিয়া দেবীরাণীর জলযাত্রার সংবাদ ছড়াইয়া দিল যতদূর শব্দ যায়।

আধঘণ্টার মধ্যেই একে একে সবগুলি বজরা মামাভাগ্নের খাল ছাড়িয়া বড় নদীতে আসিয়া পড়িল। দেবীর বজরার ছাতের উপর আরামকেদারায় উপবিষ্ট মাণিক মেনকাকে কোলে লইয়া চাহিয়া ছিল যমুনার নীল জল রাশির দিকে।

যমুনার পশ্চিম দিগন্তে দিকচক্রবালের শেষ সীমারেখায় যেখানে জলের সঙ্গে মিশিয়া কূল হারাইয়া গেছে অস্তগামী সূর্য্য সেখানে ডুবু ডুবু। মাণিক

মুগ্ধ দৃষ্টিতে নদীগর্ভে সূর্য্যাস্তের অপরূপ সে দৃশ্য চাহিয়া দেখিতেছিল। ক্রমশঃ সূর্য্য ডুবিয়া গেল। ভিতর হইতে নন্দঘোষ আসিয়া বলিল, 'ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, ওপরে আর এখন থাকবেন না জামাইবাবু। খুকীকে নিয়ে ভেতরে চলুন, রাণীমণি ডাকচেন।'

মেনকাকে নন্দের কোলে তুলিয়া দিয়া মাণিক আরও কিছুক্ষণ বসিয়া একসময় নীচে নামিয়া আসিল।

খাসকামরা পার হইয়া শয়নের জন্য যে কামরাটি সজ্জিত হইয়াছে, তাহারি ভিতর খাটের উপর জহরকে বুকে জড়াইয়া দেবী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুইয়া ছিল। মাণিক গিয়া দেবীর পাশে বসিল। ঘুমন্ত ছেলেটির উপর ভালবাসার মৃদু অত্যাচার সুরু হইতেই দেবী বলিল, 'অনেক চেষ্টায় ছেলেটি ঘুমিয়েছে, আর তাকে জাগাতে হবে না। তার চেয়ে একটু সুস্থির হয়ে বোসো, দুটো গল্প করি।'

'বেশ করো, শুনি তোমার গল্পই'

দেবীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মাণিক আবার বলিল, 'কৈ বলো গল্প?'

'ভাব্‌চি কি গল্প বলবো! তার চেয়ে বরং তুমি বলো। তোমার দেশে চলেছি, তোমার দেশের গল্পই বলো। সেখানকার মানুষগুলো কি রকম?'

হাসিতে হাসিতে মাণিক বলিল, 'সবই এই দেশের মত, তবে তোমাদের দেশের লোকের যেমন একটা ক'রে ন্যাজ আছে, আমাদের ওখানে আবার সেটা নেই।'

'তা হ'লে বুঝি শিঙ্‌ আছে? বড্ড গুতোয়, না? ও বাবা! তাহ'লে আমি যাবো না তোমাদের দেশে। চলো ফিরে।'

মাণিক বলিল, 'শিঙ্‌ থাকলেই বা তোমার ভয় কি? তোমার এত লোকলস্কর এত পাইক বরকন্দাজ এত বন্দুক গোলাগুলি, ও দেখ্‌লে

শিশু ত' ভেঙে যাবেই, আবার নূতন ক'রে স্বাজ গজিয়ে গুটিয়ে সব ছুটে পালাবে।'

'কেন আমি ডাকাত নাকি?'

'ডাকাত ত' বটেই, মেয়ে-ডাকাত!'

'এমন সুন্দর বিশেষণটি যিনি আমায় দিয়েছেন তাকে অশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু কী দুর্ভাগ্য লোকটার! তোমাদের পুরুষ জাতটাই এমনি, বিশেষ ক'রে এই শোষকশ্রেণী! পরের ওপরেও যেমন তোমাদের লুণ্ঠন চলে নির্দয় নীতিতে, তেমনি আত্মঘাতী নীতিতে নিজেরাও জ্বলে পুড়ে মরো!'

মাণিক বলিল, 'কথাটা মিথ্যা নয়, সুতরাং বৃথা প্রতিবাদ ক'রে নিজের জাতের জয়গান ক'রে লাভ বিশেষ হবে না, অন্ততঃ তোমার কাছে। কিন্তু ও লোকটার কথা ছেড়ে দাও। ওটা সত্যই পাষণ্ড। কিন্তু ওর বাপ মহাদেব রায়ের নামকাম ওঁর সর্ব্বস্ব তলিয়ে গেলেও থাকবে। আমাদের দেশের জমিদার, আমরা ত' জানি। তিনি ছিলেন একজন মহাপুরুষ। বাপের বরাদ্দ দানদাতব্য যে সব ছিল, সে ত' চুলোয় যাক্, পাষণ্ডটা এখন দেবোত্তর সম্পত্তিগুলোর আয় ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাচ্ছে। বাপের অমন কীর্ত্তি, বৃন্দাবনের কথা থাক্, কাশীর কথাই বলি, বিরাট শিবের সত্রটা, যেখানে প্রতিদিন দেড়মণ চালের বরাদ্দ ছিল, যেখানে প্রত্যহ শতাধিক দুঃস্থ ব্রাহ্মণ ও অনাথা বিধবাদের পাত পড়তো, আজ সেখানে গুটিকয়েক সরকার গোমস্তার লুটপাট চলেছে! ওর বাপের আমোলের চার পাঁচখানা বাড়ি আজও তেমনি পড়ে আছে, যেখানে একদিন দেশের কত অনাথা আশ্রয়হীন একটু মাথা গুজবার মত আশ্রয় পেয়ে ধন্য হোত, পাষণ্ডটা গেল বছর ম্যানেজারকে ডেকে নোটিশ জারি ক'রে দিয়েছে। হুকুমের ভাষাগুলো আরো চমৎকার! কুমন্ত্রণার গুরুদেবদেরই হয়ত সেই সব রচনা।'

'কি নোটিশ দিয়েছে ?'

'সবগুলো লক্‌-আপ্‌ ক'রে রাখবেন। একটা মানুষ দূরের কথা একটা আরসোলা পর্য্যন্ত যেন ঢুকতে না পারে। এখনো যারা আছে তারা ভালোয় ভালোয় যায় ত' ভালো কথা, নইলে ঝেঁটিয়ে তাড়াবেন।'

দেবী শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। বলিল, 'বলো কি, এমন বাপের এমন ছেলে !'

'ওর বাপ ছিলেন ক্ষণজন্মা প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষসিংহ। ওটা হয়েছে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চামচিকে। স্বার্থ ছাড়া কথা নেই। শুধুমাত্র নিজের উদর আর গুটিকয়েক মোসাহেব ! দিনরাত্র মাইফেল ! মদ মেয়েমানুষ !— কিন্তু লোকটা এমন ছিল না। কতগুলো মানুষ-জোঁক জড়ো হ'য়ে গণ্ডূষে ওর রক্ত শুষে ওকে নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌চে। গাণেশবাবুর জন্য দুঃখ হয়।'

দেবী বলিল, 'আমার হয় না। যদি এই দুর্ভাগ্য ও পরাজয়ের মধ্য দিয়েই ওঁদের শিক্ষা হয় শুধু এই আশায়। একা গাণেশবাবু ত' নয়, বাঙলার অনেক বাবুসাহেবই ত' এই পরাজয়ের গ্লানি শিরে তুলে নিয়েছেন। তাই বলছিলাম শিক্ষা নেবার সময় এসেছে। মানুষ শিখেছে নিজের অধিকার বাজিয়ে নিতে। ফাঁকি দিয়ে পাঁকে ফেলে রাখবে তাদের আর কতকাল ? পিতৃপুরুষের চ্যারিটির খাতা খুলে সরকারের রক্তচক্ষুকে হয়ত বা স্তিমিত ক'রে রাখা চলবে আরও কিছুদিন ; কিন্তু কালপুরুষের রক্তচক্ষু দিয়ে যে অগ্নিস্রাব নির্গত হবে তাকে রোধ করবে কে ? জন্মের দাবী নিয়ে লক্ষ লক্ষ আত্মার ওপর আমাদের এই নির্দয় রথ চালিয়ে দিলে, প্রকৃতির অভিশাপে যে ওই সোনার খনি ছাই হয়ে উড়ে যাবে !'

মাণিক বলিল, 'দেবী তোমার এই বক্তৃতা লোকে শুনলে কি বলবে জানো ?'

'কি বলবে ?'

'বলবে পুরুষের ওপর একটা নিষ্ফল জাতক্রোধে তোমার রসনা কলঙ্কিত করছো !'

'হয়ত তাই বলবে ; কিন্তু তা যে সত্য নয় ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে। আর আমার অঙ্গে থুথু ফেলে শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ চরিতার্থই হবে, ভবিষ্যতের অনাগত মানচিত্রে যে রেখা ফুটে উঠ্‌ছে রাশি রাশি কালি ঢেলে দিলেও তাকে অন্তরালে সরিয়ে রাখতে পারবে না। মোট কথা তুমি এটা ঠিকই জেনো বাঙলাদেশের এই হাতীগুলো কাঁদায় একদিন পড়বেই।'

'কিন্তু তার পূর্ব্বে হাতীগুলো যদি পাগ্‌লা হ'য়ে একটা কিছু ক'রে বসে !'

'তাদের ত' তাহ'লে হাতী না বলে মানুষই বলতাম। ওগুলো এতই অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হয়ে গেছে যে তা তাঁরা পারবে না। দ্বিতীয়তঃ মাহুত তাঁদের বড় শক্ত। ওই মাহুত সরিয়ে দলবদ্ধ হয়ে যদি একটা কিছু করতে পারতো তা হ'লে ত দেশের লোক তাঁদের মাথায় তুলে নাচতো ! কিন্তু দেশের কাজ ওঁরা করবে না, তাতে ওঁদের পাপ হবে। তাই বলছিলাম সবদিক দিয়েই ওঁরা মরেছে !'

'কিন্তু মরা হাতী লাখটাকা জানো ত ?'

'প্রবাদটা আছে, কিন্তু তার তেজ নেই। যার জন্য কথাটার এত আদর সে দন্ত আর দরবার কক্ষে শোভা পাবে না, সে দাঁত দিয়ে একদিন লাঙ্গলের ফলা তৈরী হবে।'

দেবীর উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা হঠাৎ থামিয়া গেল নন্দের কোলে মেনকাকে দেখিয়া।

বলিল, 'ওকে খাইয়ে নিয়ে এসেছো নন্দকাকা ?'

মেনকা যাহার হাতে মানুষ হইতেছে মেনকার মাও একদিন সেই হাতেই মানুষ হইয়াছে। কিন্তু দেবী নিজের পদমর্য্যাদায় ভুলিয়া গিয়া খানসামা হইলেও নন্দকে আজ পর্য্যন্ত কোনরূপ অসম্মান ত' করেই না বরং তেমনি ছোটবেলার মত আজও সে তেমনি করিয়াই কাকা বলিয়া ডাকিতে ভুল করে না!

নন্দ বলিল, 'হ্যাঁ রাণীমণি, খাইয়ে নিয়ে এসেছি। তোমার যে দুরন্ত মেয়ে, বিষ্টুঠাকুরের সাধ্য কি যে একা ওকে সামলায়! তোমার নন্দকাকা কাছে বসে না থাকলে তোমার মেয়ের পেট ভরে না।'

দেবী বলিল, 'মেয়ের পেট ত' ভরালে কাকা, রাত ত' হলো, মেয়ের মার পেটেও যে এখন কিছু চাই। তোমাদের বজরা বাঁধবে কোথায়?'

'আজকের রাতের মত আমাদের সাজানপুরের কাছারির কাছে হাটখোলার ঘাটে বজরা বাঁধবে।'

'সে কতদূর?'

নন্দ একটু বাহিরে ঝুঁকিয়া মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'রঘুনন্দনজি হাটখোলার ঘাট আউর কেতনা দূর হোগা?'

উপর হইতে রঘুনন্দন হাঁকিয়া বলিল, 'আ পহুঁচা। আধা মিল হোগা।'

নন্দ মেনকাকে মাণিকের কোলে তুলিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলে দেবী বলিল, 'মিনু শুয়ে পড়ো, রাত্রি হয়েছে।'

মেনকা মাণিকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'আমি এখন ঘুমবো না। বাবার কাছে গল্প শুনবো।'

বাবা বলিল, 'বেছে বেছে তোমরা দুটি মা ও মেয়ে গল্প শোনার লোক খুঁজে নিয়েছো ভালো। বলো মা কি গল্প বলবো?'

মেনকা বলিল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি বলো?'

'যাচ্ছো তোমরা গরীব বাপের বাড়ি।'

কথাটামাত্র মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, বাধা দিয়া দেবী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, 'গরীবানা দেমাক তোমার গেল না। এখন আবার তুমি গরীব কিসের গো? তুমিও ত' এখন একজন জমিদার।'

'হ্যাঁ নামে মাত্র। আসল সত্যটা চাপা থাকলেও একথা আজ আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে আজ আমিও একজন গাণেশ রায়ের স্বজাতি। কিন্তু ভয় শুধু তাঁরই তক্তায় বসে তাঁরই নীতি অনুসরণ না করি।'

'দেবী বেঁচে থাকতে এত সাহস তোমার হবে না।'

'একমাত্র এই ভরসা।'

কিন্তু মেনকা অস্থির হইয়া উঠিল। কোথায় সে বাপের কাছে গল্প শুনিবে, তা না বাবা জুড়িয়া দিয়াছে গল্প মার সঙ্গে।

মেনকা বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, তুমি বললে না কোথায় যাচ্ছি? তোমার মার কাছে?'

'হ্যাঁ মা ঠিক বলেছো। এখন শুয়ে পড়ো, রাত্রি হয়েছে। কাল বলবো গল্প।'

মেনকার মনের ইচ্ছাটা ছিল অন্য রকম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার শয্যায় গিয়া আশ্রয় লইতেই হইল। বিছানায় শুইয়া শুইয়াই দুই-চারটা কথা বলিতে বলিতে এক সময় চক্ষের পাতা আপন হইতেই বুজিয়া আসিল।

মেনকা ঘুমাইয়া পড়িলে মাণিক কি ভাবিয়া দেয়াল-বাতিটা বাড়াইয়া দিল। মিট্‌মিটে সবুজ আলো আরও উজ্জল হইয়া কামরাটি সবুজ আভায় রঙিন্ করিয়া তুলিল!

সেই রঙিন্ আলোয় দেবীর নিরাভরণা দেহটার পানে একবার ভালো করিয়া মাণিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হাতে দু'গাছা করিয়া সোনার চুরি। একগাছা করিয়া সোনা-বাঁধানো লাল শাঁখা। গলায় সামান্য রকমের একটা হার। কানে তেমনি একটা ইয়ারিং। পরণে লালপেরে আটপৌরে একটা সাধারণ ডুরে শাড়ী।

দেবী বলিল, 'কি দেখছো ?'

'দেখছি গৃহস্থঘরের কুলবধূটিকে! সত্যি করেই তুমি দামী দামী গয়নাগুলো খুলে রেখেছো !'

'বলেছি ত', আমি যাচ্ছি শ্বশুর-বাড়িতে বধূ হয়ে। গ্রাম্য বধূর এই বেশই সেখানে মানাবে ভালো।'

'কিন্তু দেবীরাণীকে যে কেউ চিনতে পাবে না।'

'খুব পাবে। দামী শাড়ী আর দুটো দামী গয়না যে দেবীরাণীর আছে তা তাঁরা জানে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে আমার ঐশ্বর্য্যের দেমাক দেখাতে নিশ্চয়ই যাচ্ছি না, যাচ্ছি তাঁদের পায়ের ধূলো নিতে। যাচ্ছি তাঁদের নাতির মুখ দেখাতে! সে কথাটা কি তুমিও ভুলে গেলে ?'

'রাগ কোরো না দেবী, তাই যদি সত্যি হয় তা হ'লে এত লটবহর এত লোকলস্কর এত আড়ম্বর কি শুধুই —

মাণিকের কথা শেষ করিতে হইল না। দেবী তাহার অবশিষ্ট প্রশ্নেরও জবাব দিল।

দেবী বলিল, 'এই সোজা কথাটা তুমি বুঝলে না? ওটা হলো আমার পিতৃপুরুষের তক্তার সম্মান। সঙ্গে যাচ্ছেন আমার পিতামহী। তাঁর সম্মানের জন্যও এই আড়ম্বরের আমার প্রয়োজন আছে। তোমার স্ত্রী দেবীরাণীর ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপন ওটা নয়। জমিদারীর খানদানী বজায় রাখতে হলে এ সমারোহ যে অনর্থক নয়, এ কথা আমি না বললেও তোমার বোঝা উচিৎ।'

অনুগত ছাত্রটির মত মাণিক ভুল স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল, 'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আমার সেই পাগলী বোনটার কথা ভেবে!'

'কালীদাসী ?'

'হ্যাঁ, সে ত' দেবীকে খুঁজেই পাবে না। এমন সাধারণ বেশভূষা যার, সে ত' নিশ্চয়ই রাণী হতে পারে না। বেচারী খুঁজে খুঁজে হায়রান হ'য়ে যাবে। তারপর যখন শুনবে যে তুমিই রাণী, তখন যে তার মুখে চেহারাটা কেমন ক'রে বদলে যাবে, আমি কেবল সেই কথাই ভাবচি!'

'কি সে ভেবে রেখেছে শুনি ?'

মাণিক বলিল, 'রাণী যখন, নিশ্চয়ই তাঁর মাথায় থাকবে সোনার মুকুট গলায় থাকবে দশলহরের মালা, নিতম্বে ঝুলে পড়বে সোনার মেখলা…… এমনি সব কত কি!'

এই সময়ে নন্দ খানসামা আসিয়া জানাইল, 'হাটখোলার ঘাট ওই দেখা যায়।'

দেবী ও মাণিক জানালা দিয়া মাথা গলাইয়া সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা গেল না। শুধু দেখা গেল বহু লোকজন আর অনেকগুলি আলো। নদীর ঘাট হইতে অর্দ্ধ মাইল দূর সাজানপুরের ডিহি কাছারি হইতে — তাহারা আসিয়াছে মালিকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের তদ্বির করিতে।

দশ দিনের দিন অতি প্রত্যুষে মুর্শিদাবাদের গঙ্গায় আসিয়া বজরা পড়িতেই মাণিক জাহ্নবীদেবীকে ডাকিয়া সুসংবাদটি বলিয়া পাঠাইল।

জাহ্নবীদেবী হন্তদন্ত হইয়া উঠিয়া বাসীশয্যায় বসিয়াই যথারীতি প্রাতঃকৃত্যের অঙ্গীয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্মরণ করিয়া জানালার দিকে

সরিয়া বসিলেন। ভাগীরথীর পুণ্যবারি দর্শন মাত্র দুই হস্ত বারম্বার কপালে স্পর্শ করিলেন।

জোড়হস্ত কপালে ঠেকাইয়া রাখিয়াই জাহ্নবীঠাকুরাণীর এক মনে এক ধ্যানে সুদীর্ঘ গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

গঙ্গার স্তব স্তোত্র প্রণাম শেষ করিয়া জাহ্নবীদেবী মণির মাকে ডাকিয়া ছোট্ট একটি তাম্রভাণ্ডে গঙ্গার জল তুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় ছিটাইয়া দিলেন।

গঙ্গার পুণ্যবারি সিঞ্চনও শেষ হইল; কিন্তু স্বার্থপরের মত পুণ্য অর্জ্জনের শিক্ষা তাঁহার নাই। তাই নিজের কার্য্য শেষ করিয়াই ঐ সঙ্গে মণির মাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, 'দেবীর বজরায় ডেকে বলে দে, সবাই যেন গঙ্গার জল তুলে মাথায় দেয়।'

আরও কিছু আগাইয়া গিয়া একটা পরিষ্কার নিরিবিলি জায়গা দেখিয়া গঙ্গার একেবারে পার ঘেঁষিয়া বজরা আসিয়া থামিল।

সঙ্গে সঙ্গেই স্নানদানের ধূম পড়িয়া গেল।

দ্বার-পণ্ডিত যদুনাথের সু-উচ্চারিত মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া নাভিগঙ্গায় দাঁড়াইয়া জাহ্নবীদেবী সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ওই সঙ্গে জপ তপ এবং স্বর্গীয় কর্ত্তা-কর্ত্রীদের নামে নামে প্রায় পঞ্চাশটি ডুব দিয়া গঙ্গাস্নানকৃত্য শেষ করিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পর জাহ্নবীদেবীকে সকলেই গঙ্গা হইতে ধরাধরি করিয়া উপরে তুলিয়া লইয়া আসিল। তাহার পর একে একে সকলেই স্নান ও অঙ্গীয় কার্য্য শেষ করিয়া লইল।

গঙ্গাস্নান পর্ব্ব শেষ হইতে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর আহারাদি শেষ করিয়া লইতে লইতে সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল।

ইহার পর বজরার গন্তব্যস্থান কোথায়?

তাহাই বুঝি স্থির করিতে ঠাকুরমার বজরায় বসিয়া দেবী তাঁহার দুইটি পা জড়াইয়া ধরিয়াছে।

দেবীর মাথায় হাত বুলাইয়া জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'বল্‌না কি বলতে চাস ?'

দেবী বলিল, 'বলবো ঠাকু'মা ? রাখবে আমার কথা ? ধর্ম্মকর্ম্ম যা কিছু তোমার কাছেই শিখেছি। গুরুপীঠ পিছনে ফেলে যেতে নেই, তুমি যদি আদেশ করো—

জাহ্নবীদেবী পরিষ্কার কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, 'এখানে আবার গুরুপীঠ কোথায় ? ইষ্টদেবতা ঠাকুরের বাড়ি ত' আমাদের নবদ্বীপের কাছে, বেলপুকুরে।'

'স্বামী-পীঠ কি গুরুপীঠ নয় ঠাকু'মা ? স্বামীর চেয়ে স্ত্রীলোকের গুরু আর কে বেশী ? এই রাত্রিটা নৌকা বেয়ে গেলেই নাকি চোদ্দরশির ঘাট। এত কাছে এসে শ্বশুরবাড়ির ধূলো নিয়ে না গেলে তাঁরাই বা কি ভাব্‌বে ? আমার মনকেই বা কি বলে বুঝাবো, বল ?'

জাহ্নবীদেবী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু দিদি কুটুম্ববাড়ি আমি যাবো কি ক'রে ? বিয়ে হবার পর আমি আমার বাপের বাড়ি পর্য্যন্ত যাইনি, এখন তোর শ্বশুরবাড়ি আমার যেতে হবে ?'

দেবী বলিল, 'তুমি না হয় বজরাতেই থেকো। আমি গিয়ে একবার দেখা ক'রে আসবো। আর তুমি ত' আমার শ্বশুরবাড়িতেই যাবে ভেবে বের হওনি। এসেছো তীর্থ করতে, রাস্তায় পড়েছে, তাই একটু না হয় দেখা দিয়েই গেলে। তাঁদের ভিটেয় তোমার পায়ের ধূলি পড়বে, এ তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেনি ! আমিও আমার ঠাকুরমাকে এক বস্ত্র পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না। তোমার মানসম্মান যাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়, সে দৃষ্টি আমার আছে !'

অনেক ভাবিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, 'বেশ তুই না হয় যা, আমি এখানেই থাকি। তুই ফিরে এলে আবার একসঙ্গে এখান হতে বজরা ছাড়বো।'

সঙ্কল্পের দৃঢ়তা কিছুমাত্র শিথিল না করিয়া দেবী বলিল, 'তা হয়না ঠাকু'মা। এতে আমাদের মান বাড়বে না, অহঙ্কারটাই বাড়বে! তারপর মনে আছে ত'? একদিন যাকে ছেড়ে দিয়েছিলে, তাঁর ছেলেটিকেও আর ফিরে পাওনি! কুমারের মত জহরকেও যদি তাঁরা ছেড়ে না দেয়?'

পূর্ব্বদৃষ্টান্তের সঙ্গে বর্ত্তমানের কোন মিলই নাই। তথাপি স্নেহপ্রবণা জাহ্নবী একটা অহেতুক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। একটা দুঃস্বপ্নের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্যই বোধকরি তিনি অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

বলিলেন, 'বেশ ভালো; কিন্তু আমি বজরাতেই থাকবো। বুড়োমানুষ নড়তে চড়তে পারি না, হাঁপানিটাও ক'দিন ধরে বেড়ে গেছে, কথাটা ত' সত্যি। সেই অজুহাতে আমাকে নিয়ে আর তোমারা টানা-হেচ্‌ড়া কোরো না দেবী, এই তোমার কাছে অনুরোধ।'

জাহ্নবীদেবীর অনুমতি আদায় করিয়া দেবী বজরা ভাসাইয়া দিল।

গঙ্গার পার দিয়া পায়ে হাঁটিয়া একজন পাইক চলিয়া গেল, আগে গিয়া সেখানে সংবাদ দিতে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।

চন্দ্রদেবের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িয়াছে চতুর্দ্দিকে।

সেই জ্যোৎস্নার অপর্য্যাপ্ত আলো মাথায় করিয়া মুর্শিদাবাদের গঙ্গার উপর দেবীরাণীর পাঁচ পাঁচটি বজরা সারি সারি ভাসিয়া চলিল চোদ্দরশির দিকে।

বিশ

পরের দিন বেলা আন্দাজ নয়টার সময় সারাটা গ্রাম ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে চোদ্দরশির ঘাটে। বালক বৃদ্ধ যুবা বলিতে যাহারা গ্রামে বাস করে, তাহারা প্রায় সকলেই আসিয়াছে।

গ্রামের মেয়ে বৌরা পর্য্যন্ত জল আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসে না। এক্ষুণি আসিবে, আর বেশী দেরী নাই, ওই বুঝি বাঁকের মাথায় দেখা যায় একটা বড় নৌকা! এমনি সব উদ্‌গ্রীবতার মাঝে থাকিয়া থাকিয়া শুধু 'এই বুঝি' 'এই বুঝি' একটা ভাব আসিয়া উঁকি মারিয়া যায়। সেই আলোড়নের মাঝে আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যটি কিন্তু সহজে নয়নগোচর হয় না। কেহ কেহ সেই কোন সকালে আসিয়াছে, দেখিতে দেখিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেছে, তবু তাহারা দাঁড়াইয়া আছে একটা নূতনত্বের মোহে, একটা বিস্ময়জনক কিছু দেখিবার আশায়!

গঙ্গার ঘাট হইতে পীতাম্বর বাবুর বাড়ির দীর্ঘ সুপারি বৃক্ষের শ্রেণী ও বড় বড় আটচালা টিনের ঘর দুইটি পরিষ্কার দেখা যায়। আর বাকীটা আম ও জাম গাছের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে।

বাড়ি হইতে বাগানের মধ্য দিয়া গঙ্গার ঘাটে যাইবার পায়ে হাঁটা পথের উপর আজ স্থানে স্থানে নূতন মাটি পড়িয়াছে। গাছের ডাল পাতা সব ঝাঁটাইয়া সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়ি হইতে ঘাট পর্য্যন্ত দুইদিকে কলাগাছের সারি। মাণিকের এত নিষেধ সত্ত্বেও রাখাল ও তাহার মেজভাই রমেন নিজে হাতে দেবদারু পাতা দিয়া ছোট্ট একটা গেটও সাজাইয়াছে। গেটের পরেই ঘাটের উপর তক্তা ফেলিয়া একটি জেটিও তৈয়ারী হইয়াছে। জেটির উপর বিছানো একটা নূতন সতরঞ্চি। দরিদ্রের সাধ্যাতীত আয়োজনের কিছুই ত্রুটি নাই।

পীতাম্বরবাবুর হাস্যোজ্জ্বল মুখটি দেখিয়া আজ গ্রামের নিন্দুকদের কী যে মনঃপীড়া হইয়াছে, তাহা আর কেহ না বুঝিলেও পীতাম্বর বাবু বুঝিয়াছেন। তাই বুঝি আরও রাশভারী মেজাজে তিনি তাহাদের শুনাইয়া শুনাইয়া হাঁকডাক সুরু করিয়া দিলেন। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ঘন ঘন রাখালকে ডাকিয়া তম্বি করিতে লাগিলেন। রমেনকে দুই ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এখনো দু'টি মঙ্গল কলস এনে রাখতে পারলিনি!'

অদূরে মেয়েদের ঘাটে গৃহিণীকে উপলক্ষ্য করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, 'দাসীটা এখনো এলো না! ওর সাজগোজ কি আজ শেষ হ'বে না? বরণডালা সাজিয়ে রেখে দাও। শঙ্খটা কোথায়? বৌ ঘাটে পা দিলেই ফুঁ দিতে যেন ভুলো না।'

এমনি সময়ে সমস্বরে কয়েকজন চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ওই দেখা যায় বজরার মাস্তুল!'

সত্যসত্যই দেবীর সুসজ্জিত মনোরম বজরাটি বাঁকের মাথায় সর্ব্বপ্রথম ভাসিয়া উঠিল। পর পর কয়টি বজরাই যখন লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল, তখনো দূর অনেক। তাহা হইলেও এতগুলি বজরার প্রত্যেকটির দশ বারো মাল্লার দাঁড়ের টান তখন স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল।

গঙ্গার তট হইতে বজরার সে সারি সারি শোভাযাত্রা বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। বাদশাহী আমোলের চালচলন যাহারা বইয়ে পড়িয়াছে, চোখে দেখে নাই, তাহারা মনে মনে সেই বইয়ের পাতার সঙ্গে খানিকটা মিলাইয়া লইল।

একটা অস্বাভাবিক আনন্দের প্রাচুর্য্যে পীতাম্বরবাবুর দরিদ্র পরিবার অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। রাখাল ত' আনন্দে জেটির উপর দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিয়াই উঠিল।

মেয়েদের ঘাটে একটা মলিন বেনারসী শাড়ী পরিয়া বরণডালা হাতে করিয়া কালীদাসী মায়ের দিকে তাকাইয়া কত কথাই না বলিতেছিল। তাহার মুখ দিয়া যেন আজ অনর্গল খই ছুটিতেছে।

আনন্দের এই প্রগল্ভ রূপ দেখিয়া গ্রামবাসীর সেই বিপুল জনতার মধ্যে কেহ বা কটাক্ষে খানিকটা বিদ্রূপ ছড়াইয়া দিল, কেহ বা একটা সুবৃহৎ শক্তির কৃপালাভের আশায় তাহাদের সঙ্গে আনন্দে যোগও দিল।

দেবীর বজরার উপর একটা স্প্রিংয়ের গদি-আঁটা সোফায় মেনকাকে কোলে লইয়া বসিয়া ছিল মাণিক।

মাণিকের পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল সশস্ত্র রঘুনন্দন তেওয়ারী। শির অবনত করিয়া সে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিল, 'রাজাবাবু, হাজারোঁ আদমী মালুম হোতা, ইয়ে হি আপকা কোঠি?'

জড়িতকণ্ঠে মাণিক উত্তর দিল, 'হ্যাঁ তেওয়ারী ওই আমার কোঠি।'

কথাটা শুনিতেই রঘুনন্দন বুকে জড়ানো চামড়ার হোল্ডার হইতে একটি একটি করিয়া কার্টিজ্ বাহির করিয়া বন্দুকে ভরিতেই মাণিক বলিল, 'কুচকাম নেই উচকো, রয়নে দেও।'

রঘুনন্দন একটু থামিয়া অবনত হইয়া বলিল, 'হুজুর তো আব্ মুলুকমে পঁহুচ গ্যায় হ্যায়। খানদানী শহরৎকে লিয়ে বন্দুককা আওয়াজ তো জরুর করনা চাহিয়ে।'

তোপের শব্দের সঙ্গে মালিকের মানের আওয়াজ যতটুকু বাড়ে তাহার অংশ তেওয়ারীরও না আছে এমন নয়।

মাণিক বুঝিতে পারিল ক্ষত্রবীর রঘুনন্দনের স্ফীতবক্ষ যেন কিঞ্চিৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। রঘুনন্দন মনে মনে ক্ষুণ্ণ ত' হইয়াছেই, হয়ত বেচারী তাহার রাণীমাতার খানদানী বজায়কল্পে উপর্য্যুপরি গুটিকয়েক শব্দ করিয়া তোপধ্বনি না করা পর্য্যন্ত মনে মনে ছটফটই করিবে।

রঘুনন্দনের মানসিক অবস্থাটা মাণিক বুঝিতে পারিয়া অনুমতি দিল। এই সব নাটকীয় অনুষ্ঠান মাণিকের ভাল লাগে না, বিশেষ করিয়া এই ক্ষেত্রে যেন লজ্জাটা আরও বেশী। কিন্তু উপায় নাই! ধন সম্পদের সংস্পর্শে থাকিলে তাহার উত্তাপটাও সহ্য করিতে হইবে।

অনুমতি লাভ করিয়া রঘুনন্দন বুক ফুলাইয়া ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ করিতে শুরু করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই মাণিক দেখিতে পাইল নবনির্ম্মিত জেটির উপর কতকগুলি বালক বালিকার নৃত্য। তাহার সঙ্গে তাহার ছোট ভাই রাখালকেও দেখিতে পাইল।

দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যখন ক্রমশঃ মন্থর হইয়া আসিল তখন মাণিক মেনকাকে কোলে লইয়াই ছাত হইতে নীচে নামিয়া আসিল।

মাণিককে ইসারায় কাছে ডাকিয়া দেবী বলিল, 'ওগো এযে অনেক লোক তোমাদের ঘাটে! ওদের সামনে আমি হেঁটে যেতে পারবো না।'

'তাই ত' এখন কি করা যায় বল ত'? আগে জানলে না হয় ওদের বলে পাঠাতাম, তোমরা এসো না, আমার রাণী লজ্জা পাবে।'

'না ঠাট্টার কথা নয়, লজ্জা ত' পাবেই। ওঁরা কি ভাববে বলতো? হয়ত বা ভাববে ওদের দেখাতেই আমি এত সব আড়ম্বর ক'রে এসেছি।'

'তা ভাববে না। এত আড়ম্বরের মধ্য হতে যখন নিরাড়ম্বরা নিরুপমা বধূটি বেরিয়ে আসবে তখনই মানুষের ভুল ভেঙ্গে যাবে।'

'ভাঙ্গুক বা না ভাঙ্গুক, অত হাজার হাজার লোকের সামনে সঙের মত এ মুখ বের ক'রে দেখাতে আমি পারবো না! লজ্জায় মরে যাবো যে!'

মাণিক হাসিয়া বলিল, 'আমরা গরীব হ'লেও আমাদের দেশ গরীব নয় দেবী। পাল্কী নিশ্চয়ই তৈরী আছে।'

দেবী বলিল, 'কি ক'রে বুঝবো, আমি ত' ভেবেছিলাম শুধু তোমার বাড়ির লোকই ঘাটে আসবে, তাই পায়ে হেঁটেই শ্বশুরঘরে গিয়ে উঠ্‌বো।'

'কিন্তু তুমি যে শুধুমাত্র বৌ নও, তুমি দেবীরাণী, যার এত নামডাক! তাতে আবার গ্রামটারও নূতন মালিক। তাই গ্রামের লোক ত' এসেইছে, আশেপাশের গ্রাম হতেও বহুলোক এসেছে তোমায় দেখতে!'

দেবী নিঃশব্দে ঘাটের দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতেছিল। মাণিক লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'কি গো, বড়ই ভাবনায় পড়ে গেলে নাকি?'

'তাই বটে, ভাব্‌চি রাণী হওয়া যেমন বিড়ম্বনা, বৌ হওয়াও কম বিড়ম্বনা নয়।'

'তুমি বৌ, রাণী, দুটোই বটে, কাজেই তোমার বিড়ম্বনা আরও বেশী।'

ঘাটের উপরেই বাড়ি, সুতরাং বধূকে বরণ করিয়া লইবার জন্য তাহার শাশুড়ী ননদ দেশের চলন মতই ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জেটি ঘেঁষিয়া দেবীর বজরা আসিয়া ভিড়িতেই পীতাম্বরবাবু গিয়া বজরায় উঠিলেন। অন্য বজরাগুলি পার ঘেঁষিয়া ফাঁকে ফাঁকে নোঙর ফেলিয়া দিল। শুধুমাত্র জাহ্নবীদেবীর বজরাটার সঙ্গে সিঁড়ি ফেলিয়া দিয়া দেবীর বজরার সঙ্গে এক করিয়া দেওয়া হইল।

দেবীরাণীর ঐশ্বর্য্যের কথা গ্রামবাসীদের কাহারও অবিদিত ছিল না; কিন্তু তাহার একটা বিরাট রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকে হতভম্ব হইয়া পড়িল। তাহাদের ভূতপূর্ব্ব জমিদার গাণেশ রায়ের সঙ্গে অনেকে তুলনা করিতে গিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

পীতাম্বরবাবু মাণিককে সঙ্গে করিয়া সর্ব্বপ্রথম জাহ্নবীদেবীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার পদধূলি নিলেন।

জাহ্নবীদেবীর পদধূলি দানে তাঁহার দরিদ্রভিটা আজ চরিতার্থ হইল, তাঁহার জীবন আজ ধন্য হইল……ইত্যাদি নানা তুষ্টবাক্যে বিনয় নম্রতা যা-কিছু পীতাম্বরবাবু গলবস্ত্র হইয়া জাহ্নবীদেবীর চরণতলে ঢালিয়া দিলেন।

অবশেষে পুত্রবধূকে ঘরে তুলিয়া লইবার জন্য জাহ্নবীদেবীর অনুমতি পাইয়া পীতাম্বরবাবু স্ত্রী-কন্যাকে ডাকিয়া লইয়া দেবীর বজরায় গিয়া উঠিলেন।

স্বামীর ভিটায় পা দিয়া দেবী তাহার পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া সে যে আজ শুধুমাত্র এই ঘরের বৌ এ অনভ্যস্ত ধারণাটা যে এত শীঘ্র কি করিয়া সে আয়ত্ত করিয়া লইল, এ-কথাটা তাহার শ্বশুর শাশুড়ী অবাক হইয়া গেলেও তাহার স্বামী বিন্দুমাত্রও বিস্মিত হয় নাই।

ছোট ঘরটায় বেশী লোকও ধরে না। যাহা ধরে তাহাও বড় একটা কেহ সাহস করিয়া কাছে আসিতে চায় না। সকলেই যেন একটু দূরে দূরেই থাকিতে চায়। শুধু বড় আটচালা ঘরটা হইতে যে মেয়েটি তাহাকে টানিতে টানিতে এই ঘরে লইয়া আসিয়াছে, তাহার পানেই দেবী কতক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তুমি কে আমি বলতে পারি।'

মেয়েটিও তেমনি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল, 'কে বলো ত' ?'

'তুমি আমার সতীন।'

'দূর মুখপুড়ী, আমি তোর সতীন হতে যাবো কেন লা! আমি তোমার সোয়ামীর বোন-গো, তোমার ননদ!'

দেবী জিব্ কাটিয়া একটা মহাঅপ্রস্তুতের ভাব করিয়া বলিল, 'তাই নাকি! তুমি আমার সোয়ামীর বোন, আমার ননদিনী? আমি ত' ভেবেছিলাম সত্যি বুঝি তাই। তা যখন নও তখন তোমার সঙ্গে আমার ভাব করতে আপত্তি নেই। কিন্তু তোমাকে ভাই কি বলে ডাকবো বলো?'

'কেন দাসী, সবাই যা বলে ডাকে।'

'দাসী! কার দাসী গো?'

'ধেৎ, আবার! তুমি ভারী দুষ্টু মেয়ে!'

'আমি দুষ্টু?'

'নয়? কোথায় বৌ হয়ে এসেছো, চুপচাপ ঘোমটাটি টেনে এককোণে পড়ে থাকবে, তা নয়, মুখ দিয়ে যেন খই ছুটছে! — ওরে রাখাল পালাচ্ছিস কেন?'

দেবী বলিল, 'ওটি বুঝি তোমার ভাই? ভারী লাজুক ত'? বার বার উঁকি মেরে যাচ্ছে, কাছে আসবার সখ আছে, তবু আসছে না। কেন বল তো?'

কালীদাসী ছুটিয়া গিয়া রাখালকে ধরিয়া লইয়া আসিয়া বলিল, 'নে পায়ের ধূলো নে। হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখছিস কি, প্রণাম কর। ভয় কিরে, রাণী আছে ত' ওদের দেশে, আমাদের বৌদি!'

'সত্যি ত', এসো ভাই। তোমাদের দেশে আমি শুধু তোমাদের বৌদি।'

রাখাল পায়ের ধূলা লইতেই রমেন আসিয়া বলিল, 'এই যে রাণী বৌদি!'

দেবী একটু ঘোমটা টানিয়া লইয়া বলিল, 'মুখটা যেন চেনা চেনা লাগে!'

রমেন বলিল, 'লাগবারই ত' কথা। দাদার বিয়ের সময় দেবরের অত্যাচারটুকু যদি না ভুলে থাকো, তা হ'লে এ মুখটাও ভোলবার কথা নয়।'

'আমি ভুলিওনি, তাই এসেছি। তোমরা ভুলেছো, তাই একটা চিঠি দিয়েও জিজ্ঞাসা করো না!'

'আমরা অল্প জলে ভেসে বেড়াই বৌদি, তাই রাণীর দরবারে চিঠিবাজি করতে সাহস হয় না!'

দেবী বলিয়া উঠিল, 'ওঃ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি তোমার দাদারই ভাই। তাই তোমাদের সঙ্গে আমার বনবেও না। যার সঙ্গে বনবে সে আমার এই কোন্দুলে ননদটি! কিন্তু তোমার গিন্নীটি কোথায়?'

রমেন বলিল, 'ওই ত বৌদি, সত্যি কথা যদি বলি, তা হ'লে ত আবার তুমি রেগে যাবে!'

দেবী বলিল, 'মহারাণী শ্রীলশ্রীযুক্তা দেবীরাণীর কাছে আসতে সে সাহস পায় না! এই ত' বলতে চাও? ঠাকুরপো এমনি ক'রে যদি তোমরা আমায় অপমান করতে সুরু ক'রে দাও, তা হ'লে আজকেই আমি তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।'

রমেন দেবীর পদস্পর্শ করিয়া বলিল, 'আর বলবো না বৌদি। দাসীকে বলো তোমার দেবরের কালো কুৎসিত বৌটিকে এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আসবে। তবে সে এলে হয়!'

'কেন আমি কি বাঘ যে গিলে ফেলবো তোমার বৌটিকে?'

বলিয়া সে দাসীকে বলিল, 'চলো ভাই, আমার ছোট বোনটি কোথায় লুকিয়ে আছে খুঁজে নিয়ে আসি।'

দাসী দেবীকে সঙ্গে করিয়া এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া রমেনের শয়নের ঘরে গিয়া রমেনের বৌকে আবিষ্কার করিল।

রমেনের কথা একেবারে মিথ্যা নয়। দেবীর সঙ্গে বৌটির পার্থক্য সব দিক দিয়া। না আছে তাহার রূপ, না আছে দেবীর মত ধন দৌলত। অথচ দুই ভাইয়ের দুটি বৌ! তাই বুঝি রমেনের স্ত্রী নন্দা নিজের দৈন্য দেবীর চক্ষুর অন্তরালে ঢাকা দিয়া দুইটি দিন আত্মগোপন করিয়া কোন মতে কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু নাছোড়বান্দা মেয়ে দেবী তাহাকে টানিয়া বাহির করিল।

বলিল, 'কি গো অত দেমাক কেন? পায়ের ধূলোটা নাও, সম্পর্কে ত' তোমার ছোট নই! বয়সেও বড়!'

জোর করিয়া একটা প্রণাম আদায় করিয়া লইয়া দেবী নন্দার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'দু'দিনের জন্য এসেছি বোন তোমাদের মুখ দেখতে,

তাও যদি তোমরা পালিয়ে বেড়াও ত' জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে।

দেবীকে সমর্থন করিয়া দাসী বলিল, 'লজ্জাও নেই বৌটার! দিনে দুকুরে পালাবার আর জায়গা পেলে না। বেছে বেছে ছোড়দার ঘরটাই বেছে নিয়েছে!'

দেবী বলিল, 'সত্যি তাই, চলো বড় ঘরে।'

বড় ঘরে আসিয়া দেবী দাসীকে বলিল, 'কৈ তোমার দাদাকে ত' দেখছি না ভাই।'

দাসী বলিল, দাদাকে বুঝি এমনি ক'রে গোলাম ক'রে রেখেছো রাণীবৌদি, যে দু'দণ্ড দেখতে না পেলেই অস্থির হয়ে যাও! দু'দিন দাদার তত্ত্ব না নিলেও চলবে, এমন কোন অস্থানে এসে পড়েনি।'

'সত্যি নাকি? এটা ত' আমার আগে জানা ছিল না। তুমি ত' সোজা মেয়ে নও ভাই, তুমি দেখছি দেবীকেও হার মানিয়ে দেবে। কিন্তু তোমার দাদাটি যে গোলাম হয়ে থাকার পাত্র নয় তা কি তোমার জানা নেই?'

'জানা আছে; কিন্তু শুনেছি তোমাদের দেশটা নাকি আসামের কাছে; ওখানে নাকি নারীর সংস্পর্শে পুরুষ ভেড়া বনে যায়! তাই ভরসাও বিশেষ নেই! তাতে আবার দেবীরাণীর যে জোলুস! কিন্তু এত তাগিদটাই বা কিসের?'

'আমাদের আসবার একটু পরেই তোমার ভাইপো ও ভাইঝিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে বলে দিয়েছিলাম। তোমাদের সঙ্গে পরিচয়ের পালাটা সাঙ্গ হয়ে গেলেই নিজে হাতে খোকাকে তোমার মায়ের কোলে তুলে দেব এই ছিল ইচ্ছাটা। কিন্তু ছেলেমেয়েকে নিয়ে কর্ত্তাটি এখনোও আসচেন না কেন, সেই জন্যই শুধু তাগিদ।'

দেবীর কথা শেষ হইতেই রাখাল বলিল, 'দাদা অনেকক্ষণ ধরে বাইরে বসে কত সব লোকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। ডেকে আনবো বৌদি ?'

এমনি সময় মনন ক্রন্দনরত ছেলেটিকে কোলে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার পিছনে ছিল নন্দ ঘোষের কোলে মেনকারাণী। সুতরাং রাখালের আর যাওয়ার প্রয়োজন হইল না।

রাখালের মা সেই যে বৌকে প্রথম আশীর্ব্বাদ করিয়া গুটিকয়েক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িয়াছেন, তাহার পর আর তাঁহার দেখা নাই ! কাজের অজুহাতে এ-ঘর ও-ঘর ছুটাছুটি করিতে দেখা গেলেও, দেবীর কাছে তিনি বড় একটা ঘেঁষিতে চাহিতেছেন না। মননের আগে আগে পীতম্বরবাবুও বুঝি ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতেছেন।

ভাঁড়ার ঘরের ভিতর হইতে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া পীতম্বরবাবু সেই দিকে পা বাড়াইলেন। গৃহিণী তখন চালডালের বরাদ্দ লইয়া শহর হইতে নবাগত ঠাকুরের সঙ্গে একটা হিসাব ঠিক করিতেছিলেন।

পীতাম্বরবাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'বেশ মানুষ যাহোক। তুমি এখানে পালিয়ে আছো, বৌমা কি ভাব্‌বে বলতো ?'

গৃহিণী বলিলেন, 'কি আর ভাববে বলো ? ছেলেমেয়েরা হাসিতামাসা করছে, তাই ইচ্ছে করেই পালিয়ে এসেছি। তা ছাড়া এ ত' রমেনের বৌ নয় যে গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কথা বলতে আটকায় না। এখানে কি বলতে কি বলে ফেলবো সেই হয়েছে আমার ভাবনা ! বড় লোকের মেয়ে, তাতে আবার বৌটি তোমার যেমন চোখে মুখে কথা কয়, ভয় হয় কখন কোন বেফাস্‌ কথা ব'লে ফেলি ! জানো ত' আমার বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু কম। কি করি বলো,—বাবো ?'

পীতাম্বরবাবু আপনমনেই হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আচ্ছা পাগল ত'! বুদ্ধি কমের লক্ষণটা যেন তোমার আজকেই কিছু বেশী দেখ্‌ছি। আবার জিজ্ঞাসা করচো, যাবে কি না? ভয়টা কিসের বলতে পারো?'

গৃহিণী অপ্রস্তত হইয়া বলিল, 'তা বলতে পারি না, তবে আর একটু হ'লে তোমার বৌকে তুমি বলতে গিয়ে আপনিই বলে ফেলেছিলাম।

'ছি ছি বলো কি! তুমি দেখছি মুখ হাসাবে! ওই বুঝি রাখাল ডাকতে এসেছে।'

রাখাল আসিয়া বলিল, 'শিগ্‌গীর মা শিগ্‌গীর এসো। রাণী বৌঠান্ তলব করেছেন। জহরের মুখ দেখবে ত' চলো।'

পীতাম্বরবাবু পকেট হইতে জহরের জন্য একটি সোনার আধুলি ও মেনকার জন্য একটি সিকার মোহর স্ত্রীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, 'নাও শিগ্‌গীর যাও, দেরী কোরো না।'

রাখালের মা ঘোমটাটি টানিয়া দিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ জড়সড় হইয়া রাখালের হাত ধরিয়া গিয়া বড় ঘরে প্রবেশ করিলেন।

দেবী আসিয়া জহরকে শাশুড়ীর কোলে তুলিয়া দিয়া মেনকাকেও তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল।

মাণিকের মা যথারীতি স্বামীর নির্দ্দেশমত মুখদর্শনী নাতি ও নাতিনীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দেবী শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, 'এই সঙ্গে ছেলের মাকেও একবার আশীর্ব্বাদ করুন মা!'

শাশুড়ী নিঃশব্দে তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি অতি সঙ্কোচে দেবীর মস্তকে তুলিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদের বাক্যটি বোধকরি মনে মনেই উচ্চারণ করিলেন।

তাঁহার এই জড়ীভূত ভাবটি লক্ষ্য করিয়া চটুলা কন্যা তখন একটি হাস্যকর কাণ্ড করিয়া বসিল।

কালীদাসী আগাইয়া আসিয়া দেবীর ঘোমটাটি আরও খানিকটা টানিয়া দিয়াই কোমরে হাত দিয়া কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি জোড়া ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিয়া, অভিনয়ের এমন একটি মৌনভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল যে, একই সঙ্গে সকলেই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল!

দাসীর রহস্য বুঝিতে না পারিয়া দেবী বলিল, 'মানে?'

'মানে বুঝলে না? দেখচো না তোমার শাশুড়ীর লজ্জাটা! তাঁর ঘোমটাটা যদি আধহাত টানা থাকে, তা হ'লে তুমি বৌ হয়ে ত' আইন লঙ্ঘন করতে পারো না। তোমরা ঘোমটাটি তা হ'লে অন্ততঃপক্ষে আরও একহাত কপালের নীচে ঝুলে পড়তে বাধ্য।'

কালীদাসীর কাণ্ড দেখিয়া সকলেই হাসিতে হাসিতে সেখানে লুটোপুটি খাইতে সুরু করিয়া দিল। কালীদাসীর মার অবস্থা তখন আরও সঙ্গীন্। শুধু মাত্র তুইটি চক্ষু ঘুরাইয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, 'বেয়াদপ্ মেয়ে!'

নিজের মাথার ঘোমটাটি সরাইয়া লইয়া দেবী বলিল, 'মেয়েটি মা আমার বেয়াদপ হলেও কথাটা কিন্তু মিথ্যে বলেনি। এখানে ত' এমন কেউ নেই, যাকে দেখে আপনি লজ্জা করতে পারেন। নতুন এই মেয়েটিকে দেখে যদি আপনার এতই লজ্জা হয়, তা হ'লে কিন্তু এই মুখরা মেয়েটিরও বেয়াদপি বেড়ে যাবে।'

সামান্য একটু অবগুণ্ঠন লইয়া যে এতখানি লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে, একথা মাণিকের মা ভাবিতেও পারেন নাই। সেকালের মেয়েমানুষ,—স্বভাবতঃই একটু অমার্জ্জিত অনাবশ্যক লজ্জায় মন ভীরু হইয়া উঠে; তাহার উপর ক্ষেত্রটা তাঁহাকে আরও বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। তা হউক, শেষ পর্য্যন্ত লজ্জার বাঁধন তাহার খানিকটা হাল্কা করিয়াই লইতে হইল। নহিলে পুত্রবধূ ও কন্যার চারটি সুতীক্ষ্ণ চক্ষু একত্র হইয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিবে।

ঘোমটাটি একটু খাটো করিয়া, কণ্ঠের জড়তা যথাসাধ্য চেষ্টায় দূর করিয়া মাণিকের মা বলিলেন, 'তোমার ঠাকুরমাকে এখানে তুলে আনতে ত' আমার সাহস হয় না মা! তুমি কি বলো?'

'সাহস না হলে ত' চলবে না মা। কথাই ছিল গরীবের ঘরে হাতীর পা পড়তেই হবে।'

কথাটা বলিল মাণিক। সঙ্গে সঙ্গে দেবী ঘোমটাটি একটু টানিয়া বসিল। ছোট বউ নন্দা ভাসুরের আগমনে এককোণে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই অল্পবিস্তর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হইল না শুধু কালীদাসী।'

কালীদাসী বলিল, 'সত্যিই ত', কথা থাক্ বা না থাক্, আমাদের রাণী বৌঠানের দৌলতে যখন সে সুযোগ পেয়েছি, তখন গরীবের দুয়ারে একবার হাতী বাঁধবোই, তারপর যা থাকে অদৃষ্টে! চলো সবাই মিলে বুড়ীটাকে চ্যাং-দোলা ক'রে নিয়ে আসি।'

দাসীর প্রস্তাবনায় দেবীও সায় দিয়া বলিল, 'তাই যাও। কিন্তু এখন গিয়ে ত' কোন ফল হবে না। ঠাকুরমার পুজো আহ্নিক শেষ হতে হয়ত দুপুর গড়িয়ে যাবে। তার চেয়ে এই ফাঁকে চলো ভাই তোমাদের ভোগ-রান্নার ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দেবে।'

একসঙ্গে সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিল। শুধু হইল না মাণিক।

মাণিকের মা সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি মা! তুমি যাবে হাড়ি ঠেলতে! ছি ছি, কী লজ্জার কথা! লোকে শুনলে আমাদের বলবে কি?"

এইবার মাণিক তাহার মার কথার উত্তরে বলিল, 'কিছু বললেও এর প্রতিকারের কোন উপায় নেই মা। ঠাকুরমা ওই দু'টি হাতের রান্না ছাড়া আর কারও হাতে ত' খাবেন না। কাজেই ওকেই যেতে হবে, অভ্যাসও

আছে। শুধু দেখো, ওই ছুতো ক'রে বাড়িশুদ্ধ লোকের অন্নসেদ্ধর ভারটা না নিয়ে বসেন। তোমার যে ক্ষ্যাপা বৌ, কিছু বিশ্বাস নেই!'

*

* *

মধ্যাহ্ন গড়াইয়া পড়িয়াছে।

বাড়ির ছেলেবুড়া মিলিয়া সকলেই যখন জাহ্নবীদেবীর চরণতলে আসিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িল, তখন অন্ততঃপক্ষে চক্ষুলজ্জার খাতিরেও জাহ্নবী দেবী না করিতে পারিলেন না।

এক হাত ধরিল মানিক আর এক হাত ধরিল কালীদাসী। সোনায় বাঁধা মোটা পাথরের চশমাটি পরিয়া অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া দুইজনের কাঁধে ভর দিয়া জাহ্নবী দেবী বজরা হইতে পাল্কীতে গিয়া উঠিলেন।

রূপার একটি বড় ডাবর ও রূপার ছোট্ট আলবোলাটি সমেত একটি ছোট ঝুড়িভর্তি হাঁপানির ওষুধপত্র হাতে করিয়া মদন ও রাখাল তাহাদের পিছনে পিছনে চলিল।

বাড়ির দরজায় পাল্কী আসিয়া থামিতেই [illegible] আড়ালে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেই দেবী আগাইয়া আসিয়া পাল্কীর দরজা খুলিয়া দিল। জাহ্নবীদেবীকে দেখিয়াই একগাল হাসিয়া ফেলিয়া দেবী ঠাকুরমার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বড় ঘরের দিকে লইয়া চলিল।

বড় ঘরের মধ্যস্থলে সুন্দর ছোট একটু ফরাসের উপর তাকিয়া স্থাপন করিয়া জাহ্নবীদেবীর জন্য বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেবী অঞ্চল দিয়া পিতামহীর পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া তাকিয়ার সম্মুখে তাঁহাকে বসাইয়া দিল। দেবীর চোখের ইঙ্গিতে মাণিক আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইতেই

দুইজনে একসঙ্গে গলবস্ত্র হইয়া জাহ্নবীদেবীকে প্রণাম করিল। বিনিময়ে জাহ্নবীদেবী তাহাদের শুধু হাত বাড়াইয়া আশীর্ব্বাদই করিলেন না, দুইজনকে একসঙ্গে টানিয়া লইয়া কোলে তুলিয়া বসাইলেন।

দর্শকের ভিড় সেখানে কম ছিল না। বাড়ির লোক ত' আছেই, তা ছাড়া গ্রামের মেয়েছেলেতে মিলিয়া ঘরটি পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের জানালার শিক্ ধরিয়া স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া ঝুলিয়া আছে যত সব গ্রাম্য বালক-বালিকা। সকলেই অভিনিবেশ সহকারে অভিজাত এই বিচিত্র চালচলন লক্ষ্য করিতেছিল।

এইবার অনেকের পক্ষেই হাস্যসম্বরণ করাটা কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া উঠিল। পরিণত বয়সের নাতজামাই ও নাতনী কোলে করিয়া বসিয়া বৃদ্ধাটি যে দৃশ্যের সৃষ্টি করিলেন, তাহা গ্রাম্য সহৃদয়তার আরও বেশী করিয়া উপভোগ্য হইয়া উঠিল। দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্যের নানা গঞ্জনায় পীড়িত দর্শকশ্রেণীর করুণদৃষ্টিতে, সোহাগ ও আহ্লাদের এমন অনাবিল রূপ সচারচর চোখে পড়ে না। তাই যাহাদের সুখের সীমা নাই, তাহাদের সামান্যই ইহাদের চোখে অসামান্য হইয়া ফুটিয়া উঠে। হাস্যমুখরিত তাহাদের অস্ফুটগুঞ্জনধ্বনি মাণিকের কানে গিয়া পৌছিতেই মাণিক কোল হইতে উঠিয়া বসিল। দেবীও সেই পথই অনুসরণ করিল।

অদূরে দাঁড়াইয়া নন্দার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া পাশের বাড়ির যে বধূটি দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার চাপাকণ্ঠ আর কেহ শুনিতে না পাইলেও নন্দা শুনিতে পাইল।

বধূটি বলিতেছিল, 'কি গো সই, ভাসুরের স্ত্রীটির ভাগ্য দেখে হিংসে হচ্ছে বুঝি ?'

'ছিঃ তা কেন হবে ?'

আছে। শুধু দেখো, ওই ছুতো ক'রে বাড়িশুদ্ধ লোকের অন্নসেদ্ধর ভারটা না নিয়ে বসেন। তোমার যে ক্ষ্যাপা বৌ, কিছু বিশ্বাস নেই!'

*

* *

মধ্যাহ্ন গড়াইয়া পড়িয়াছে।

বাড়ির ছেলেবুড়া মিলিয়া সকলেই যখন জাহ্নবীদেবীর চরণতলে আসিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িল, তখন অন্ততঃপক্ষে চক্ষুলজ্জার খাতিরেও জাহ্নবী দেবী না করিতে পারিলেন না।

এক হাত ধরিল মানিক আর এক হাত ধরিল কালীদাসী। সোনায় বাঁধা মোটা পাথরের চশমাটি পরিয়া অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া দুইজনের কাঁধে ভর দিয়া জাহ্নবী দেবী বজরা হইতে পাল্কীতে গিয়া উঠিলেন।

রূপার একটি বড় ডাবর ও রূপার ছোট্ট আলবোলাটি সমেত একটি ছোট ঝুড়িভর্তি হাঁপানির ওষুধপত্র হাতে করিয়া মদন ও রাখাল তাহাদের পিছনে পিছনে চলিল।

বাড়ির দরজায় পাল্কী আসিয়া থামিতেই পাইকবরকন্দাজ আড়ালে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেই দেবী আগাইয়া আসিয়া পাল্কীর দরজা খুলিয়া দিল। জাহ্নবীদেবীকে দেখিয়াই একগাল হাসিয়া ফেলিয়া দেবী ঠাকুরমার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বড় ঘরের দিকে লইয়া চলিল।

বড় ঘরের মধ্যস্থলে সুন্দর ছোট একটু ফরাসের উপর তাকিয়া স্থাপন করিয়া জাহ্নবীদেবীর জন্য বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেবী অঞ্চল দিয়া পিতামহীর পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া তাকিয়ার সম্মুখে তাঁহাকে বসাইয়া দিল। দেবীর চোখের ইঙ্গিতে মাণিক আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইতেই

দুইজনে একসঙ্গে গলবস্ত্র হইয়া জাহ্নবীদেবীকে প্রণাম করিল। বিনিময়ে জাহ্নবীদেবী তাহাদের শুধু হাত বাড়াইয়া আশীর্ব্বাদই করিলেন না, দুইজনকে একসঙ্গে টানিয়া লইয়া কোলে তুলিয়া বসাইলেন।

দর্শকের ভিড় সেখানে কম ছিল না। বাড়ির লোক ত' আছেই, তা ছাড়া গ্রামের মেয়েছেলেতে মিলিয়া ঘরটি পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের জানালার শিক্ ধরিয়া স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া ঝুলিয়া আছে যত সব গ্রাম্য বালক-বালিকা। সকলেই অভিনিবেশ সহকারে অভিজাত এই বিচিত্র চালচলন লক্ষ্য করিতেছিল।

এইবার অনেকের পক্ষেই হাস্যসম্বরণ করাটা কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া উঠিল। পরিণত বয়সের নাতজামাই ও নাতনী কোলে করিয়া বসিয়া বৃদ্ধাটি যে দৃশ্যের সৃষ্টি করিলেন, তাহা গ্রাম্য সহৃদয়তার আরও বেশী করিয়া উপভোগ্য হইয়া উঠিল। দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্যের নানা গঞ্জনায় পীড়িত দর্শকশ্রেণীর করুণদৃষ্টিতে, সোহাগ ও আহ্লাদের এমন অনাবিল রূপ সচারচর চোখে পড়ে না। তাই যাহাদের সুখের সীমা নাই, তাহাদের সামান্যই ইহাদের চোখে অসামান্য হইয়া ফুটিয়া উঠে। হাস্যমুখরিত তাহাদের অস্ফুটগুঞ্জনধ্বনি মাণিকের কানে গিয়া পৌঁছিতেই মাণিক কোল হইতে উঠিয়া বসিল। দেবীও সেই পথই অনুসরণ করিল।

অদূরে দাঁড়াইয়া নন্দার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া পাশের বাড়ির যে বধূটি দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার চাপাকণ্ঠ আর কেহ শুনিতে না পাইলেও নন্দা শুনিতে পাইল।

বধূটি বলিতেছিল, 'কি গো সই, ভাসুরের স্ত্রীটির ভাগ্য দেখে হিংসে হচ্ছে বুঝি?'

'ছিঃ তা কেন হবে?'

বধূটি বলিল, 'কেন যে হবে ও সব বড় কথা কি ক'রে বুঝবো? তবে তোমার মুখের ওপর যে মনের ছাপ এসে পড়েছে এটা ভাই স্পষ্টই বোঝা যায়!'

নন্দা বলিল, 'মিথ্যে কথা, কখন তা পড়েনি পড়বেও না। ওঁর ভাগ্য নিয়ে উনি এসেছেন, আমার ভাগ্য নিয়ে আমি এসেছি,— বিধির এই বিধানটাই যে আলাদা! হিংসে করেও ত' আমি ওঁর পাশে গিয়ে বসতে পারবো না, ভাসুরের কপালটা কেটেও আমার সোয়ামীর ললাটে জোড়া দিতে পারবো না। সুতরাং ওঁদের ভাগ্য নিয়ে হিংসে ক'রে আমার লাভ?'

'লাভ ক্ষতির কথা তুই বুঝবি। আমি বুঝি একেই বলে ভাগ্য। ভাগ্যবতী তোর জা, ভাগ্যবান তোর ভাসুর, ভাগ্যবতী ওই বুড়ীটা পর্য্যন্ত!'

নন্দা তাহার কালো মুখটি আরও কালো করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আসল কথা হয়েছে, তুমি বাপু নিজে হিংসুটে, তাই আমার হিংসা জ্বালিয়ে দিতে চাস্! কিন্তু দেখচিস্ না, পেত্নীর মত এই চেহারাটার সঙ্গে ওঁর কত অমিল! দুটি সন্তানের মা হয়েছে, তবু যেন রূপ ফেটে পড়ছে। গুণের কথা আর কিই বা বলবো! টাকার জাল ফেলে এই সোনার খনিটা পর্য্যন্ত যে মুঠোর মধ্যে ধরে নিয়েছে, তার পরণে ওই আটপৌরে একটা শাড়ী, গায়ে ওই গয়না! ভাসুরের বরাত ছিল, তাই ওঁকে পেয়েছে।'

জাহ্নবীদেবী মাণিক ও দেবীকে সাধ করিয়া অল্প একটু সময়ের জন্য কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধার পক্ষে অনুষ্ঠানটি যতই আহ্লাদজনক হউক, ভারটি নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। তাই বুঝি আকস্মিক শ্রান্তিটুকু হাঁপানির দুই-একটা টান বাড়াইয়া দিল।

মাণিক রৌপ্যনির্ম্মিত ছোট্ট আলবোলাটির উপর তেমনি একটি কারু-কার্য্য খচিত রৌপ্য কল্কিতে হাঁপানির চূর্ণ ফেলিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দিল। জাহ্নবীদেবী নলটি মুখে দিয়া টানিতে সুরু করিয়া দিলেন।

বস্তুটি অম্বুরিজাতীয় তাম্রকূটও নয়, কিম্বা বিলাসিতার একটা উৎকৃষ্ট উপকরণও নয়; কিন্তু ঔষধ-সেবনের মজলিসী আড়ম্বরটুকু দেখিয়া নন্দার সখীর দুইটি চক্ষু বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল!

বধূটি নন্দার কাছে মুখ লইয়া বলিয়া উঠিল, 'ওরে নন্দা, বুড়ীটা দেখছি আবার তামাকও খায়! বড়লোকদের মধ্যে অনেক আজগুবী শুনেছি বটে, কিন্তু মেয়েরা তামাক খায় এ ত' কোনোদিন শুনিনি!

নন্দা হাসিয়া বলিল, 'দূর বোকা মেয়ে, তামাক কেন হবে, ওটা যে হাঁপানির ওষুধ!'

'ওষুধ! আবার হাঁপানিও আছে নাকি? ওটাও বুঝি বড়লোকদেরই হয়? নইলে অমন রূপোয় বাঁধা আলবোলার নল মুখে দিয়ে এমন ওষুধ ত' ভাই গরীবে খেতে পারে না।'

নন্দা তখন বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিল, 'আসল কথাটা হয়েছে কি জানিস, এত বড় ঘরের কাণ্ডকারখানা কখনো কল্পনা করা দূরে থাক চোখেও দেখিসনি। তাই তোর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে!'

কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর ভাজিয়া লইয়া বধূটি বলিল, 'তুই বুঝি দেখেছিস্?'

'আমি না দেখলেও শুনেছি, ওঁদের কথাই শুনেছি। কিন্তু তুমি বাপু মেয়ে ত' কম নও, বড়লোক বলে কি অসুখও হবে না, ওষুধও খাবে না?'

'তাই বল্ অসুখ হয়েছে!'

নন্দা এইবার রাগ করিয়াই বলিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ হয়েছে!'

'তুমি রাগই করো বাপু আর যাই করো, না বলে থাকতে পারছিনে। বুড়ীর ওই নধরকান্তি দেহটা দেখে কেউ বলবে না ওর অসুখ করেছে।

বয়সটা মনে হচ্ছে একশ বছরের কম হবে না! কিন্তু এখনো কেমন পাকা মর্ত্তমান কলার মত গায়ের রঙ! গায়ের চামড়াগুলো পর্য্যন্ত এতটুকু টিলে হয়নি। চোখে ছানি পড়বার নাম ক'রে ওই সোনার চশমা পরাটাও যেমন ওদের সখ, হাঁপানির নামে গুড়গুড়ির নলে তামাক খাওয়াটাও ওদের তেমনি একটা বড়লোকী ফ্যাশান।'

মেয়েটির অবিশ্রাম বকুনির মধ্যে যে জ্বালা ছিল, তার মূলে ছিল যথার্থ অনভিজ্ঞতা! নন্দা ঠিকই বলিয়াছে। এত বড় ঘরের কাণ্ডকারখানা যাহারা কল্পনাও করিতে পারে না, তাহারা চোখে দেখিলে মূর্চ্ছা না গেলেও অন্ততঃ তাহাদের পক্ষে ইহাদের সব কিছুই তাজ্জবের ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে।

নন্দা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'তুই এখানে দাঁড়িয়ে যত পারিস বক্ বক্ কর। আমি চললাম। বাড়ি গিয়ে দুধ ঘি মাখন যত কিছু রাজভোগের বরাদ্দ ক'রে নিস, তবে তোরও অমনি চেহারা হবে। কিন্তু তা তো জুটবে না, জুটবে শুধু শাকচর্চ্চরি আর মোটা ভাত। তাই খেয়ে শুঁটকী হয়ে মুখ সেলাই ক'রে পড়ে থাক্‌গে যা।

বলিয়া নন্দা সত্য সত্যই একটু দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

বধূটির মুখের চেহারা তখন দেখিবার মত সময় ছিল না। জাহ্নবীদেবীকে হাত ধরিয়া দেবী তখন আহারের জন্য ভোগঘরের দিকে পা বাড়াইয়াছে। সুকুলেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে তখন সেই দিকে।

দেবীর নিজের বেশভূষার দিকে পারিপাট্যের যতই অভাব থাকুক; পিতামহীর মানসম্ভ্রম যাহাতে একচুলও এদিক ওদিক না হয়, সে জন্য তাহার মোটেই অমনোযোগীতা ছিল না।

দেশের বাড়িতেও জাহ্নবীদেবী প্রত্যহ সোনার থালে যে আহার করেন না, ইহা দেবীও যেমন জানে জাহ্নবীদেবীও তেমনি জানেন। কিন্তু

অদ্যকার ক্ষেত্রটি কুটুম্বিয়ানা চালচলনের সঙ্গে রাজসিকতার যেটুকু পাল্লা চলিয়াছে, তাহার প্রয়োজন দেবীর ব্যক্তিগত ভাবে না থাকিলেও তাহার পিতামহীর জন্য আছে। কিন্তু এই সোনার খনিতেও সোনার থালা দুর্লভ। তাই তাহার গরীব শ্বশুর ঘর হইতে তাহার পিতামহীর যোগ্য আতিয়থেতার সাজসরঞ্জাম যাহা একান্তই দুষ্প্রাপ্য, দেবী নিজের তোশাখানা খাজাঞ্চীখানা খুলিয়া সে সব জিনিষ বাহির করিয়া সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছে।

নিজের হাতে স্বযত্নে প্রস্তুত রন্ধন সামগ্রী পরিপাটিরূপে সোনার থালে সোনার বাটিতে সাজাইয়া দেবী ঠাকুরমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'নাও, আরম্ভ করো ঠাকু'মা; কিন্তু গরীবের আয়োজন অতি সামান্যই। তা হোক্, তাচ্ছিল্য করতে পাবে না। যদি করো, তা হ'লে আর লক্ষ্মীপুরে ফিরে যেতে দেবো না। দেবীরাণীর নূতন জমিদারীতে আটক ক'রে রাখবো। বুঝলে? তাই বুঝে ওই ঘিয়োর, মিহিদানা, চন্দ্রপুলি, কচুরী, নিম্‌কি হ'তে আরম্ভ ক'রে উচ্ছের চর্চ্চরি, ওক্‌ড়াসেদ্ধ, ঝিঙ্গে সেদ্ধ, বরবটি ভাজা, করলা ভাজা, পুইশাঁকটি পর্য্যন্ত ফেলতে পাবে না।'

জাহ্নবীদেবী পৌত্রীর উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনায় তুষ্ট হইয়া প্রচুর হাসি দিয়া মুখটা আরও উজ্জ্বল করিয়া লইয়া উপবিষ্টা দেবীর শাশুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'শুনলে মা? তোমার বৌটির গরীবানা খাবারের ফর্দ্দটুকু শুনলে? এমনি দিনরাত বসে বসে রঙ্গরসের ফর্দ্দ শুনতে শুনতে আমি হয়রান হয়ে পড়েছি। আর খালি এটি নয়, যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আমার ওই কার্ত্তিকটি গো, দু'জনে একজোট্ হয়ে সমানে সুরু ক'রে দেন। বলো ত' মা এমনি করলে আমি বাঁচি কি করে'?

দেবীর শাশুড়ী একবার দেবীর পানে একবার নিজের পুত্রের দিকে আহ্লাদে গদ গদ হইয়া নিঃশব্দে চাহিয়া লইয়া আবার তেমনি করিয়াই তিনি পাখা করিতে লাগিলেন।

এমনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত কথায় বার্ত্তায় নিরহঙ্কারী চালচলনে সদাহাস্যময়ী দেবীর ব্যবহারে শুধুমাত্র মাণিকের বাপ-মা ভাই-বোন নয়, গ্রামের ঘরে ঘরে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, দেবী যথার্থই দেবী!

মাত্র দুইদিন হইয়াছে দেবী আসিয়াছে। আসিতে না আসিতেই বিদায়ের পালা সুরু হইয়াছে। ত্রিরাত্রি স্বামীগৃহে বাস করিয়া চতুর্থদিনে দেবী চোদ্দরশি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে আবার লক্ষ্মীপুরে। বিচ্ছেদের সে ঘনীভূত দুর্য্যোগ যখন ক্রমশঃ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন দাসীর মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে সব চেয়ে বেশী।

দাসীর উদ্বেলিত চিত্তের সে সাড়া দেবীর মনেও আসিয়া পৌছিয়াছে। একান্তে বসিয়া আজ দুইটি মেয়ে সেই দুঃখের আলাপই জুড়িয়া দিয়াছে। সুমুখে বসিয়া আছে আর একটি মেয়ে। সেও এই বাড়িরই বধূ।

দেবী বলিতেছে, 'আগে জানলে আসতুম না। আর দুটো দিনও নেই, তারপরই তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে; কিন্তু ছেড়ে যেতে যে এত কষ্ট হবে এ কথাটা আমি আগে এমন ক'রে ভাবতে পারিনি দাসী!'

দুইটি নারীর বুদ্ধির দীপ্তি, ধারালো কথার সে প্রস্রবণ হঠাৎ যেন বৃহৎ উপলখণ্ডে আছাড় খাইয়া মধ্য পথে থামিয়া পড়িতে চায়। সে প্রগল্ভরূপ একটা শান্ত বিষন্ন প্রচ্ছায়ায় ঘিরিয়া একটা কাতর কান্না যেন চাপা হইয়া ফুলিয়া উঠিতে চায়।

দাসী বলিল, 'তোমার কষ্ট হবে রাণী বৌদি? সত্যি কষ্ট হবে? কিন্তু তুমি ত' ভুলে যাবে ভাই। ঐশ্বর্য্যের ঝলমলানো রূপ তোমায় অষ্টপ্রহর ঘিরে থাকে। দু'দিনের মোহ তোমার তারই আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি যেদিন সরে পড়বে তুমি টেরও পাবে না।'

একটু থামিয়া দাসী আবার বলিল, 'কিন্তু রাণীবৌ তুমি সত্যি কেন এসেছিলে? দূরে ছিলে বেশ ত' ছিলে। শুধু তোমার নামের পূজোই করেছি; কিন্তু দেবীকে কাছে পেয়ে যে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না ভাই। আমাদের দুঃখ কষ্ট মোটা ভাত মোটা কাপড়ের মধ্যে দেবী মূর্ত্তি যে অহরহ ভেসে উঠবে, তাকে ঢাকা দেবো কি দিয়ে রাণী?'

অন্তরের অন্তস্থল বুঝি মন্থন করিয়া দাসীর মুখ দিয়া যে বেদনা ক্ষরিত হইয়া ঝরিয়া পড়িল, তাহার সঙ্গে দেবীর হৃদয়ের যোগাযোগটাও হইয়াছিল খুবই নিবিড়। তাই দেবীর মনেও তেমনি ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

দেবী বলিল, 'কালীদাসীর মনে কাপট্য নেই, তা জানি। তাই তাকেই শুধু বলে' ভরসা পাই যে সে বিশ্বাস করবে। বিশ্বাস যদি করো ত জানবে, ভুলে আমি তোমাদের কোনদিনই যাবো না। বিত্তবৈভবের জয়গান, তোষামুদির সংকীর্ত্তন দিবানিশি শুনতে শুনতে দেবীরাণীর অরুচি ধরে গেছে, কথাটা যদি বলি, হয়ত সত্য বলবো না। কিন্তু তবু বাপের ভিটে ছেড়ে আজ আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমাদের ঘরেই আমার স্থায়ী বনেদ গেঁথে নি। যেখানে আমি বসে আছি, ও যেন বারুদের স্তূপ। ওই স্তূপে নারীদের শুধু চলে জহরব্রত উদ্‌যাপন ক'রে প্রাণ বিসর্জ্জন করা। পুরুষের একচেটে অধিকার নাকি ভাই আমি কেড়ে নিয়েছি শুধুমাত্র অদৃষ্টের লটারী খেলায়? তাই মানুষ হয়ত মনে মনে হাসে, বিদ্রূপ করে। তাই বলি, ওঘর আমার ঘর নয়।'

দাসী বলিল, 'তবু ও ঘরেই তোমায় ফিরে যেতে হবে রাণীবৌদি।'

রাণী সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, 'দুদিনে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে গেছে খুবই, সেই তুমি, তোমার মুখেও ত' খোশামুদির কথা কর্ম শুনলাম না।'

দাসী কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল, 'রাণীবৌদি –

দাসীকে থামাইয়া দিয়া দেবী বলিল, 'আর কেন দাসী, যাবার বেলায় না হয় রাণী-বৌদিটা ছেড়েই দাও। শুধু বৌদি ব'লে আমাকে একটু খুসী করো না। ও চাটুকথা মনের মানুষ যারা, তাদের মুখ দিয়ে শুনতে আমি ভালোবাসি না।'

'কিন্তু তুমি যে সত্যি রাণী। রাণীর সত্য ব্যাখ্যা যদি কিছু থাকে সে তুমি। অভিধানে কি তার অর্থ লেখে, আমি জানতে চাই না। এ আমার খোশামুদির কথা নয় বৌদি, এ আমার সত্য অনুভূতির দৃষ্টি দিয়ে বিচার ক'রে দেখা। তুমি যদি রাণী নয়, কে রাণী বলো? যাঁরা সরকারের শুধুমাত্র খেতাবটুকু নিয়ে আসর জমিয়ে রাখে, তারা? কেন বৌদি? তা কেন হবে! তোমার অগণ্য প্রজা, তোমার অগণ্য অনুগত ভক্তবৃন্দ যদি হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়ে তোমায় রাণী বলে ডাকে, তারই সম্মান বেশী? না যেহেতু সরকার আমাকে বাধ্য করেছে তোমায় রাণী বলে ডাকতে হবে, তারই সম্মান বেশী? তুমিই বলো বৌদি?'

সরলা নন্দা দুই বুদ্ধিমতী ননদ ও জা'র মাঝখানে শুধুমাত্র একটা প্রাণহীন সমাধির মত জুজু হইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু তাহার স্থাণুবৎ নিশ্চলতা ভাঙ্গিয়া গেল দেবীর এক ঝাঁকুনিতে।'

দেবী বলিল, 'কি লো ছোট-বউ ঘুমুচ্ছিস নাকি? সবাই বলে, তুইও একবার রাণীদি বলে' ডে'কে আমায় একটু খুসী কর।'

নন্দা শুধুমাত্র করুণ দৃষ্টিতে দেবীর দিকে একবার তাকাইয়া মাটির দিকে পুনরায় চক্ষু নিবদ্ধ করিল।

দাসী বলিল, 'রাণীর সত্য মর্য্যাদা তুমি রেখেছো তোমার ওই সূক্ষ্ম বিচারে, তোমার ওই শুচিনিষ্ঠা নিরাভরণা দেবী মূর্ত্তিতে! তবু বৌঠান, রাণীর চলনসই রূপটি দেখবার স্বপ্ন তুমি আমার ভেঙে দিলেও, সে নেশা

কিন্তু আমার আজও কাটেনি। হোক সে সাধ মিথ্যে; কিন্তু বহু দিনের সাধ ত', তাই মিথ্যে মায়া কাটাতে পারিনি বৌদি!'

দেবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চলো সে সাধ আমি তোমার এখনই পূরণ করবো। তোমার দাদার কাছে এ জন্য প্রতিশ্রুতিও একটা ছিল।'

কিছুক্ষণ পরেই দেবীরাণীর হুকুম মত বজরা হইতে দুইটি হাতবাক্স সমেত একটি বড় বাক্স বহন করিয়া লইয়া আসিল তিনটি খানসামা। সঙ্গে ছিল সঙ্গীনধারী বিশ্বস্ত রঘুনন্দন আর সূর্য্যবদন সিং। বহুলোকের কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়া বাক্স তিনটি যেখানে আসিয়া পৌছিল, সেখানে আর কাহারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না।

দেবর রমেন্দ্রনাথের ঘরে খিল পড়িয়া গেল। ঘরের মধ্যে রহিল শুধু দেবী দাসী ও নন্দা।

দেবী বড় বাক্সটি খুলিয়া বহু মূল্যের একটি শাড়ী পরিয়া গহনার বাক্সটি দাসীর সম্মুখে খুলিয়া দিয়া বলিল, 'নাও এইবার একটি একটি ক'রে দেবীর সমস্ত দেহ ঢেকে দাও এই জহরৎ ও সোনার পাতে। দেবীরাণীর রাণীমূর্ত্তি দেখে আমার কবিপ্রাণা ননদিনীর মন খুসী হোক্।'

হীরা চুনি পান্না খচিত এক একটী দামী দামী অলঙ্কার তুলিয়া পরাইয়া দিতে দাসীর অনভ্যস্ত হাত মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অতীব সঙ্কোচ ও সতর্ক নিষ্ঠার সঙ্গে নন্দার সহায়তায় দাসী দেবীকে ভূষিত করিয়া ফেলিল। অসামান্যা সুন্দরী দেবীর সৌন্দর্য্য এইবার যেন সহস্র দলে বিকশিত হইয়া উঠিল দুইটি নারীর একান্ত নিবিষ্ট সাধনায়।

দাসী তখন একটু দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'এইবার নয়নভরে দেখি একবার আমার সাধের মর্ত্তলোকের রাণীটিকে!'

'আমি তা হ'লে এইবার স্বর্গলোকের উর্বশীটিকে দেখতে পারি, কি বল ?'

বলিয়াই দেবী কালীদাসীর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই আর যে দুইটি হাতবাক্স ছিল, তাহার মধ্যে একটি খুলিয়া নন্দাকে ডাকিয়া বলিল, 'এসো ভাই আমরা দুই বোনে মিলে ননদটিকে সাজিয়ে দিই।'

ননদটি কিন্তু তখন সঙ্কোচে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে।

দাসী বলিল, 'সে কি বৌদি ? এ ত কথা ছিল না !'

'পরের চাল পরের কলা ব্রত করেন কাঞ্চনমালা ! আমার কিছুই নয়। আর আমার হলেই বা এত বড় রাজত্বটা আমি একলা ভোগ করবো কি করে' ? সুতরাং নাই বা থাকলো কথা।'

'কিন্তু আমায় এ সব মানাবে কেন ? লোকে দেখলে হাসবে যে !'

'হাসুক ! দাসীর দাসমশাই যে দিন আসবে, সে দিন তিনি দেখবেন এই মুখটিতে এগুলো সত্যি মানায় কি না ? আজ সে প্রতিবাদ তোলা থাক্।'

'কিন্তু বৌঠান্—'

'সব কিন্তু মনের জঞ্জালের সঙ্গে ঝেঁটিয়ে দাও দূরে। আমি শুনতে চাই না। এ তোমার রাণী-বৌদির ভালোবাসার চিহ্ন। এ গয়নার দামের চেয়ে সে চিহ্নের দাম অনেক বেশী।'

'তা বেশী। বেশ দাও তোমার চিহ্ন। মাথায় পেতে নেব, যক্ষের ধনের মত তা আগলে রাখবো।'

দেবী ও নন্দার একনিষ্ঠ যত্নে কালীদাসীর যৌবন উদ্গত সুন্দর সুডৌল দেহখানি একপ্রস্থ স্বর্ণ-অলঙ্কারে ও বানারসী শাড়ীর আবেষ্টনে ঝলমল করিয়া উঠিল।

দাসীর সজ্জা শেষ হইলে দেবী তাহার নিজের মাথার মুকুটটি দেখাইয়া বলিল, 'এইবার এই মুকুটটি আমার ননদিনীর মাথায় পরিয়ে দিলে আমার শ্রম সার্থক হতো। কি বলিস ছোট বৌ, দেব পরিয়ে?'

সে মুকুটে হীরার টুক্‌রা দিয়া মাণিকের নাম লেখা। যে মুকুট শুধু দেবীর শিরেই শোভা পায়। কিন্তু দেবী তাহাতে একটু রসের ফোড়ন দিয়া কৌতুক করিতে ছাড়িল না।

দাসী বলিল, 'মুখে তোমার এবার লাগাম দেব।'

'তা ত' দেবেই। তবু যাহোক আইবুড়ো নামটা ত' ঘুচতো। কিরে নন্দা ঠিক বলিনি?'

নন্দা হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িয়া বলিল, 'ঠিকই ত' ঘুচতোই ত'।'

দেবীকে লক্ষ্য করিয়া দাসী বলিল, 'তোমার ভাইটি আমাদের হাতের কাছে নেই, তাহ'লে বুঝিয়ে দিতাম ক'দিনে দেবীরাণীর মাস যায়। কিন্তু ওই যে আর এক সেট রয়েছে বৌদি, ওটাও বোধ করি এমনি একটা কিছু আগে হতে ভেবে সঙ্গে নিয়ে এসেছো?'

'হ্যাঁ ভাই এসো, এইবার দু'জনে মিলে আমার ছোট বোনটিকে সাজিয়ে দিই।'

নন্দা লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল।

তাহার এই বিধিদত্ত কালো রূপের উপর ওই বসনভূষণ যে কতদূর অশোভন হইবে, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া কি একটা বলিবার জন্য ছটফট করিয়া উঠিল।

বিপদে পড়িয়া নন্দার এইবার মুখ খুলিল।

বলিল, 'দিদি আমায় সত্যি মানায় না।'

নন্দার মুখের উপর তর্জ্জনী তুলিয়া ধরিয়া দেবী বলিল, 'চুপ্!'

কিন্তু নন্দার ভিতরটা যে চুপ হইতে চায় না। একটা অস্বাভাবিক আতঙ্কে সে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। আবার সে বলিল, 'কিন্তু দিদি রূপটা আমার সত্যি ভালো নয়। এ রূপ আগুনে পুড়িয়ে নিলেও তার জৌলুস খুলবে না! তোমার ... চিহ্ন আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে হুল ফুটবে। ও-যন্ত্রণা আমি সইতে পারবো না দিদি। আমায় মাপ করো।'

দেবী দাসীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'শুনলে ত'? ছোট বৌ নাকি কথা বলতে জানে না। তোমাদের এখানে মুখফাজিল ব'লে দুর্ণামটা কিনে নিয়ে হয়ে গেলাম শুধু আমিই। কিন্তু পেটে পেটে ছোটবৌ'র কত বিদ্যে, দেখছো ত'?'

নন্দা হাসিয়া কি একটা উত্তর দিতেই, দেবী তাহাকে থামাইয়া দিল শাসনের একটা মৃদু ও তীব্র ইঙ্গিতে।

নন্দার আপত্তি ভাসিয়া গেল দেবী ও দাসীর যুগ্মপ্রতিযোগিতায়। অমনি করিয়াই তাহাকেও বসনভূষণের নিবিড় আবেষ্টনে জড়াইয়া ফেলিতে হইল সর্ব্বাঙ্গ।

দেবী বলিল, 'চলো এইবার তিনজনে মিলে গুরুজনদের পায়ের ধূলো নিয়ে আসি।

চোদ্দরশিতে জাহ্নবীদেবীর শুভ পদার্পণ উপলক্ষ্যে গোটা সোনারখনি সমাজ নিমন্ত্রণের জন্য দেবী যে অনুরোধ করিয়াছে, সস্ত্রীক পীতাম্বরবাবু তাঁহারই একটা ফর্দ্দ করিতে বসিয়া গেছেন। সময়ও আর নাই। আগে কিছুই স্থির ছিল না। পুত্রবধূ হঠাৎ এমনি একটা বায়না ধরিয়া বসিতে পারে, ইহা তাঁহাদের পূর্ব্বেই ভাবা উচিৎ ছিল বটে; কিন্তু ভাবে নাই।

এই বৃহৎ অনুষ্ঠান দুইদিনের মধ্যে যেমন করিয়া হউক সম্পন্ন করিতেই হইবে। সোনারখনির সুবৃহৎ সমাজটা যতই সমৃদ্ধশালী হউক, আয়োজনের উদ্যোক্তা যাঁহারা, তাঁহারা শুধু দিবাকে রাত্রি, রাত্রিকে দিবা করিতে

পারে না। তা ছাড়া তাহারা সবই পারে। রাজার নৌকা পাহাড় দিয়া চলার যে প্রবাদটা আছে, দেবীর কার্য্যকলাপের সঙ্গে তাহার কথঞ্চিৎ মিলও আছে। তাই সময় যতই সংক্ষিপ্ত হউক, পীতাম্বরবাবুর ভয় কিছু ছিল না। ভয় না থাকিলেও একেবারে নিরুদ্বিগ্নচিত্তেও বসিয়া থাকা চলে না। রাজশক্তি পিছনে থাকিলেও তাঁহার ব্যক্তিগত দায়ীত্ব ত' একটা আছে। তাই একান্ত নিবিষ্টমনে স্বামী-স্ত্রী বসিয়া তাহারই ফন্দি প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেছে। এমনি সময়ে দেবীর পিছনে দাসী, দাসীর পিছনে নন্দা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। রূপ ও ঐশ্বর্য্যের একটা বিকীর্ণ দীপ্তি ঘরের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। দেবীর প্রতিটি পদক্ষেপে মাটির মেঝেটি পর্য্যন্ত যেন লজ্জায় একান্তে সরিয়া যাইতে চায়।

দেখিতে দেখিতে সেখানে ছোট একটু ভিড় জমিয়া গেল। একই সঙ্গে সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। দেবীকে দেখিয়া যতটা না বিস্মিত হইল, তাহার অনুসরণকারিণী দাসী ও নন্দার অপরূপ ও বহু মূল্যবান সাজসজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইল অনেক বেশী। নন্দার সেই সখীটি আজ গালে হাত দিয়া দৃশ্যটা আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেই নন্দার চোখে চোখ পড়িতে লজ্জায় বধূটির মাথা হেঁট হইয়া আসিল।

* *

*

লক্ষ্মীপুরের রাণীর শুভাগমন উপলক্ষে গ্রামের নূতন মালিকের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অবিরাম জনস্রোতে বিভিন্ন কলরবে একটা হাট বসিয়া গেল। গ্রামের বালক বৃদ্ধ যুবা, সধবা বিধবা কুমারী, অন্ধ খঞ্জ আতুর —

ভোজে কেহই বাদ গেল না। হুলস্থুল এই ব্যাপার মিটিয়া যাইতে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। সমাজ খাওয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল।

রাত্রি দশটায় দেবীরাণী চোদ্দরশির আত্মীয় অনাত্মীয় সকলকেই কাঁদাইয়া চোদ্দরশি ছাড়িয়া চলিল পিত্রালয়ে।

কয়দিনের জোলো হাওয়ায় জাহ্নবীদেবীর স্বাস্থ্য কিছু ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাই ঠিক হইয়াছে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত দেবী ঠাকুরমাকে লইয়া বজরাতেই যাইবে। তাহার পর মুর্শিদাবাদ হইতে বাছা বাছা দুইটি শরীররক্ষী, গুটিকয়েক খানসামা ও মাণিককে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইয়া রেলপথে দেশে ফিরিবে। বাদবাকী সব যেমন আসিয়াছে তেমনি যাইবে।

নতুন ব্যবস্থামত দেবীর পাঁচ-পাঁচটি বজরা চোদ্দরশির ঘাট ছাড়িয়া শহরের দিকে গঙ্গায় ভাসিয়া চলিল।

পশ্চাতে পড়িয়া রহিল ঘাটের নিরুৎসাহী নির্ব্বাক জনতার বিদায়কালীন একটা করুণ দৃশ্য। সারি সারি বজরা ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। রাত্রির অন্ধকারে ঘাটের উপর গুটি কয়েক আলো ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তবু দেবীর সজল-চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল বহু প্রিয়জনের বিষণ্ণ মুখের পাণ্ডুর ছায়া। সব ছায়া ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিল সব চেয়ে করুণ একজোড়া কাতর জলভরা চক্ষু। সে চক্ষু দাদার।

একুশ

দেবী শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনটি বৎসর অতীত হইয়া গেছে। এই তিন বৎসরের একটানা সুখ-ঐশ্বর্য্য ও গতানুগতিক

সাম্বৎসরিক ক্রিয়াকাণ্ড উৎসবাদির মধ্যে দেবীর আর একটি পুত্র-সন্তান জন্ম লইয়াছে। পুত্রের নাম রাখা হইয়াছে পান্নালাল।

পিতামহী জাহ্নবীদেবী বর্ত্তমানে বৎসর-খানেক হইল বার্দ্ধক্যজনিত পীড়ায় কিঞ্চিৎ অচল হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার সঙ্গে হাঁপানিটাও বোধ করি জীবনের বাকী কয়টা দিন আর বিরাম দিবে বলিয়া মনে হয় না।

পিতামহী অচল হইয়া পড়ায় দেবীর কাজ আরও বাড়িয়া গেছে। এতদিন সংসারের দিকে তাহার ভাসা ভাসা দৃষ্টি শুধুমাত্র দর্শকের কাজই করিয়া আসিয়াছে। তাহার ... দৃষ্টি রাজপ্রাসাদের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়া নিবদ্ধ ছিল ধনে-ধান্যে ভরা বিস্তীর্ণ জমীদারীর বিস্তৃতকল্পে, ছিল নব নব উদ্ভাবিত উন্নীত পরিকল্পনার সহায়তায়, কৃষক ও জনসাধারণের অভাব অভিযোগ সাধ্যমত দূর করার দিকে। তাহার ফাঁকে যে অবসরটুকু তাহার ভাগ্যে জুটিত, তাহা একান্তই অকিঞ্চিৎকর।

সেই অকিঞ্চিৎকর সময়টুকুও হেলায় নষ্ট হইতে পারিত না। বৈষয়িক জটিল তত্ত্বের কোলাহলে শ্রান্ত মস্তিষ্কের কাছ হইতে ছুটি লইয়া, ক্লান্ত জীবনটা তখন ছুটিত হৃদয়ের সন্ধানে। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের এই সুনির্ম্মল সখ্যতায় দেবী হইয়া উঠিয়াছে যথার্থই দেবী! নইলে শুধুমাত্র মস্তিষ্কই যদি সর্ব্বক্রিয়ার আধার হইয়া উঠিত, তাহা হইলে হয়ত দেবীর চরিত্রে ফুটিয়া উঠিত নির্দ্দয়তা, অমানবিক কার্য্যকলাপে হয়ত ক্লেদাক্ত হইত গোটা চরিত্রটা। কিন্তু দেবীর ছুটির আসর জমিয়া উঠে অকুণ্ঠ মাধুর্য্যে! সে-আসরে সে বণ্টন করিয়া দেয় অনাবিল হাস্যছটা। তরল রহস্যালাপে প্রসন্ন হইয়া শ্রমক্লিষ্ট দিবস নগদ পুরস্কার লাভ করিয়া বিদায় গ্রহণ করে।

এমনি দিনে পিতামহীর রোগশয্যার অন্তরায়তন হইতে সংসারের প্রতি যেটুকু দৃষ্টি আসিয়া পড়ে, তাহা প্রচুর নয়। লক্ষ্মী যে সংসারে অচলা, যে সংসারে নিত্য উৎসব, যার ছায়াতলে বহু অনাথার বহু দরিদ্রের

নিরবলম্ব নিরন্ন জীবন নিশ্চিন্ত হইয়া আছে, সে সংসারের দায়িত্ব যে কত বেশী, তাহা দেবী আজ যেমন করিয়া বুঝিল, পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারে নাই।

বৈশাখ আসন্নপ্রায়।

পিতামহী ডাকিয়া বলিলেন, 'দেবী, গেল বছরেও তোমার ভুল হয়েছিল দিদি।'

'কি ভুল হয়েছিল, ঠাকু'মা?'

'ভুল হয়েছিল, লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মাথায় বৈশাখের তিরিশটি দিন তুলসী দিতে বলে দাওনি। হোক্ ওঁরা পুরুত, সাতপুরুষ ধ'রে ক'রে এলেও যদি একবার তুমি ভোল ত' ওঁরাও কালক্রমে ভুলে যাবে। ভাব্‌বে কর্ত্তৃপক্ষের বাসনায় গলদ ঢুকেছে, শৈথিল্য এসেছে, — কেন অপ্রয়োজনের বোঝা বয়ে বেড়াই? চালকলার বরাত নিয়ে যাঁরা এসেছে, চালকলা তারা বাঁধবেই; সুতরাং সেটা তাঁদের দোষ নয়। কিন্তু জনার্দ্দনের মাথায় তুলসী আর পড়বে না।'

দেবী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'এবার আর ভুল হবে না ঠাকু'মা। তিনপুরুষ ধরে' যে খুঁটিনাটি বিধান তুমি চালিয়ে এসেছো নির্ভুলভাবে একবৎসরেই আমি তা আয়ত্ত করবো কি ক'রে? এতদিন চোখ মেলে শুধু দেখেই এসেছি, কিন্তু সত্যিকারের অভিজ্ঞতা আমার আজও মেলেনি!'

'এইবার থেকে সেই অভিজ্ঞতা পাকা ক'রে নাও। আমি ত' অচল হ'য়ে পড়েছি দেখতেই পাচ্ছো, বেশীদিন যে আর বাঁচবো মনে হয় না।'

'ঠাকু'মা—

কথাটা দেবী শেষ করিতে পারিল না। আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল!

জাহ্নবীদেবী বলিলেন 'পাগ্‌লী! বেশী দিন বাঁচবো না বলে' কি আজকেই যাচ্ছি? আরে এ পাকা হাড় যেতে যেতেও হয়ত এই বিছানায় পড়েই তোর ছেলের বিয়ে দিয়ে যেতে পারবো।'

'তাই যেন পারো। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমি নিজে হাতে চাঁপাফুলের গাছ পুতেছি, গাছে ফুল ধরবে; সেই ফুল দিয়ে যেন তুমি আমার জহরের বৌ'র খোপার কেয়ারি ক'রে দিয়ে যেত পারো। আমার নিজের হাতে বোনা আম কাঁঠাল লিচুর গাছে যেদিন ফল ধরবে সেই ফল যেন তুমি আমার মেয়ের ঘরের ছেলের সঙ্গে একসাথে বসে খেয়ে যেতে পারো।'

দেবীর কথা শুনিয়া জাহ্নবীদেবী হাসিতে হাসিতে হাঁপানি বাড়াইয়া তুলিলেন।

সুখদাদাসী আসিয়া এমনি সময়ে জানাইল, সোমনাথবাবু বলিয়া পাঠাইয়াছেন জলসত্রের সমস্ত আয়োজন ঠিকই আছে। কিছু আর বলিতে হইবে না।

হাঁপানির বেগটা কমিয়া আসিলে জাহ্নবীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসের জলসত্র দেবী?'

দেবী বলিতে লাগিল।

লক্ষ্মীপুর হইতে জাহ্নবীগঞ্জ পর্যন্ত রাজপথের দুই দিকে ক্রোশখানেক ব্যবধানে খড়ের ছাউনি বিশ্রামশালা তৈয়ারী হইবে। শ্রান্তপথিক মাটিফাটা রৌদ্র মাথায় করিয়া আসিয়া সেইখানে বিশ্রাম করিবে। বিশ্রামের সঙ্গে মিলিবে ছোলাগুড় সমেত ঠাণ্ডা পানীয়। তারই সঙ্গে পশুপক্ষীর জন্য রাজপথের ধারে ধারে মাটি খনন করিয়া বসানো হইবে সুবৃহৎ মাটির

জলপাত্র। জালা ভর্ত্তি জল থাকিবে এবং তাহারি পাশে থাকিবে মালসায় পশুপক্ষীর আহার্য্য!

পুণ্যাত্মা জাহ্নবী এ হেন সদনুষ্ঠানের বিবরণ শুনিয়া আনন্দে বিগলিত হইয়া বলিলেন, 'বেশ করেছো দিদি। বৈশাখে জলদানের মত পুণ্যি আর কিছুতে নেই। কিন্তু যাই কেন না করো, শুধুমাত্র নতুনের ওপরেই ঝুঁকে থেকো না। পুরণো যা কিছু বজায় রেখে, যদি পারো নতুন অনুষ্ঠান করবে, না পারো ত' কোরো না।'

দেবী বলিল, 'ঠাকু'মা তোমার দেবীর আমোলে কিছুই বাদ যাবে না। তোমার বার মাসে তের পার্ব্বণ, বৈশাখে জলদান, কার্ত্তিকে শীতবস্ত্রদান আকাশপ্রদীপ, মাঘে অন্নদান, নারায়ণের মাথায় তুলসী, একদশীতে ব্রাহ্মণ-ভোজন, তোমার বড় সাধের অঘোরচতুর্দ্দশীর পূজা অর্চ্চনা, অতিথি সেবা, কাঙালী বিদায়, গুরুপুরোহিত সমাদর পাল-পার্ব্বণ যা-কিছু দেবী অন্ততঃপক্ষে চেষ্টা করবে বজায় রাখতে; কিন্তু তার ছেলেমেয়েরা কতটুকু ভেঙ্গে কতটুকু রাখবে, শিব গড়তে বানর গড়িয়ে বসবে কিনা, সে কথা কি ক'রে বলবো ঠাকু'মা?'

এমনি সময়ে মেনকার পিছনে মণির মা জহরকে কোলে করিয়া আসিয়া সেখানে দাঁড়াইতেই দেবী জহরকে কোলে তুলিয়া লইল। মেনকা আপন হইতেই গুটি গুটি করিয়া আসিয়া ঠাকুরাণীর পা ঘেঁষিয়া বসিল।

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, 'না দেবী তোরই ত' ছেলেমেয়ে, তারা আর কত খারাপ হবে? তারা মন্দ হলেও, তাদের সেই আদর্শটুকুও সাধারণের অনেক উচুতেই ঠাই পাবে, সে আমি তোমায় জোর ক'রে বলে যেতে পারি।'

জহর ও মেনকার মাথায় হাত বুলাইয়া ঠাকুরাণী আবার বলিলেন,

'বেঁচে থেকো, আমার যত চুল তত তোমাদের পরমায়ু হোক্। লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মী অটুট্ হয়ে তোমাদের ঘরে যেন চিরদিন বাঁধা থাকে। মায়ের নাম অক্ষয় ক'রে রেখো, আমার জনার্দ্দনের কাছে শুধু এই প্রার্থনা।'

বাইশ

জাহ্নবীদেবী প্রাণভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, ভবিষ্যৎবাণীও অনেক উচ্চারণ করিলেন!

কিন্তু ভবিষ্যতে দেবীর গর্ভজাত বংশধরদের ললাটে বিধাতাপুরুষ কি ভাবী সূচীপত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রিয়তমা পৌত্রী দেবীর যশোভারী বহুকীর্ত্তিত অতীত, চলিষ্ণু বর্ত্তমান কিম্বা উত্তরকালের অদৃশ্য ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তাহার অবসান কোথায়, একথা কেবল বলিতে পারেন তিনিই যাঁহার উপর জাহ্নবীদেবীর অখণ্ড বিশ্বাস, সেই হরিং সত্যং জনার্দ্দনং! ত্রিসন্ধ্যার যাঁহার নাম অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে পুণ্যশীলা জাহ্নবী একধ্যানে পাঠ করিয়া থাকেন।

কিন্তু জনার্দ্দনের লীলার অন্ত নাই! অকস্মাৎ স্পষ্ট দিবালোকে বিনামেঘে লক্ষ্মীপুরের আকাশে যেন বজ্রাঘাত হইল!

এ হেন একনিষ্ঠা সদাব্রতা ভক্তের প্রাণে অতর্কিতে এমন অসহনীয় মর্ম্মঘাতী শেল নিক্ষেপ করিয়া লীলাময় এযে কোন লীলামাহাত্ম্য প্রচার করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে সে অনধিগম্য লীলাকথা একান্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়াই রহিল। কোন্ পাপে যে লক্ষ্মীপুরের স্বচ্ছ স্ফটিকের মত আকাশ অকস্মাৎ শত শত মাসিরের দীর্ঘনিশ্বাসে

ঘনকুজ্ঝটিকায় আবৃত করিয়া ফেলিল, তাহা বলিতে পারেন জাহ্নবীদেবীর সেই প্রিয়তম বিগ্রহ দেবতা। যাঁহার উপর জাহ্নবীর অচলা ভক্তি।

শস্যশ্যামলা দিগন্ত জোড়া মাটির বুকে গুচ্ছ গুচ্ছ ধান্য যেন শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। তাহাদের চাপা ক্রন্দনে ধরিত্রীর বুক ভাসিয়া গেল কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল লক্ষ্মীপুরের প্রতিটি লতাগুল্মে ফলবান সুবৃহৎ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখায়, পাতার ফাঁকে ফাঁকে, নদীর বাঁকে, ঘাটের পথে একটা সিক্ত হাওয়ার শোকাভিভূত সুর। পরগণার প্রতি ঘরে ঘরে ভাসিয়া উঠিল একটা অরাজকতার বিদীর্ণ হাহাকার!

সুখ-ঐশ্বর্য্যে ও যশের সর্ব্বোচ্চশিখরে যখন দেবীরাণীর জয়পতাকা উড্ডীন, যখন দেবীর ভূরি ভূরি কীর্ত্তিকাহিনী নানা কথায় অতিরঞ্জিত হইয়া দেশময় বহু প্রবাদে কিংবদন্তী হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, প্রাতঃ-উত্থানকালে যে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা দেবীর পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া শয্যা-ত্যাগ করে, সে দেশের লোক যেন অকস্মাৎ দিবাভাগে আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া বিভীষিকায় শিহরিয়া উঠিল।

শোকাস্তীর্ণ এই নীরবতার মধ্যে স্বয়ং দেবী নিশ্চলা পাষাণ-প্রতিমার মত স্থির হইয়া আছে। অতীতের স্মৃতির কবর হইতে যে জাগ্রত দুঃস্বপ্ন ধূমকেতুর মত উদয় হইয়া তাহার জীবনালোকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা এমন নির্দ্দয়ভাবে দলিত করিয়া দিতে চলিয়াছে, তাহার কথা ভাবিতে বসিয়া দেবী ভাবনার ঘরে শুধুমাত্র দেখিতে পাইল রিক্ততাসূচক চিহ্নের অজস্র সমাবেশ! শূন্য মন্দির, শূন্য কুম্ভ, যা-কিছু শূন্যতার অনশ্বর একটা ভয়াবহ রূপ! এমন রূপ দেবী কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

শোকাচ্ছন্ন এই পটভূমিকার বুকের উপর একান্ত অতর্কিতে যাহার দুইটি ক্লেদাক্ত পদক্ষেপ এই বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে,

সে ব্যক্তিটি আর কেহ নয়, বিগত যুগের ভুলিয়া যাওয়া একটি পিতৃ-পরিত্যক্ত মাতৃহারা শিশুর নিষ্কলঙ্ক মুখচ্ছবি,—কালে পরিণত হইয়া যে নামধারণ করিয়াছে কুমার সাহেব !

জাহ্নবীদেবীর বড় আদরের সেই কুলপ্রদীপ !

নিশীথরায়ের একমাত্র পুত্র !

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর একমাত্র নিরঙ্কুশ উত্তরাধিকারী !

দেবীরাণীর সহোদর ভ্রাতা দেবকুমার !

স্বচ্ছ আকাশের কোণে বিলীয়মান একখণ্ড মেঘের ফাঁক হইতে স্খলিত উল্কার মত লক্ষ্মীপুরের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইল সেই দেবকুমার !

আতঙ্কে বিভীষিকায় রাজধানীর সমস্ত কণ্ঠ যেন একই সঙ্গে নির্জীব হইয়া পড়িল। জনমানবহীন পুরীর মত বিরাট গ্রামটা একটা আসন্ন বিপ্লবের ভয়ে থম্ থম্ করিতে লাগিল।

ঠিক এমনি সময়ে মহকুমা ও জিলা শহরের উকিল মোক্তারদের দপ্তরখানায় একই সঙ্গে বহু পল্লবিত বাকবিতণ্ডার মসগুল হইয়া উঠিয়াছে !

জিলা শহরের দেওয়ানী আদালত এমনি একটি বলীয়ান স্বত্বের মামলায় দেখিতে দেখিতে দুইদিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিবে ! কত তারিখ কত জেরা কত বড় বড় বারিষ্টারের কূটতর্কজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে এই আদালত ! বহু আকাঙ্ক্ষিত রায়দানে দুইদিনেই জজসাহেব হইয়া উঠিবেন যশস্বী মহাপুরুষ !

এমনি সব রুচিকর কল্পনায় বিভোর হইয়া আছে যে সব বস্তু-তান্ত্রিকের দল, তাঁহারা যে এত শীঘ্রই এমন হতাশ হইয়া পড়িবে, এ ধারণা বোধকরি স্বয়ং জজসাহেবও কল্পনা করিতে পারেন নাই ! এমন সুন্দর জমকালো

মামলাটা জেলাকোর্ট গড়াইয়া হাইকোর্ট, হাইকোর্ট ডিঙাইয়া প্রিভি কাউন্সিলের বড় দরবার হইতে একদিন ফিরিয়া আসিবে বলিয়া যাহারা সুনিশ্চিত ধারণা লইয়া বসিয়া ছিল, সেই মামলার বৈশ্বানরের ক্ষুধা যে এত সহজে দেবীর মত একটি অবোধ বালিকার তুচ্ছ খেয়ালে নিবৃত্ত হইবে, ইহা তাহাদের ভাবা দূরের কথা, লক্ষ্মীপুরের রাজধানীর পাত্রমিত্র আত্মীয় অনাত্মীয়ের পর্য্যন্ত স্বপ্নের অগোচর ছিল।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছেন জাহ্নবীদেবী! একটা অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর আঘাতে তাঁহাকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছে! একটা কথা বলিবার শক্তিও তাঁহার নাই।

সোমনাথবাবু হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন সর্ব্ববিপদের পরিত্রাণ-কর্ত্রী জাহ্নবীদেবীর কাছ হইতেও। ঠিক এমনি একটা দিন যে আসিতে পারে, ইহা হয়ত কেবল তাঁহার মনেই ক্ষীণ-দুর্য্যোগের মত এক আধবার উদয় হইয়া আবার মিলাইয়া গেছে দুঃস্বপ্নের হাল্কা হাওয়ায়। কালক্রমে দুইটি যুগের প্রান্তকালে আসিয়া তাঁহার মন নিঃসন্দেহে সমস্ত উদ্বেগ শঙ্কার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া একটা পরম স্বস্তিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধা জাহ্নবীর কুলদেবতা জনার্দ্দন যে অকস্মাৎ এমন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিবেন, একথা সোমনাথবাবু একজন প্রধান আইনজ্ঞ হইয়াও যদি না বুঝিয়া থাকেন, সেটা হয় তাঁহার সরলবুদ্ধির দোষ কিম্বা হয়ত মানুষের পক্ষে এহেন বিপর্য্যয়ের কল্পনা করাই স্বাভাবিক নহে।

সাহেবের বাংলোর দ্বিতল কক্ষে তিনদিন তিনরাত্রি মিঃ ডেভিসের সঙ্গে সোমনাথবাবুর গোপন পরামর্শ চলিল। হয়ত দুইটি মস্তিষ্কের প্রখর গবেষণায় একটা কিছু মীমাংসার পথও আবিষ্কার হইল। কিন্তু দেবীর দরবারে স্রোতের মুখে একটা তৃণের মত তাহা কোথায় যে ভাসিয়া গেল, তাহা না বুঝিলেন দেওয়ানজি না বুঝিলেন ম্যানেজার সাহেব!

সোমনাথবাবু বহুকষ্টে জাহ্নবীদেবীর নিজস্ব সিন্দুক খুলিয়া নিশীথরায়ের সেই অসমাপ্ত দানপত্রটি বহু দীর্ঘদিন পর আজ তুলিয়া লইয়া আর একবার নিবিষ্টমনে পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রতিটি ছত্রের বাঁকে কোথাও এতটুকু বঞ্চনার আভাস নাই। নির্ব্যূঢ় সত্ত্বে এমন দানপত্র যাঁহার দেওয়া সেখানে শুধুমাত্র স্বহস্তলিখিত একটি দস্তখতের অভাব। অন্তকার এই তুমুল অগ্ন্যুৎপাতের মূলে রহিয়াছে শুধু সেই আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরটি!

দানপত্রখানা হাতের উপর দুই চারবার উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে সোমনাথবাবুর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। এক সঙ্গে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তাহার চক্ষের সম্মুখে দৃশ্যের পর দৃশ্য গতিশীল চিত্রের মত ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

কি ভাবিয়া সেমনাথবাবু দলিলখানা পকেটে রাখিয়া ধীর মন্থর পদক্ষেপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়াছে। জ্বলে নাই শুধু দেবীর দোতলার ঘরে।

সোমনাথবাবু অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই, শুনিতে পাইলেন কে যেন সম্মুখের বারান্দা হইতে অলসকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, —'কে?'

'আমি। তুমি অন্ধকারে বসে!' তেমনি নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়াই দেবী বলিল, 'হ্যা বলুন, কি বলতে এসেছেন?'

'কিন্তু মা এই অন্ধকারে বসে কি করছো?'

'আকাশের তারা গুনছি।'

'ঘরে ত' আলোও পড়েনি মা!'

'দেবীর ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ আর পড়বে না কাকা। আপনার বক্তব্যটা কি তাই বরং বলুন?'

সোমনাথবাবু আর্দ্রকণ্ঠের জড়তা যথাসাধ্য চেষ্টায় চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন, 'সাহেব বললে—

সোমাথবাবুকে থামাইয়া দিয়া দেবী বলিল, 'সাহেব অনেক কিছু বলতে পারেন; কিন্তু আপনি পারেন না। আপনি সব জেনেশুনেও কি বলতে চান আদালতে দাঁড়িয়ে পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফলটুকু হাত পেতে নেব? দেবীরাণীর রাজত্বকালের বিদায়কালীন শেষ পুরস্কার গ্লানি ও লজ্জায় ঝুরিভর্ত্তি ক'রে মাথায় নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ি না গেলে কি চলবে না বলতে চান?'

'কিন্তু মা মামলার ব্যাপার জানো ত! পরাজয়ই যে অবশ্যম্ভাবী একথা জোর ক'রে কিছুতেই বলা চলে না।'

'খুব চলে। আর নাই বা চলুক, ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করবার প্রবৃত্তি আমার নাই। ঘটনাচক্রে সেই আজ তার বাপের সমস্ত সম্পত্তির ন্যায্য ওয়ারিশ। সত্য গোপন ক'রে, ফাঁকি দিয়ে, বাপের নাম জাল ক'রে কিম্বা কৌঁসিলীর সুন্দর বক্তৃতার জোরে আমি চাই না আপনাদের লক্ষ্মীপুরের মসনদে চেপে থাকতে।'

সোমনাথবাবু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অতি নম্র ও কাতরকণ্ঠে আবার বলিলেন, 'তুমি আমাকে কোনরূপ সন্দেহ করেছো মা? তোমার ঠাকুরমা আর আমি ছাড়া দলিলের এই ত্রুটিটুকু আর কেউই জানতো না। কিন্তু তোমার ঠাকুরমার পক্ষে কিছুই ব্যক্ত করা সম্ভব নয়; তবে কি আমিই কুমারের কাছে প্রচুর অর্থের লোভে গোপনে কিছু ব্যক্ত করেছি বলে' তোমার বিশ্বাস?'

'না। আর তাই যদি হতো তা হ'লে আর আমার মুখের ওপর দাঁড়িয়ে আপনি এমন নির্ভীক আত্মীয়তার দাবী নিয়ে কথা বলতে সাহস পেতেন না। সে সন্দেহ আমি আপনাকে করিনি কাকাবাবু।

আপনারা আমায় কি ভাবেন জানি না। কিন্তু আমি জানি আপনাদের এই অতুল বৈভবের মায়া কাটিয়ে আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনাদের সব ছেড়ে চলে যেতে পারি। একদিন যাবোও। সেজন্য ততটা দুঃখ হবে না, যতটা হবে এই ভেবে যে, পরের ধন পাহাড়া দিয়ে যাবার বেলায় কি পুরস্কার আমি পেলাম? লজ্জায় অপমানে শির যে আমার কাটা যাবে কাকাবাবু! শ্বশুরবাড়ির দেশে ওই লক্ষ লক্ষ তাচ্ছিল্যে-ভরা দৃষ্টির সম্মুখে গিয়ে আমি দাঁড়াবো কি ক'রে?'

কণ্টকিত ভবিষ্যতের কয়েকটি চিত্র দেবীর চক্ষের উপর দিয়া তড়িৎবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল। মানীর শিরোচ্ছেদতুল্য অপমানের একটা আসন্ন শঙ্কায় তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় অকস্মাৎ নাড়া দিয়া উঠিল। দেবী নিজেকে যেন আর কিছুতেই সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না।

বলিয়া উঠিল, 'আমার এই ভাগ্যটাকে নিয়ে আমার ঠাকুরমা আর আপনি দু'জনে মিলে ছেলেখেলা করেছেন, এটা আজ যেমন বুঝতে পারছি, আগে এমন ক'রে কোনদিন বুঝতে চেষ্টাও করিনি, বুঝতেও পারিনি! যদি বুঝতাম, একটু জানতেও চেষ্টা করতাম, তাহ'লে আজ অদৃষ্টের এই পরিহাস নিয়ে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেত না।'

সোমনাথবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। কিন্তু দেবীর এই অভিযোগের উত্তরে স্বচ্ছন্দমনে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতেও পারিলেন না।

বলিলেন, 'তোমার ভাগ্যের বনেদ গাঁথবার বেলায় মজবুত ক'রে গাঁথতে পারিনি কথাটি যেমন সত্য, বাস্তবজীবনের এমন আকস্মিক বিপর্য্যয়টাও তখন আমাদের পক্ষে কল্পনা করা এত সহজ ছিল না মা। আমরা দৈবজ্ঞ নয়। সুতরাং কি ক'রে বুঝবো যে আমাদের সেই ছোট কুমার একদিন সাহেব হয়ে মাতামহের অমন বিপুল সম্পত্তিটা দু'দিনের মধ্যে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে অবশেষে একটা মেমসাহেব বিয়ে ক'রে আবার এই

দেশেই ফিরে আসবে! এসে সেই সঙ্গে তার ভগ্নীর সাব্যস্ত স্বত্ব পর্য্যন্ত দাবী ক'রে বসবে! স্বর্গীয় কর্ত্তা যা-কিছু তোমাকেই দিয়ে গেছেন, তাকে দেয়নি এটা দেশশুদ্ধ লোক যেমন জানে, সেও তেমনি জানে। কিন্তু আমাদের দুর্ব্বলতার সন্ধান যে সে পেলো কি ক'রে আমি আজও ভেবে ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারছিনে!'

দেবী বলিল, 'নাই বা পারলেন। সে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। আপনাদের যদি থেকে থাকে, ঠাকুরমার সঙ্গে কিম্বা সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যত ইচ্ছে মস্তিষ্কের চালনা করুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু দোহাই আপনাদের, আমার এই ছেঁড়া অদৃষ্ট নিয়ে আর হাসিঠাট্টা করবেন না। বরং এখন আসুন, আমায় একটু নিরিবিলি বসে ভাবতে দিন।'

এ কথার পর যে সোমনাথবাবুর আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা চলে না ইহা তিনি ভালরূপেই বুঝিয়া শুধুমাত্র একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন। অবশেষে যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

* *

*

সোমনাথবাবু চলিয়া গেলেন।

কিন্তু দেবী বসিয়াই রহিল। যত রাজ্যের ভাবনা আসিয়া তাহার মস্তিষ্ক আজ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

জীবনের ব্যস্ত সমারোহ উৎসব আনন্দ সব একই দিনে থামিয়া গেছে। শুধু রহিয়াছে একটা শোকাস্তীর্ণ নীরবতা, ঐশ্বর্য্যের অপর্য্যাপ্ত সম্ভারে পরিপূর্ণ বিগতদিবসের একটা সুদীর্ঘ তালিকা।

অতীতের উজ্জ্বল স্মৃতির বিপুল ক্ষেত্রটি দেবী আজ তাহার সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়া বসিয়াছে। বাল্যের অস্পষ্ট ধূসর স্মৃতি কালক্রমে ফিকা হইয়া মিলাইয়া গেছে মুখরিত জীবনের কলরবে। তবু মনে পড়ে মায়ের সে ভুলিয়া যাওয়া মুখখানা। বাৎসল্যের অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত মূর্ত্তিমতী মায়ের সে মুখের সঙ্গে ভাসিয়া উঠে বয়ের আরও কয়েক-টুক্‌রা স্মৃতি।

মনে পড়ে ঐশ্বর্য্যে বর্দ্ধিত মাতামহের শ্বেতশ্মশ্রু সমাচ্ছন্ন সুগম্ভীর মুখখানা, তাহারই সঙ্গে মাতামহীর আদর আহ্লাদের সে ঘনঘটা। তাহার পর মায়ের কোল আলো করিয়া আসিল সেই ভাই, যে ভাইটি শুধুমাত্র মাতার স্নেহের ভাগটুকুই কাড়িয়া লয় নাই, স্নেহমায়া সুখকে মূল উৎপাটন করিয়া সেই আজ আসিয়াছে শত্রুর নির্ম্মমহস্তে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে।

স্নেহশীলা পিতামহীর অঙ্কস্বর্গ আজ ধূলায় গড়াগড়ি যায়। যাঁহার স্নেহময় শুভহস্ত দুইটি অবিরত কল্যাণ আশীর্ব্বাদ বুলাইয়া দিয়াছে দেবীর শিরে, আজ তাহা অবশ শক্তিহীন হইয়া শয্যাপ্রান্তে পড়িয়া আছে।

দেবীর মনে পড়িল পিতার শোকতপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত মলিন বিষণ্ণ মুখখানা। প্রেমের বৈরাগ্যে নিমজ্জমান যে মানুষটি সংসারে থাকিয়াও সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, তাঁহার বোধ করি বাঁচিয়া থাকিবার আর কোন প্রয়োজনই ছিল না; তাই তিনি চলিয়া গেলেন। পিতার আকস্মিক তিরোভাবের পর তাহার অপরিণত বুদ্ধি বিদ্যা পরিচালনার ভার পড়িল যাঁহাদের হাতে, তাঁহারাই একদিন পিতার সেই শূণ্য আসনে তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া বসাইয়া দিলেন। তাহার পর একে একে কত দিন চলিয়া গেছে।

অতীতের সেই খণ্ড খণ্ড স্মৃতিগুলি এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

হঠাৎ দক্ষিণের বাতাসে বহিয়া আনিল সুমুখের উদ্যান হইতে চাঁপার উগ্র গন্ধ। দেবীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়া সে গন্ধ ক্রমশঃ যেন উগ্র হইতে আরও উগ্রতর হইয়া উঠিল। একদিন স্বহস্তে যে বৃক্ষ রোপণ করিবার বেলায় দেবীর চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছিল অনাগতের একটা সুখনিবিড় স্বপ্নের ছায়া, কে জানিত আজ তাহার বাতাসে বহিয়া আনিবে এত জ্বালা! এই চম্পকের তরুশাখায় সেদিনও হয়ত কলি মুঞ্জরিয়া উঠিবে, গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিবে চতুর্দ্দিক; কিন্তু সেদিন দেবীর পুত্রবধূর কবরীতে কবরী বাঁধিয়া দিবার জন্য বৃদ্ধা পিতামহী যদিও বা বাঁচিয়া থাকেন, দেবী কিম্বা তাহার বধূর খোঁজও হয়ত মিলিবে না। হাস্যচ্ছলে দেবী এই কথাই সেদিন ঠাকুরমাকে বলিয়াছিল। আজ সে কথা মনে পড়িয়া এই অন্ধকারের মধ্যেও দেবী তাহার মুখ যে কোথায় লুকাইয়া রাখিবে ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। ক্রমশঃ চাঁপার গন্ধ তাহাকে টানিয়া লইল আরও দূরে। ভবিষ্যতের স্থায়ী রচনার কত অগণিত নিদর্শনের সীমানায়। এমনি কত আশা নিবিড়ভাবে জমা হইয়া রহিয়াছে কত আম কাঁঠালের বাগানে, মৎস্যভরা দীঘির স্বচ্ছ জলের বুকে, জন্মভূমির শিশিরসিক্ত ঘাসের পাতাটিতে পর্য্যন্ত! দেবীর অসম্বদ্ধ দৃষ্টির ফাঁকে একটি একটি করিয়া আরও কত কি ভাসিয়া উঠিল! মনে পড়িল পুণ্যাহের এক পর্ব্বদিনে প্রথমা কন্যাকে লইয়া যে উৎসবের সূচনা হইয়াছিল, সমস্ত বাদবিসম্বাদ এড়াইয়া ভবিষ্যতের মুখের গ্রাস তুলিয়া ধরিয়া ছোট্ট মেনকার ললাটে যে চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল, তাহা যে একদিন সত্যি করিয়াই এমন একটি জীবন্ত প্রহসনে পরিণত হইবে, ইহা কে ভাবিয়াছিল?

সব থাকিবে। থাকিবে না শুধু সে, তাহার ছেলে তাহার মেয়ে তাহার

স্বামী। এই বিস্তীর্ণ রাজ্যপাটের প্রতি গাছের পাতায় দেবীর নাম অদৃশ্য মসীতে লেখা থাকিবে শতাব্দীর পর শতাব্দী। জনপদের বৃহৎ দীর্ঘিকায় দেবীর আশীর্ব্বাদ সিঞ্চিত বারিরাশি আরও কত দীর্ঘ দিন হয়ত এমনি স্বচ্ছতায় ভরিয়া থাকিবে। পরগণার সুসংস্কৃত রাজপথে দেবীর পদচিহ্ন না পড়িলেও তাহার ছায়া পড়িয়াছে। হয়ত বা অদূর ভবিষ্যতেই কুমার-সাহেবের কলঙ্কচিহ্নে ধূলিমলিন হইয়া উঠিবে সে রাজবর্ত্ম! সাহেবের কলঙ্ক-লাঞ্ছনায় প্রধূমিত বায়ু যখন পল্লীর স্বাস্থ্য মন দূষিত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, তখনও হয়ত ত্রিপথের সঙ্গমস্থলে শ্বেতমর্ম্মরের খোদিত আসনে দাঁড়াইয়া বটপাকুরের সেই সুখী দম্পতি মানুষকে ডাকিয়া বলিবে, 'রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেছে, কিন্তু আমি আজও আছি!'

কুমারসাহেবের পঙ্কিলচিত্তে প্রাচীন বনস্পতির সে সতর্ক ইঙ্গিত হয়ত স্পর্শও করিবে না; কিন্তু জাহ্নবীগঞ্জ, মাণিকদহ, দেবীপুর লক্ষ্মীপুরের মানুষগুলি কি এতই হৃদয়হীন যে সে ধ্বনি তাহাদের হৃদয়ও স্পর্শ করিবে না? কে জানে? কালের পাতায় কালির রেখা কতটুকু মুছিয়া কতটুকু থাকিবে, সে কথা আমিও বলিতে পারি না। দেবী বুঝিল, সে ও পারে না! কিন্তু তাহার যাইতে হইবে!

স্বজনবান্ধব, বড় স্নেহের পিতামহী, বড় সাধের রাজ্যপাট ছাড়িয়া তাহাকে যাইতে হইবে। এমন অন্তর্দ্দাহী দারুণ দুঃসম্বাদ যে প্রথম বহিয়া আনিয়া তাহার কানে তুলিয়া দিয়াছে, সে বুঝি তাহার ভাইয়ের চেয়েও শত্রু! হয়ত তাহাই। কিন্তু তাহার যাইতেই হইবে। যাইতে হইবে, সেইখানে, যেখানে একদিন মহাসমারোহে ঘটা করিয়া সে পা বাড়াইয়াছিল, সেই চোদ্দরশির ঘাটে!

তাই বুঝি পরম করুণাময়ের একটু মাত্র করুণার শেষ নিদর্শন রহিয়া গেছে গাণেশ রায়ের হস্তচ্যুত বিত্তটার মধ্য দিয়া। স্বামীর নামে ক্রীত

সোনার খনিই বুঝি তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার একমাত্র পথ বিধাতা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন!

তা হউক। তবু এই লাঞ্ছিত ভাগ্যের এই পরিহাস মাথায় করিয়া, স্খলিত ঐশ্বর্য্যের অবনমিত নিষ্প্রভ জ্যোতি মাত্র সম্বল করিয়া মানুষের ঐ তাচ্ছিল্যে ভরা দৃষ্টির সম্মুখে যাইয়া সে দাঁড়াইবে কি করিয়া? ভাবিতে ভাবিতে দেবীর অজ্ঞাতেই কোথা হইতে জল আসিয়া তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া উঠিল।

অন্তঃপুরের দীঘির চতুর্দ্দিক কোকিল ঘুঘু দোয়েল শ্যামার ডাকে মুখরিত ঘেরা বাগানটা যেন নিঃস্তব্ধ হইয়া গেছে। শুধু ঝি ঝি পোকার একটা অবিশ্রান্ত বীভৎস শব্দে কানে তালা লাগিতে চায়। অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেবীর দৃষ্টি অবশেষে উদার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া একটা অসীম ব্যর্থতার পরিমণ্ডলের মধ্যে একটুখানি আরাম খুঁজিতে চায়। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা।

সজল দৃষ্টি ক্রমশঃ আঁরও ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হইয়া উঠে। রাত্রির বাতাস যেন ক্রমশঃ ভারী বোধ হইয়া উঠিতেছে। আকাশের তারাগুলি যেন হঠাৎ ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিয়াছে। উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত দেবীর দুইটি জলভরা চক্ষু নীচে নামিয়া আসিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন ক্রমশঃ তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে চায়। দ্বিতলের সেই অলিন্দ হইতে দুইটি চক্ষের অস্পষ্ট দৃষ্টি যাইয়া পড়িল কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাজপথের দুই ধারের কেরোসিনের আলোগুলির নিষ্প্রভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখার উপর, পল্লীর কুটিরের ফাঁক দিয়া ছোট ছোট আলোর রশ্মির দিকে। তাহার মনে হইল সব আলোগুলি যেন আজ ভয়াবহ প্রেতিনীর জ্বলন্ত চক্ষুর মত ধীরে ধীরে তাহারই দিকে নাচিতে নাচিতে আগাইয়া আসিতেছে! তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। চক্ষু বুজিয়া দেবী ওইখানেই আঁচল বিছাইয়া গড়াইয়া পড়িল।

তেইশ

অজ্ঞানতার মধ্যে নিশ্চিত ভবিতব্যের হাত হইতে যে শিশুটি একদিন আশ্চর্য্যরূপে এই সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া বহু দূরে আত্মীয় অনাত্মীয়ের দৃষ্টি ও স্মৃতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, আজ ততোধিক অভাবিত বিস্ময়ের সঙ্গেই তার পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। এবং যাহার আবির্ভাবে দেবীর অদৃষ্ট সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা যা-কিছু সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতে বসিয়াছে, ভাবিয়াছিলাম দেবীরাণীর জীবন-কাহিনী রচনায় তাহার প্রয়োজনও একান্ত নিশ্চয়তার মধ্যেই নিশিয়া গিয়াছিল। তাই তাহার কথা মনেও ছিল না; ভুলিয়াও গিয়াছিলাম।

কিন্তু ভুলিলে চলিবে না। বলিতে হইবে তাহার কথাও, যাহার হাতে আজ বিপ্লবের জয়পতাকা, ললাটে রাজটীকা!

পাঁচ বৎসরের শিশু আজ একুশ বছরের পরিপুষ্ট যুবক। পাঁচ বৎসর পর যে যোলটি বছর চলিয়া গেছে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়া তাহার সব কথা জানি না।

শুধু জানি, রায়সাহেব ও রায়সাহেবের পত্নীর মৃত্যুর পর অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়া মাতামহের আব্দারে সোহাগে বর্দ্ধিত বালক যেন সহসা একদিন যুবক হইয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। অপরিণতমস্তিষ্ক শিক্ষাদীক্ষার যে শোচনীয় রূপ প্রকাশ করিল,—ইহাই স্বাভাবিক। প্রতি বৎসর য়ুরোপের প্রধান প্রধান শহর ঘুরিয়া আসিয়া কুমার সাহেব যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বঙ্গে ফিরিত, তাহাতে সঞ্চিত অর্থ অপব্যয়ের নির্দ্দয় শোষণে শূন্যের সংখ্যা এক এক করিয়া ক্রমশঃ মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

অপরিণামদর্শীতার অবশ্যম্ভাবী ফলটুকুও অনিবার্য্য হইয়া উঠিল প্যারিসের চূড়ান্ত আরাম বিলাসীতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পাঁকে পড়িয়া! সে পঙ্ক হইতে

যে দিন কুমার সাহেব একটি ফরাসী-কমল তুলিয়া লইয়া দেশে ফিরিল, তখন রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনভোর শ্রমার্জ্জিত বিপুল বিত্তের শুধুমাত্র অবশিষ্ট রহিল মালাবার হিলের উপর প্রাসাদতুল্য মৃত্যুঞ্জয়-লজ, হাজার খানেক টাকার মাসিক আয়ের আরও কয়েকখানা বাড়ি, আর পুরণো মডেলের রোল্‌স্‌রয়েস গাড়ীখানা !

কিন্তু বিদেশিনী বধূর গার্হস্থ্য জীবনযাপনের পক্ষে সে অবশিষ্টাংশ যখন কুমার সাহেবের একান্তই নগণ্য বলিয়া মনে হইল, তখন চতুর্দ্দিকে তাকাইয়াও সে শুধু দেখিতে পাইল অর্থাগমের সহজলভ্য পথগুলি অন্ধকারে ও কণ্টকে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

অর্জ্জন করিবার মত সংযম বুদ্ধি বিদ্যা ধৈর্য্য শিক্ষা তাহার কিছুই নাই। সে শিক্ষা পাইয়াছে শুধু সঞ্চয়ের উপর উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযমী হস্ত প্রসারণ করিতে। তেমনি একটি সঞ্চিত ভাণ্ডারের উপর অকস্মাৎ তাহার অশুভ দৃষ্টি আসিয়া পড়িল। সেইটি হইল লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীর সিন্দুক !

বম্বে ত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক কুমার সাহেব কলিকাতার শ্রেষ্ঠ হোটেলে আসিয়া একটা অস্থায়ীবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইল।

আর্থিক কৃচ্ছ্রতা কিম্বা প্রতিকূল অবস্থাতেও তাহার ফরাসীবধূর কাছে মানের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। নচেৎ কবে যে বধূটি প্রেমের হাল্কা শৃঙ্খল সামান্য একটা ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়া আবার প্যারিসে চলিয়া যাইবে কে জানে ? তাই কলিকাতায় আসিয়া উঠিতে হইল নগরের শ্রেষ্ঠ অভিজাত হোটেলে। সঙ্গে আসিল রোল্‌স্‌রয়েস গাড়ীখানা, একজন সোফার, একজন বয় ও একজন বাবুর্চ্চি।

বন্যার মত অকাতরে অর্থ ঢালিয়া দিয়া যে য়ুরোপীয় সভ্যতা তাহার দেহের সমস্ত শিরায় অনুর্ব্বর মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে স্মার্ট করিয়া তুলিয়াছে সেই তুলনায় গ্র্যাণ্ড হোটেলের বিধিব্যবস্থা হালচাল

অকিঞ্চিৎকর। হোটেলে পা দিতেই গম্ভীর মর্য্যাদার একটা অকুণ্ঠ প্রদীপ্ত আভিজাত্য সে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিল।

হোটেলের নিয়মিত খানাপিনা, রঙ্গরস, নৃত্য, সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত বিলাসগুঞ্জন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর পরিদর্শন, সস্ত্রীক সান্ধ্য-পরিভ্রমণ,—সকলের মধ্যে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজটি সপ্তাহখানেকের জন্য চাপা পড়িয়া রহিল।

কিন্তু চাপা বেশী দিন থাকিতে পারে না। আগে হিসাব করিয়া চলিতে হইত না; কিন্তু এখন তাহার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পুঁজিপাটা যাহা কিছু আছে, তাহাও যদি এমনি করিয়াই ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে আইন আদালতের সেলামী কিম্বা দক্ষিণা দিবার যে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, সাহেবের সে দিকে চেতনা জাগ্রত ছিল।

* *

*

সাহেবপাড়ায় এক বড় বারিষ্টার বাড়ির গাড়ীবারেণ্ডার নীচে দাঁড়াইয়াছিল কুমার সাহেবের মস্ত বড় রোল্‌স্‌রয়েসখানা। গাড়ীর কামরাটা একটা ছোটোখাটো পারলার। বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক আলো, ফ্লাওয়ার ভেস্, পর্দ্দা টানিবার সরঞ্জাম, বহুবিধ মসৃণ কারুকার্য্যের চিক্কণতায় এমনই সুন্দর ও সংযতভাবে সজ্জিত, যে দেখিলেই নয়ন মন সার্থক হইয়া যায়। মনে হয় যেন ছোটোখাটো একটা পোর্টেব্‌ল্ ইন্দ্রভবন। রায়সাহেব বহু অর্থব্যয় করিয়া ফরমাইস দিয়া গাড়ীখানা খাস বিলাত হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন।

এত দিনে রায়সাহেবের গাড়ীটি সার্থক হইল। বিলাসিনী ফরাসী

তন্বী তরুণীর বেশভূষা ও রঙিন দেহের লালিত্যে গাড়ীর উজ্জ্বলতা যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। নগরের পথে পথে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিলাতী বড় বড় হোটেলে ডিকেন্টারের সঙ্গে কাচের সুদৃশ্য আধারের ঠুন্ ঠুন্ শব্দ বাজিয়া উঠিয়াছে।

এমনি সময়ে সৌখিন সমাজভুক্ত নরনারীর বৈষয়িক গবেষণার সময় নয়।

কিন্তু উপায় নাই। কার্য্যের গুরুত্ব নির্দ্ধারিত প্রমোদ-উৎসবকেও একটু দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে।

বারিষ্টার মিঃ এন্, সি, মিটার আজ আটটার ট্রেনেই একদিনের জন্য ধানবাদে যাইবেন; তাহার পূর্ব্বে দেখা না করিলেই নয়। তাই কুমার সাহেব সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া আর হোটেলে ফিরিয়া যাইতে সময় পায় নাই। গাড়ীতে বসিয়া কুমারের পত্নী মিসেস্ এলিসা রয় তাহারই ফিরিবার পথের দিকে ঘন ঘন চাহিতে ছিল।

দোতলায় বারিষ্টারের ড্রয়িংরুমে বসিয়া ইতিমধ্যে কুমার ও মিঃ মিটার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন।

কুমার বলিতেছিল, 'মিঃ মিটার, আমি আপনার ওপর সব ছেড়ে দিচ্ছি। যদি লক্ষ্মীপুরের ষ্টেটটা ফিরে পাবার এতটুকুও চান্স থাকে ত' একবার লড়ে দেখবোই। তারপর যা থাকে অদৃষ্টে। ওটা আমার চাই-ই। নইলে বুঝতেই ত' পারচেন, না খেয়ে মরতে হবে!'

মিঃ মিটার হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'মিঃ রয়, আপনি দেখচি মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছেন! কিন্তু জানেন ত' যত বড় বারিষ্টারই হই না কেন আইনের বাইরে যাবার ক্ষমতা আমাদেরও নেই। বাস্তবিক আপনি লিগেট কিনা এটা আমার আগে জানা চাই। আপনাকে সেদিনও ত' সেই কথাই বলে দিয়েছি।'

প্রত্যুত্তরে কুমার বলিল, 'আমি কি ক'রে জানবো মিঃ মিটার যে বারা উইলে কি লিখে গেছেন? সেটা দেখতে পাবো এমন চান্স মোটেই নেই। দেবীরাণীর সিন্দুকে কিম্বা জাহ্নবীদেবীর মণিকোঠায় কোথায় যে সেটা লুকনো আছে, কি ক'রে জানবো বলুন?'

মিঃ মিটার একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, 'তা হ'লে মিঃ রয় এক কাজ করুন। আপনি সেখানে চলে যান। সেখানে আপনাকে কেউ চেনে না; সুতরাং কেউ সাস্‌পেক্টও করবে না! ওখানকার লোকাল রেজিষ্ট্রী অফিসে গিয়ে খোঁজ নিন্, যদি কিছু বাজে খরচাও করতে হয় ত অবশ্য করবেন। ডিডের নকলটা দেখলে হয়ত বা লিগাল ক্লু কিছু বেরুলেও বেরুতে পারে।'

কুমার সাহেব মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কি একটা কথা চিন্তা করিয়া বলিল, 'শুনুন তা হ'লে মিঃ মিটার! আমি কলকাতায় এসে এই এক ফর্টনাইট্ ধরে' শুধু চুপ ক'রে বসেই নেই। বম্বের একজন জুনিয়র উকীল, আমার বিশেষ বন্ধুলোক, কলকাতায় আসবার বেলায় তাকে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম আইনজ্ঞ লোক, তাঁর সাহায্য পেলে আমার অনেক কিছু সুবিধা হবে। তাঁরই পরামর্শ মত আমি একজন টাউট্ নিযুক্ত করে' লক্ষ্মীপুরেও পাঠিয়েছিলাম।'

মিঃ মিটার বলিলেন, 'সেদিন ত' সে-কথা কিছুই বলেন নি!'

'সেদিন আপনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে বলবার ফুরসুৎ পাইনি। আজ সব বলবো ভেবেই এসেছি।'

ঘড়ির দিকে একবার লক্ষ্য করিয়া মিঃ মিটার বলিলেন, 'বলুন। আপনার ফ্রেণ্ডটি কলকাতায় এখনো আছেন কি?'

'আপনার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা করি, তার আগেই সে বম্বে চলে গেছে। তিনিও আপনার মতই ওখানকার রেজিষ্ট্রী অফিসে খোঁজ

করবার জন্য আমাকে এ্যাড্‌ভাইস্‌ দেন। এবং তাঁরই এ্যাড্‌ভাইস্‌ মত যে টাউট্‌টি পাঠিয়েছিলাম, সে ফিরে এসে যে জবাব দিলে, তাতেই আমি আরও হোপ্‌লেস্‌ হয়ে পড়েছি! অবশেষে আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছি।'

'কি বললে সে?'

'আসলে আমরা লিগেটি কিনা জানতে চাইলে এবং তার যথার্থ এভিডেন্স না পেলে কোন নকলই তারা দেখাতে পারবে না। ওখানকার স্থানীয় আবহাওয়া ও সাধারণের মনের ভাব আমার ভগ্নীর বড়ই অনুকূলে। দেবীরাণীর নামে সেখানে মানুষের মন নাকি ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে। মোটকথা তার বিরুদ্ধে কোনরূপ সন্দেহজনক আচরণ স্থানীয় কোন লোকই বরদাস্ত করবে না। আর দেবীর সে ইনফ্লুয়েন্স ভেদ ক'রে ডিডের কোনরূপ সন্ধান পাওয়া একটা দুরাশা!'

মিঃ মিটার প্রশ্ন করিলেন, 'এর পরও আপনি যে কোন্‌ আশায় আপনার ভগ্নীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে চাইছেন, আপনার মুখ থেকেই আমি সেটা শুনতে চাই মিঃ রয়!'

কুমার সাহেব উত্তর দিল, 'হয়ত আপনি শুনে হাসবেন! তা হাসুন; কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থা সঙ্গীনের মাথার উপর ঝুল্‌ছে! দু'দিন পর কুমার সাহেবের আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। তাই একবার অদৃষ্ট যাচাই ক'রে দেখবো।'

মিঃ মিটার হাসিয়া বলিলেন, 'তা ত' দেখবেন; কিন্তু কোন্‌ ভরসার ওপর দেখবেন, সেইটেই একটু খুলে বলুন না?'

'একমাত্র ভরসা এই যে আমি শুনেছি, আমার বাবার মৃত্যু খুব আকস্মিক হয়েছে। হয়ত তিনি মনে যা ভেবেছিলেন কার্য্যতঃ তার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে যেতে ফুরসুৎ পান্‌নি! এমনও ত' হতে

পারে! তাই যদি হয়, তা হ'লে লিগাল এয়ার আমি, বারো বৎসর পর্য্যন্ত আমার স্বত্বের মামলার পরমায়ু আছে।

মিঃ মিটার বলিলেন, 'কিন্তু বারো বছর ত' পেরিয়ে গেছে!'

কুমার বলিল, 'তা যাক্, তখন আমি মাইনর ছিলাম, মেজরিটি এ্যাটেইন্ করবার পর আরও তিন বছর ত' পাবো, তার দু'মাস এখনো বাকী আছে!'

মিঃ মিটার স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, 'ঠেকায় পড়লে মক্কেলও অনেক সময় আইনজ্ঞ হয়ে ওঠে। আপনি দেখ্ছি তেমনি আইনের ধারাগুলো ইতিমধ্যে কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলেছেন! কিন্তু মিঃ রয় আপনার এই অভিযান শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে! শ্রেফ্ লটারী! তার চেয়ে আপনার ঠাকুরমা বেঁচে আছেন, আপনার ভগ্নীটিও শুন্‌ছি নাকি একজন আন্‌কমন্ লেডী, সে ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে আপোষে একটা মিট্‌মাট্ ক'রে নিন্ না? অবশ্য যদি আপনি বিনিদ্ ডিগ্‌নিটি মনে না করেন!'

'নট্ এ্যাট্ অল্! বরঞ্চ আমার স্ত্রীর কাছে ডিগ্‌নিটি বজায় রাখবার জন্য আমি বড় বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। সুতরাং তাতে আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাদের কাছে সারেণ্ডার করবার পথ আমার নেই। আমাদের ফ্যামিলি বড়ই কনজারভেটিভ্! মেমসাহেব বিয়ে ক'রে এসেছি জানতে পারলে তাদের জেলার মাটিটি পর্য্যন্ত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।'

মিঃ মিটার ঘড়ির পানে আর একবার তাকাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, 'বেশ তাই করুন। নেহাৎ অন্ধকারে ঢিল্ ছুঁড়ে যে কি হবে কিছুই বুঝতে পারছিনে! দিন্ ঠুকে, যদি লাগে ত' আপনার খুবই বরাত জোর বলতে হবে। এ জন্য আমার পারসোনাল এ্যাক্‌টি-ভিটির খুব প্রয়োজন হবে না। আমার জুনিয়র মিঃ নীহার মুখার্জ্জির সঙ্গে আপনাকে ইন্‌ট্রোডিউস্ ক'রে দেব। তিনিই সব করতে পারবেন। তারপর যদি প্রয়োজন হয়, আমি ত' রইলামই!'

কুমার সাহেব হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'পরশু দিন আপনি ধানবাদ থেকে ফিরে এলে আপনার সঙ্গে দেখা করবো। আচ্ছা আসি। গুড্ নাইট্!'

দেবীরাণীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার এই ছিল ক্ষুদ্র ইতিহাস। এই সামান্য ইতিহাসের মূলে ছিল কুমারের বলবতী ভাগ্য, এক অপ্রত্যক্ষ শক্তি!

উৎপীড়িত জঠরের জ্বালা, বিদেশিনী বধূর ছলনাময়ী কটাক্ষ, বম্বের উকীলবন্ধুর উদ্যমশীলতা, কলিকাতার বড় এ্যাড্ভোকেট মিঃ মিটারের নিরুৎসাহ বাক্য বহুবিধ বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া সে-শক্তি সকলকে চমকিত করিয়া দিয়া ধূমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করিল! নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে যে সত্য একান্ত নিভৃতে ও অবহেলার মধ্যে পড়িয়া ছিল, নিশীথ রায়ের সে অসমাপ্ত দানপত্রের এহেন লাঞ্ছনার কথা ধুরন্ধর এ্যাড্ভোকেট কিম্বা বম্বের উকীল বন্ধুও যেমন কল্পনা করিতে পারে নাই, সমগ্র লক্ষ্মীপুরবাসীর কাছেও তেমনি দুর্বোধ্য ছিল।

কিন্তু সমস্ত অজ্ঞানতা ও জটিলতার ব্যূহ ভেদ করিয়া যে সত্য আজ প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহার পড়েও যে এমন স্বচ্ছন্দে নির্ঝঞ্ঝাটে কুমার সাহেব এত বড় বিশাল সম্পত্তিটা ভগ্নীর হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিবে, ইহা একটি প্রাণীও যেমন ভাবিতে পারে নাই, কুমার সাহেবেরও তেমনি কল্পনার অতীত ছিল!

কিন্তু লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মী যেন পায়ে হাঁটিয়া এক লক্ষ্মীছাড়ার [illegible] আসিয়া বাসা বাঁধিল।

একতরফায় এত বড় মামলায় জয়ী হইয়া মিঃ ডি, কে, রয় ওরফে দেবকুমার রায় হোটেলে একটা জমকালো পার্টি দিয়া বসিল। বম্বের

উকিলবন্ধু আসিলেন,—মিঃ মিটার তাহার জুনিয়র মিঃ মুখার্জ্জি ও হোটেল বন্ধু-বান্ধবীদের লইয়া এক সান্ধ্যমজলিসে মিঃ রয় একটা মোটা রকমের খরচ করিয়া ফেলিল।

তাহার পর এক সন্ধ্যায় সাহেবের খানসামা বড় বড় চামড়ার সুটকেস্, এয়ারপ্রুফ্ ট্রাঙ্ক, হোল্ড-অল্ সব বাঁধিতে সুরু করিয়া দিল। বাবুর্চি খানাপিনার সাজসরঞ্জাম গুছাইতে লাগিল। নবনিযুক্ত পারসোনাল সেক্রেটারী আসিয়া সংবাদ জানাইল, গাড়ী তৈয়ারী।

সস্ত্রীক কুমার সাহেব ট্রেন ছাড়িবার দশমিনিট পূর্ব্বে সিয়ালদহ ষ্টেশনের একটা বড় সাদা স্যালুনে দলবল সহ জমকাইয়া বসিল। দশমিনিটের কাটা সরিয়া গেলে গাড়ীর হুইস্‌ল্ পড়িল।

লক্ষ্মীপুরের নতুন ভাগ্যবিধাতা রওনা হইলেন লক্ষ্মীপুরের দিকে।

চব্বিশ

আর সাতদিন মাত্র বাকী আছে একুশে কার্ত্তিকের। সেইদিন জাহ্নবী দেবী কাশী যাত্রা করিবেন বলিয়া এখন হইতেই যাত্রার উদ্যোগ সুরু হইয়াছে

এইবার আর বাধা দিবার কেহ নাই, স্নেহের বন্ধনও একে একে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। স্বার্থের বীভৎস সঙ্ঘাতে স্নেহ-মমতা কোথাও কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। আজ একমাস হইতে চলিল দেবীর মুখেও কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। নির্লিপ্ত বাহ্যিক আবরণের তলায় তাহার মনের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার সাধ্য কাহারও নাই। বিরাট রাজপুরীতে সারা দিন-রাত্র কোথা দিয়া যে তাহা কাটিয়া যায় ইহাও একটা গবেষণার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। মাণিকলালের

জিজ্ঞাসা করিলেও সরল উত্তর কিছু পাওয়া যায় না। এমনি নির্ব্বান্ধব পুরীতে বৃদ্ধা জাহ্নবী কাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বাস করিবেন? অবশেষে কাশী যাত্রাই স্থির হইয়াছে।

এমনি সময়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূর্ব্বের দিন কুমার সাহেবের বিরাট মোটর গাড়ীটি গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। তার সঙ্গে আসিল লক্ষ্মীপুর ষ্টেটের নূতন মালিকের আগমনবার্ত্তা। আগামী কল্যই সস্ত্রীক কুমার লক্ষ্মীপুরে পৌঁছিবে। নদীর ঘাট হইতে নতুন জমিদারকে শোভাযাত্রা করিয়া আনিতে হইবে, তাহার ধুমধাম স্থুরু হইয়া গেছে। কুমার ডেভিস সাহেবের বাংলোতেই প্রথম আসিয়া উঠিবেন। এমনি নির্দ্দেশই কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। তাই বুঝি নদীর ঘাটে নবনির্ম্মিত তোরণের মাঝে 'স্বাগতম্' ঝুলিতেছে। ঘাট হইতে বাংলো পর্য্যন্ত পাদপ ও পতাকার সারি পড়িয়া গেছে! আরও কত সমারোহ!

এমনি সমারোহে যোগ দিবার বাসনা জাহ্নবীদেবীর খুবই ছিল। কিন্তু এমন অস্বাভাবিক বিধানের মধ্য দিয়া এ আয়োজন গ্রহণ করিবার সামর্থও তাঁহার নাই, ইচ্ছাও হয় না। স্নেহের সমুদ্র লুণ্ঠন করিয়া দেবী যাহা লইয়া গেছে, তাহার পরও যদি একান্ত নিভৃতে কিছু লুকাইয়া থাকে, তাহাই বা আজ কে গ্রহণ করিবে? কুমার ত' আজ পুরাদস্তুর সাহেব। পিতামহীকে যদি বা আজ সে গ্র্যাণ্ডমাদার বলিয়াও চিনিতে পারে; কিন্তু এ পরিবারে জাহ্নবীদেবীর মান ও মর্য্যাদার আসন যে কোথায় তাহা সে জানেও না জানিতে চাহিবেও না। যদি বা চায় তাহা হয়ত অমর্য্যাদার ক[illegible] অবাঞ্ছিত গ্লানিতে ভরিয়া উঠিবে কে জানে? দেবীর পক্ষে আজ [illegible]র আশ্রিত হইয়া থাকা যেমন সাঙ্ঘাতিক, বৃদ্ধা জাহ্নবীর পক্ষে নাতির লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া থাকা ততোধিক পীড়াদায়ক। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কাশী যাওয়াই ভাল। কিন্তু সেই ভাল ব্যবস্থার পূর্ব্বেই কুমারের আগমন-বার্ত্তা বৃদ্ধাকে

চিন্তার ভাবনায় আরও জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। কুমারের আসাটা মোটেই অতর্কিত নয়। সে আসিবেই! অনায়াসে জমিদারী লাভের পর প্রতিমুহূর্ত্তেই আমরা তাহার আগমন প্রত্যাশা করিতে পারি। কিন্তু জাহ্নবীদেবী পারে নাই। সত্য করিয়াই যে এমন অসম্ভব শেষ পর্য্যন্ত সম্ভব হইবে এবং প্রত্যক্ষভাবে অতি সন্নিকটে, লক্ষ্মীপুরের মাটিতে এমন কি অদূরবর্ত্তী ওই বাংলোতে আসিয়া দুশমনটা অধিষ্ঠিত হইবে, ইহা জাহ্নবীদেবীর অনভ্যস্থ মন চূরান্তভাবে চিন্তা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

শুধু জাহ্নবীদেবী নয়, এ ভুল আর একজনেরও হইয়াছে। সে প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সে দেবী। অকস্মাৎ তাহার যেন বহুকালের ঘুম ভাঙিয়া গেল একদিনের একটি মাত্র কথায়। সমাধিস্থ মন দীর্ঘ একমাস ধরিয়া এই কণ্টকাচ্ছন্ন পথের দিকেই চাহিয়া ছিল। তবু তাহার মনে নাই, সে আসিবে। একান্ত তপস্যালব্ধ চেষ্টায় সমস্ত মনের জঞ্জাল দূরে নিক্ষেপ করিয়া, এ কয়দিন তাহার দৃষ্টি পড়িয়া ছিল যেদিকে, সে শুধু প্রসারিত কল্পনার দৃষ্টি! সে দৃষ্টি শুধু ভাসিয়া বেড়াইয়াছে নিরর্থক অন্ধ চেতনার বাঁকে বাঁকে। তাই বুঝি অবধারিত সত্যের সন্ধান পাইয়াও সে তাহার নাগাল পায় নাই। অকস্মাৎ স্বামীর কণ্ঠে দেবী যেন যুগান্তরের ঘোষণা শুনিতে পাইল। বহুদিনের ঘুম ভাঙিয়া গেল মাণিকের এক কথায়।

মাণিক বলিল, 'ওই চেয়ে ত্থাখো লক্ষ্মীপুরের রাজপথের সাজসজ্জা! এখনো কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবার সময় আছে?'

'না নেই, চলো। কালকেই যাবো, কালকেই যাবো। আমার মনে ছিল না। আর একদিনও দেরী করা চলে না। তাইতো আমার মনে ছিল না। কিন্তু কোথায় যাবো বলো ত'?'

মাণিক একান্ত যোগী ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত নির্ভীক দিব্যকণ্ঠে উত্তর দিল, 'সবাই জানে তুমি দেবী, আমিও জানি তুমি দেবী ; কিন্তু তুমি জিজ্ঞেস করচো কোথায় যাবে ?'

'তা বটে, আমি দেবী, আমার নাম দেবী ; কিন্তু আমিও যে মানুষ, সে কথাটা ভুলতে পারছি নে। যাবো, হ্যাঁ যাবো, ফিরে যাবো স্বামীর ঘরে ! না ? তুমি ত' তাই বলচো ? উচিৎও আমার তাই, নয় ?'

'তাই ত' উচিৎ।'

'নিশ্চয়ই উচিৎ। সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট হয়েছে ; কিন্তু তুমি আমার স্বামী, তোমার কাছে চিরদিনই হেঁট হয়ে থাকবে। তোমার কাছে আমার কিসের লজ্জা ? এ ত' শুধু ভাগ্য নিয়ে জুয়োখেলা ! বেশ ত'—

বাধা দিয়া মাণিক একটু রাগতঃ হইয়াই বলিল, 'কি সব বলচো দেবী ! কিসের লজ্জা ? কিসের জন্য তুমি আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছো ? আমার কাঙালপনা স্বভাবের কোনো পরিচয় পেয়েছো কোনোদিন ? জানো না, আমার পিতার শত অনুরোধ সত্ত্বেও স্বার্থের স্বপ্ন আমি দেখিনি ? নিজেকে আমি বিচার ক'রে চলেছি প্রতিপদে ! চাপা লোভের ইঙ্গিতে আমাকে তোমরা টলাতে পারোনি, যাতে আমি টলেছি সে আর কেউ না জানলেও, তুমি জানো। আমার কাছে আজও যা, কালকের অবস্থাও তাই ছিলো। বরং আজকের দিনের প্রসন্নতা পূর্ব্বের চেয়ে বেশী।'

দেবী মাণিকের পদতলে বসিয়া পড়িল।

অশ্রুসিক্ত নয়নে দেবী বলিতে লাগিল, 'ক্ষমা করো। ...ই, তুমি মহৎ, তুমিই আজ সবচেয়ে বড় জয়ী !'

মাণিক তাহাকে টানিয়া বুকের কাছে তুলিয়া ধরিতেই দেবী বলিল, 'কালকে নয়, আজকেই চলো,—এখনই।'

'পাগলামী বন্ধ কর দেবী। মানসিক বিকারের পরিচয়টুকু আমি জানলে দোষ নেই। বাইরের লোককে কেন জানতে দেবে? শান্ত স্থির ভাবে এই অঘটনটাকে অনায়াসে আত্মস্থ ক'রে, বুক উঁচু ক'রে যাবে স্বামীর ঘরে। মানুষ দেখুক, জানুক—দেবীর এতদিনের কীর্ত্তি এত বড় আঘাতেও সাময়িক দুর্ব্বলতার তলায় চাপা পড়ে মারা যায় নি। কাল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। একমাত্র ভাই তোমার দ্বারে,—হোক্ না সে সাহেব, বাঙালীর ছেলে ত',—ডেকে এনে তাকে ফোঁটা দাও। যাবার বেলায় দেবীরাণীর শেষ কীর্ত্তি লক্ষ্মীপুরের পাকা ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাক্।'

তাহাই ঠিক হইল। আগামীকল্য দেবীরাণী চিরদিনের জন্য তাহার সাধের লক্ষ্মীপুর ছাড়িয়া চোদ্দরশি রওনা হইয়া যাইবে। কথাটা রটিয়া গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে। নতুন জমিদারের আগমন সংবাদের একই বাতাস বহন করিয়া আনিল ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামিনীর বিদায়বার্ত্তা।

একই সঙ্গে দুইটি সংবাদ জাহ্নবীদেবীর কানে আসিয়া পৌছিল। সংবাদটি শুনিয়া তিনি বহুক্ষণ শূন্যে কড়িকাঠের পানে তাকাইয়া ছিলেন। তারপর অবসাদে ব্যথায় দুশ্চিন্তায় মাথা যখন একরূপ অদ্ভুত প্রদাহে জ্বলিয়া উঠিল, তখন আর তিনি কোন মতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া বিগ্রহদেবতার চরণতলে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িলেন। কিন্তু ভগবানের দয়া হইল না। সাতটি দিনও তাঁহার সহ্য হইল না। মাত্র সাতটি দিন! তাহার পরই জাহ্নবীদেবী বিশ্বনাথের চরণতলে পৌছিয়া জীবনের শেষ কয়টা দিন পরকালের পথটি সুগম করিবার চেষ্টায় ব্যয় করিবেন। শোকতাপক্লিষ্ট জীবনের এই ছিল তাঁর বাসনা। কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন। প্রিয়তমা দেবী,

জাহ্নবীদেবীর চোখের মণি দেবী অদ্যকার রাত্র প্রভাত হইলেই আগামীকল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে লক্ষ্মীপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। যাইবেই। যাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে সামান্য একটি মাত্র অঙ্গুলি সঙ্কেতই যথেষ্ট ছিল সেই আরাধ্যা পিতামহীর অনুরোধ উপরোধ আজ হয়ত দেবীর কাছে ভাসিয়া যাইবে তৃণ কুটের মত! সে বড় অভিমানিনী মেয়ে, জেদী মেয়ে। এত বড় আঘাত সে মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া শ্বশুরগৃহের দিকে পা বাড়াইয়াছে। তাহাকে আজ রোধ করিবার সাধ্য একমাত্র পিতামহীরই ছিল। কিন্তু তাহাও আজ নাই। দেবীর মত তিনিও আজ রিক্তা সর্ব্বস্ববঞ্চিতা। সর্ব্বময়ী কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে। তাই বুঝি কোন কথাই মুখ ফুটিয়া বলিবার তাঁহার সাহসও নাই, বলিবার মুখও নাই। দেবী যাইবে। সাধের অট্টালিকা স্বজন পরিজন পৌরজন সাজানো সংসারের অজস্র পরিকল্পনা, দেবীর সবচেয়ে আহ্লাদের ঠাকুরমা ছাড়িয়া যাইতে হয়ত তাহার বুক ফাটিয়া যাইবে। তবু সে যাইবে।

জাহ্নবীদেবী ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া কোন সময় যে তাঁহার অবশ দেহ মন্দিরের মর্ম্মরতলে বিছাইয়া দিয়া এলাইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কাহার শীতল পরিচিত স্পর্শে চমকিয়া উঠিলেন। অবসন্ন দুইটি চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন দেবীর একজোড়া জলভরা চক্ষু। দেবীর হাঁটুর উপর পিতামহীর মাথাটা যে সে কোন সময় টানিয়া লইয়াছে তাহাও জাহ্নবীদেবী টের পান নাই।

দেবীর কণ্ঠের উদ্বেগ প্রকাশ পাইল তাহার মাত্র দুইটি কথায়। ভারাক্রান্ত সজল কণ্ঠে দেবী বলিল, 'ঠাকু'মা আমি যাবো। তুমি নিষেধ কোরো না ঠাকু'মা। আমি যাবোই। তুমি ওই দিনেই কাশী চলে যেও। সেখানে গিয়ে তুমি দেবীর দেখা পাবে।'

বহুক্ষণ যেন একটা নিশ্চিন্ততার মধ্যে কাটাইয়া জাহ্নবীদেবী আবার একটু

চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দেবী যাইবে,—কথাটা যেন এই মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ভগ্নকণ্ঠে রোদনের স্বর ফুটিয়া উঠিল।

কহিলেন, 'তোর লক্ষ্মীপুর ছেড়ে চলে যাবি দেবী? আমার ছেড়ে চলে যাবি? এ যে আমার বিশ্বাস হয় না রাণী!'

দেবী কথা বলিল না।

জাহ্নবীদেবী বলিতে লাগিলেন, 'সত্যি তুই যাবি দেবী? এই রামরাজত্ব একটা চণ্ডালের হাতে সঁপে দিয়ে তুই যাবি দেবী? আমারই চোখের সুমুখ দিয়ে তুই দিব্যি হেঁটে চলে যাবি? সীতার সেই বনবাসের দৃশ্য আমি চেয়ে চেয়ে দেখবো? এত বড় যন্ত্রণা আমার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতেও ত' আমি পাইনি রাণী। আমি কি ক'রে সহ্য করবো—এ যন্ত্রণা?

তবু দেবী কথা বলিল না। অশ্রুভারাক্রান্ত দুইটি চক্ষে জল টলমল করিতেছে। তাহার মধ্যেও দেবীর বিদায়ের অটল প্রতিজ্ঞা স্থির হইয়া আছে।

* *

*

লক্ষ্মীপুরের ওই পূর্ব্ব আকাশে কত সূর্য্য উদয় হইয়াছে; কিন্তু আজকার উদয়ের ইতিহাস অন্য রকম। শতাব্দীর কীর্ত্তিকলাপ পুরাতন আভিজাত্যের কত সমারোহ, অতীত গরিমার কত স্বাক্ষর আজ ?প্রবী রবির বর্ণচ্ছটায় বিলীন হইয়া যাইবে।

অনিদ্রিত পুরী প্রত্যুষের প্রান্তকালে আসিয়া পৌছিল। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নারায়ণের প্রাতঃউত্থানের শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। অদ্যকার প্রভাতের

একটা অস্বাভাবিক সুর সমস্ত পৌরজনের মনে একটা বৈরাগ্যের ভাব সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। তারই সঙ্গে নতুন গ্রাম্যবিধাতার আসন্ন আগমনকালের একটা কৌতূহলজনক সংশয়!

ওই ত' পূর্ব্ব-আকাশে রক্তচ্ছটায় আগামী কালের ধূসর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সূর্য্য এখনও কোথায় কে জানে? আকাশের গায়ে তাঁহার জাগরণের আভাস। হয়ত বা মাণিকদহের মধ্য হইতে একটুখানি উঁকি মারিয়াছে। তাহার পর দেবীপুরের লতায় পাতায় রাঙারক্ত মাখাইয়া দিবে। তাহার পর বিদীর্ণ রশ্মি জাহ্নবীগঞ্জের সেই বট পাকুরের সুখী দম্পতির চূড়ায় আসিয়া হেমন্তের শিশিরসিক্ত পাতাগুলিকে পুরাইয়া দিয়া আসিয়া পড়িবে লক্ষ্মীপুরের সৌধচূড়ায়। এই আকাশে কত সূর্য্য উদয় হইয়াছে। কিন্তু সে অনাবিল জ্যোতি আর নাই। অনাগতের বিদ্রোহী কল্পনার বিচিত্র রথে আজ তাঁর উদয়। তাই বুঝি গ্রামের লোক দলে দলে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আকাশের পানে চাহিয়া কত জনে কত কথা বলিতেছে।

বেলা সাতটা। এতক্ষণ হয়ত কুমার সাহেব যমুনার ওপারে গঞ্জের ঘাটে ট্রেন হইতে নামিয়া ফেরিষ্টীমারে আসিয়া চড়িয়াছে। কতক্ষণই বা লাগিবে। দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইবে আরও দু'ঘণ্টা। তারপর ওই আধ মাইল দূরে লক্ষ্মীপুরের জাহাজঘাটে আসিয়া ভিড়িবে জাহাজ! আসিবে কুমার সাহেব। আসিবে তার মেমসাহেব। তার কত কিছু আজগুবী চালচলন, কত কিছু ভাবভঙ্গী তেজদর্প ওই সঙ্গে বহন করিয়া আনিবে—অপেক্ষিত ওই জনতার সম্মুখে।

সত্য করিয়াই দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল আরও দু'ঘণ্টা। সূর্য্য তখন বেলা নয়টার জায়গায়।

জাহাজের ধোঁয়া দেখা যায় অদূরে নদীর বাঁকে।

সদলবলে ডেভিস সাহেব জেটির উপর জাহাজ ভিড়িবার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

সকলের সঙ্গে দেবীরও আজ অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু ঘুমের মাদকতা বুঝি এখনো কাটে নাই। বাসীশয্যা হইতে পা দুইখানি ঠেলিয়া তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন তাহাও যেন আলস্যে জড়ীভূত হইয়া অচল হইয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের সূর্য্যের আলো মুক্ত জানালা দিয়া ঘরের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিত্য নিত্য এমনি করিয়াই সে দেবীর ঘরে আলো ছড়াইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সে আলোতে তেজ ছিল, জ্বালা ছিল না। আশীর্ব্বাদ ছিল, অভিশাপ ছিল না! তবু সে আজ দেবীর সঙ্গের সাথী। তাই দেবী দুই হস্ত জোড় করিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে সূর্য্যদেবকে আজ শেষ প্রভাতী প্রণাম জানাইল।

চোখে মুখে জল ছিটাইয়া দেবী ছাতের উপর উঠিয়া আসিল, লক্ষ্মীপুরকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য। লক্ষ্মীপুরের সেই অগণিত পল্লীভবন। সেই চিরপরিচিত পথঘাট। কত মায়া কত গভীর স্মৃতি জড়ানো রহিয়াছে তাহা দেবী আজ যেমন করিয়া বুঝিল, এমন করিয়া বুঝিবার প্রয়োজনও তাহার কোনদিন হয় নাই।

হঠাৎ গুরুম্ গুরুম্ তোপধ্বনির বিকট শব্দে দেবীর কর্ণ বধির হইয়া উঠিল। ঝাউতলার সেই বৃদ্ধ অশ্বত্থগাছ হইতে তাহার একান্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল পশ্চিমের নদীর ঘাটের ছোট জনতার দিকে।

জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া কুমার ডেভিস সাহেবের করমর্দ্দন করিয়া তার স্ত্রীর সঙ্গে মাত্র পরিচয় করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, এমনি সময়ে নতুন জমিদারের আবাহনকল্পে বন্দুকের প্রথম গর্জ্জন সুরু হইল। অবিরাম সে গর্জ্জন চলিতে লাগিল আরও না জানি কতক্ষণ!

ছাতের উপর হইতে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না, শোনাও যায় না। শুধুমাত্র কোলাহল ও বন্দুকের শব্দ, আর কতকগুলি লোকের সসম্ভ্রম জটলা।

দেবীর মনে তখন কি ভাবের উদয় হইল ঠিক বলিতে পারি না। তবু বুঝি নারীর হৃদয় মুহূর্ত্তের মধ্যে গলিয়া উঠিল। দশবৎসরের মেয়ে দেবীর কোলে যে পাঁচ বছরের শিশুভাইটির অম্লান মুখচ্ছবি,—আজও তাহার চোখে লাগিয়া রহিয়াছে,—এই জনতার মধ্য হইতে সেই মুখটি খুঁজিয়া বাহির করিতে দেবীর ব্যর্থ প্রয়াস হয়ত কিছুক্ষণ চলিল। কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। সে মুখ আজ পরিপক্ক। বৈষয়িক গম্ভীরতায় আচ্ছন্ন হইয়া সে মুখ তীব্র বিলাস ও বৈদেশিক হালচালের উৎকট আচরণের তলায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা দেবীর পক্ষে এখন অসাধ্য। দেবীর অন্যায় দুর্ব্বলতার মোহ ভাঙিয়া গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে। হয়ত বা সে একবার ভুল করিয়াও ভাবিয়াছিল, কুমারের রথ প্রথম আসিয়া থামিবে এইখানেই—ওই প্রাসাদের তোরণদ্বারে। তারপর নাড়ির টানে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে সেই অচেনা আহ্বান দিদি কিম্বা ঠাকুরমা। হয়ত প্রথম আসিয়া পিতামহীর ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর পায়ের সামান্য ধূলিটা মাথায় তুলিয়াও লইতে পারে। হয়ত বা চোখের লজ্জা ভাঙিয়া দিয়া অপরাধী মন একবারের তরে ক্ষমা চাহিয়াও বসিতে পারে।

কিন্তু নারীর মন কি এতই হাল্কা!

মায়ার এ কি মর্ম্মান্তিক রূপ! করুণার এ কি তাচ্ছিল্য রূপ! ছিঃ ছিঃ! দেবী আপন মনে ধিক্কার দিতে দিতে চাহিয়া দেখিল, নির্ভীক শব্দে কুমারের মোটরখানা রাজবাড়ির সম্মুখের প্রশস্ত পথ দিয়া পার হইয়া চলিয়া গেল বাংলোর দিকে। তবু দেবী নিজের দৃষ্টি একবার ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াও ওই মুখখানা একবার না দেখিয়া পারিল না।

সে মুখে ভগ্নীপ্রেমের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই।
আছে বিজয়গর্ব্বের একটা প্রগল্‌ভ দীপ্তি, নির্ম্মমতার একটা জলন্ত সাক্ষ্য!

* *
*

একটা ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই একমাসের মধ্যে এই অঞ্চলের মানুষের চিন্তাধারা আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে। দেবীর মনও এমনি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া চিন্তার সুশৃঙ্খল গ্রন্থিগুলি জট্ পাকাইয়া গিয়াছিল। আজ দুইদিন ধরিয়া সে অন্তঃপুরের দশজনের সুমুখ দিয়া চলাফেরা করিতে সুরু করিয়াছে। পিতামহীর কাছেও দিনান্তে এক আধবার আসিয়া দুই একটি কথা বলিবার চেষ্টাও করে। বিদায়ের পূর্ব্বে তাহার মনের গতিটা যথাসাধ্য চেষ্টায় হাল্কা করিয়া তুলিবার মূলে ছিল তাহার শক্তিমান স্বামীর অবিচলিত উপদেশ। কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপে দেবীর মনে পড়িয়া যায় বিগত বিশ বৎসরের অজস্র ঘটনা। মনে পড়িয়া যায়—এই বাড়িতে কোথায় আজ তাহার স্থান, কতদূর সে সরিয়া আসিয়াছে! এমন আশ্চর্য্য ঘটনাও জগতে ঘটে!

এমনি চিন্তায় মস্তিষ্কের হাল্কা বাধন আবার ভারী হইয়া উঠে। সে দেহের ভার যেন দেবী ইচ্ছা করিয়াও ঠেলিয়া তুলিতে পারে না।

কোথা হইতে মাণিক দ্রুত পদশব্দে ঘরে ঢুকিয়া একটা মৃদু ধাক্কা দিতেই দেবীর সম্বিৎ ফিরিয়া আসে। মাণিক বলে, 'কি গো বসে থাকবে এমনি ক'রে? যেতে হবে আজ মনে আছে'?'

উত্তর দিতে গিয়া দেবীর কণ্ঠে একটা তপ্ত আভাস ফুটিয়া উঠিল। বলিল, 'যেতে ত' হবেই। তাই কি? লক্ষ্মীপুরের জমিদারীটা কি আমার মাথায় ক'রে নিয়ে যেতে হবে নাকি? ভারী ত' মানুষ, তার আবার উদ্‌যুগ্‌।'

মাণিকের দুইটি গম্ভীর চক্ষু অস্বাভাবিক দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। সে শুধুমাত্র বলিল, 'দেবী, ছিঃ!'

দেবী উঠিয়া অতি ধীর পদক্ষেপে বাহিরে চলিয়া আসিল। বাহিরে আসিয়াও তাহার মনে হইল স্বামীর বলিষ্ঠ চোখের তারা দুইটি যেন তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। সে দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার দেবীর মনের ভিতর অদ্ভুত প্রেরণা জাগাইয়া তুলিল!

ধীরে ধীরে দেবী জাহ্নবীদেবীর ঘরে প্রবেশ করিল।

বেলা প্রায় দশটা বাজে। তবু বৃদ্ধা এখনো শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া দেবী পিতামহীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'একবার গেলে না ঠাকু'মা?'

কথাটা ঠাকুরমা ঠিকই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু যে কথাটা বলিতে কেহই এতক্ষণ পর্য্যন্ত সাহস পায় নাই দেবী তাহা অম্লান বদনে বলিয়া ফেলিল। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই দেবী বুঝিল একটা অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বাভাস! ঘরে যেন একটা বোমা ফাটিয়া পড়িল। বৃদ্ধা জাহ্নবী দেবী কণ্ঠ সপ্তমে চড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কি বল্‌লি দেবী! আমি যাবো ওই তামাসা দেখতে! আমি যাবো আড়াল থেকে চুপি ক'রে ওই মুখখানা দেখতে! তুই যা, পোড়ারমুখী তুই যা। তোর পিয়ায়ের ভাই এসেছে, তুই দেখগে।'

'ঠাকু'মা—

'থাম তুই, কথা বলিসনে। এত বড় কথা তুই বলিস? আমি যাবো ওই দুশমনের মুখ দেখতে! ও শত্রু, তোর শত্রু, আমার শত্রু, আমাদের সাতপুরুষের শত্রু, তুই জানিসনে?'

কিন্তু এই মুখটি দেখিবার জন্যই জাহ্নবীদেবীর একদিন ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। সে কথা দেবী মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করিল না। শুধু বলিল, 'কিন্তু নাড়ির টান কি এত সহজে ধুয়ে ফেলতে পারবে ঠাকু'মা?'

'পারবো না আমি? ওই মূর্তিমান পাপকে প্রশ্রয় দেব আমি?—তোর ঠাকুরমা, নিশীথ রায়ের মা? আমার দু'টি চক্ষু যেন সেদিন অন্ধ হয়ে যায়। তুই জানিসনে রাণী এ পাপের রাজত্বে আমি যে আর দু'টো দিন কি ক'রে থাকবো ভাবতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ওই যজ্ঞকুণ্ডে যেখানে সাতপুরুষ ধরে চণ্ডীর মহামন্ত্র পাঠ হয়ে এসেছে, সেখানে ফরাসী বৌ জুতো মারিয়ে যাবে, যেখানে যজ্ঞের ঘি ভেসে গেছে সেখানে মদের ফেনায় ভিজে উঠবে। লক্ষ্মীদেবীর সেই লক্ষ্মীপীঠে ওই অলক্ষ্মীর তাণ্ডবনৃত্য আমি বেঁচে থাকতে তাই চেয়ে দেখবো রাণী! উঃ! ভাবতে পারিস! জনার্দ্দন কি করলে তুমি!

দেবী বলিল, 'কিন্তু ঠাকু'মা ওরা যাই করুক, তবু ওদের আদর আমাদের চেয়ে কত বেশী নিজে চোখেই ত' দেখে গেলে! ওরা হলো আমার স্বামীর জাত। যাঁরা আইন তৈরী করেছে তাঁদের জাত। যাঁরা আইন ভাঙছে তাঁদের জাত। যাঁরা শৃঙ্খলার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিচ্ছে তাঁদের জাত। ওঁদের ওতে দোষ নেই। ওতেই ওদের আদর, নাম থাকবে ওদের চিরকাল। আমাদের কথা মানুষ ভুলে যাবে।'

তেমনি দৃপ্তকণ্ঠে জাহ্নবীদেবী বলিয়া উঠিলেন, না না যাবে না। যেতে পারে না। আজও বাঙলার ইতিহাসে তাঁদের নাম অক্ষয় হয়ে আছে

দেবী। এই মাটিতেই প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী জন্ম নিয়েছিলো। এই মাটিই মহারাণী স্বর্ণময়ীর, রাণী শরৎসুন্দরীর, রাণী বিদ্যাময়ীর, রাণী রাসমণির, রাণী জাহ্নবীর, পুণ্যশ্লোকা হরদুর্গা দেবীচৌধুরাণীর জন্মভূমি! ক'টা মেয়েই বা বাঙলার জমিদারী শাসনের ভার পেয়েছিলরে দেবী? কর গুণে বলা চলে। আর ওরা? এত দম্ভ এত উচ্ছৃঙ্খলতার কি শেষ নেই রে দেবী? কত আর সইবে বসুন্ধরা? যে মানুষকে ওরা মানুষ বলে স্বীকার করতে চায় না, সেই মানুষের হাতেই ওদের দুর্গতির সীমা নেই। এ আমি তোকে বলে রাখলাম দেবী।'

একটা ভয়ঙ্কর আঘাতে জাহ্নবীদেবীর পুরাতন সংস্কারের চিতাভস্মের উপর আজ যে বিদ্রোহের কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, ইহার উৎস কোথায়? ইহাই কি নারীর হিংস্রতার সহস্রমুখী রূপ? না, যথার্থই বসুন্ধরা ভার বহনে অসমর্থা, কে বলিতে পারে?

কিন্তু আকাশে বাতাসে যে একই বার্ত্তা বহন করিয়া ফেরে! নৈসর্গিক উদ্‌ভ্রান্ত আস্ফালনে যে পৃথিবী থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে চায়!

হয়ত তাই!

সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা আর কত সহিবে?

হয়ত বিচার সত্যই আসন্ন। বিপ্লবী রথের চূড়ায় হয়ত তাহারই সঙ্কেত। নারীর এ গর্ব্ব পুরুষের অসহ্য হইলেও, হয়ত অযোগ্যতার অজস্র দৃষ্টান্ত নিরপেক্ষ করুণার তলায় আত্মগোপন করিয়াও মুক্তি পাইবে না। গানেশ রায়ের যে পরিণাম ঘটিয়াছে, কুমার সাহেবের ভবিষ্যতেও হয়ত তাই অবশ্যম্ভাবী। আভিজাত্যের স্থূল অহঙ্কারে গর্ব্বিত আত্মসুখসর্ব্বস্ব এই মেদবহুল জীব কতদিন আর এই সহিষ্ণু ধরিত্রীর বুকে নিরাপদে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে? কে জানে? জাতির উন্নতির পথে এই বিঘ্নের স্তম্ভ

অপসারণ করিবে যে সন্তানের দল, ধরিত্রী তাঁহাদের কবে প্রসব করিবে? আমি জানি না। ভূমিকম্পের অস্পষ্ট কলরব যাঁহারা শুনিতে পায়, তাঁহারাই বলিতে পারে। গণদানবের হিংস্র দংষ্ট্রা দেখিয়া যাঁহারা শঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে, তাঁহারাই বুঝিতে পারে। আমি শুধু বুঝি, সত্যই ত', অগণিত শ্রমিকের রক্তক্ষরণে যাহার জন্ম, যাহার তলায় অনুদার সর্ব্বধ্বংশকারী দুর্নীতির ভিত্তি,—এ কথা যাহারা বুঝে না, তাহারা পৌরুষের জয়পতাকা উড়াইয়া অলস চিত্তবিলাসের মহিমা প্রচার করিয়া নারীর উদার নীতির উজ্জ্বলতা নিষ্প্রভ করিয়া রাখিবে আর কত কাল?

নারীর গুণকীর্ত্তন পিতামহীর মুখে শুনিতে দেবীর মন্দও লাগিল না ভালও লাগিল না। শুনিবার মত ধৈর্য্যও তাহার নাই।

একটু তেজের সঙ্গেই সে বলিল, 'তা হোক্ ঠাকু'মা। এ তোমার বৃথা দর্প। অরণ্যে রোদন। আত্মপ্রশংসা করেও লাভ নেই শুনেই বা কি হবে? নারী হয়ে মা হয়ে যে সংসারে মেয়ের ন্যায্য মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে,— এত বড় অধর্ম্ম যে সংসারে ঘটেছে, তাঁদের তুমি পুণ্যাত্মা বললেও আমি বলবো না। তাঁদের সংসার ধর্ম্মের সংসার একথা যে অভিধানে লেখে সে অভিধান অপাঠ্য। এ বিধান যে শাস্ত্রে লেখে সে শাস্ত্র বিগর্হিত। আজ বাপের সম্পত্তি ছেলে পাবেই, এ তার ন্যায্য পাওনা। কিন্তু যে ন্যায্য পাওনা থেকে লক্ষ্মীদেবী একদিন তার মেয়েকে বঞ্চিত করেছিলেন, সেই পাপেই আজ তাঁর সংসারে পাপ ঢুকেছে। সুতরাং দোষ আমার ভাইয়ের নয়,— দোষ তোমার, আমার, আমাদের মায়ের জাতের,— দোষ তোমার শাস্ত্রকারের নয়. রাজার আইনেরও নয়।'

'রাজার আইনটাই কি বেশী হ'লো রাণী? হৃদয়ের আইনের কি কোন মূল্যই নেই?'

'এত বড় একটা দৃষ্টান্ত চোখের ওপর জল্ জল্ করছে, এর পরেও কি হৃদয়ের আইনের বড়াই করা চলে ঠাকু'মা ?'

'তা বটে ! আজকে দেবীর আসনে গিয়ে বসবে একটা বাঁদর। একেই বলে আইন, একেই বলে শৃঙ্খলা। কিন্তু রাণী, আইন ও শৃঙ্খলার নামে যাঁর আদালতে এত বড় ব্যাভিচারের প্রশ্রয় পায়, তার চেয়েও বড় আদালতে তাঁদেরই একদিন যখন বিচার হবে, তখন কোন্ আইনের শক্তি বেশী পরীক্ষা হবে।'

'ঠাকু'মা, এই বিজ্ঞানের যুগে তোমার অভিসম্পাৎ অচল। হাতে-নাতে তাঁরা যেদিন শিক্ষা পাবে, সেদিনই তাঁদের প্রকৃত শিক্ষা হবে। সে সব অনেক কথা। তার চেয়ে বরং লক্ষীদেবীর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানটা মাঝে মাঝে স্মরণ কোরো, তাহ'লে মনে বল পাবে। আমি এখন যাই।'

জাহ্নবীদেবীকে এক কথায় নির্ব্বাক করিয়া দিয়া দেবী দৃপ্ত তেজের সঙ্গেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জাহ্নবীদেবী চাহিয়া রহিলেন দেবীর উদ্ধত পদক্ষেপের দিকে! কী অসহায় দৃষ্টি !

কিন্তু দেবীর পায়ের ধ্বনির মধ্য দিয়া যে জ্বালা ঠিকরাইয়া বাহির হইল, তাহার অর্থ বুঝিতে জাহ্নবীঠাকুরাণীর আজ যেন কষ্ট হইল না। আজ তাঁহার দ্বিধাগ্রস্ত মন স্বীকার করিয়া লইতে চায়, — মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম। পুরুষের কাছে অপমানিত হওয়া তাই বুঝি এত সহজ। মেয়েরা আপনার দৈন্য আপনি প্রকাশ করিয়া বসিয়া আছে। মেয়েরা আপনার দাবী আপনিই অকুণ্ঠ ত্যাগের মধ্য দিয়া স্ব-ধর্ম্মের পুরস্কার গ্রহণ করে। তাই বুঝি শক্তিহীন পুরুষের তলায় শক্তিমতী স্ত্রীর এই লাঞ্ছনা।

জাহ্নবীদেবীর বুদ্ধি আচ্ছন্ন বিবেকের পাঁকে পড়িয়া কূল হারাইয়া যায়।

প্রত্যক্ষ সজ্ঘাত ও আদিকালের সংস্কারের মধ্যে যে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠে, তাহার শেষ মীমাংসা কিছুই হয় না। শুধুমাত্র সংস্কার গলা বাড়াইয়া যে বাণী ঘোষণা করে, জাহ্নবীদেবীর দোদুল্যমান মনের কোণে সহানুভূতির আকর্ষণটা যেন সেইদিকেই বেশী। — নীরবে সহ্য করাটাই যে স্ত্রী-জন্মের সর্ব্বোচ্চ চরিতার্থতা, কারণ তাঁরাই যে জগতের সমস্ত সন্তানের মা একথা তিনি ভুলিবেন কি করিয়া ?

জাহ্নবীদেবীর ঘর হইতে বাহির হইয়া দেবী নিজের ঘরের দিকে যাইতেই প্রশস্ত বারেণ্ডার আর এক কোণ হইতে একটি সুন্দর শ্লোক তাহার কানে আসিয়া যেন মধু ঢালিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে তাহার মনের উত্তেজনা গলিয়া জল হইয়া গেল।

বড় উদার শ্লোকটি। তাহার চেয়েও উদার ওই দৃশ্য। দেবী একবার দাঁড়াইয়া দৃশ্যটি না দেখিয়া যাইতে পারিল না।

ঠাকুরমার খাস দাসী মণির মা সামনে বসিয়া। মণির মার সম্মুখে ছোট্ট একটি কাপড়ের আসনের উপর যোগাসন করিয়া নিবিষ্ট মনে বসিয়া আছে মণি।

মণির সম্মুখে মণির ছোট্ট ভগ্নীটি তাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ডগায় খানিকটা চন্দন মাখিয়া ভাইয়ের কপালের দিকে প্রসারিত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে।

মণির মা মেয়েকে মন্ত্র বলিয়া দিতেছে। মেয়ে পড়িতেছে ঃ

স্বর্গে হুলস্থুল মর্ত্তে জয়জয়কার
যমুনা দেয় যমেরে ফোঁটা
আমি দেই আমার ভাইরে ফোঁটা
আজ অবধি যম-দুয়ারে পড়লো কাঁটা !

মন্ত্রটি পড়িয়া ভগ্নী ভ্রাতার ললাটে তিনবার ফোঁটা দিল।

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বাঙলার ঘরে ঘরে আজ ভগ্নীরা ভ্রাতাদের কপালে ফোঁটা দিতেছে। যাহাদের সামর্থ্যের প্রাচুর্য্য আছে, তাহাদের সমারোহের অন্ত নাই। যাহাদের সামর্থ নাই, তাহারা ওই মণির মত ছিন্ন মলিন একটি আসনে বসিয়া ভগ্নীর আঙ্গুলের ফোঁটা গ্রহণ করিতেছে। আড়ম্বরটা সেখানে নগণ্য ; আন্তরিকতাই প্রধান। যম দুয়ারে কাঁটা পড়ুক আর না পড়ুক, ভগ্নীর এই নিবিড় প্রার্থনায় হয়ত ভ্রাতার কল্যাণ-সাধনায় সহায়তাই করে। ভ্রাতা-ভগ্নীর এই প্রীতি অনুষ্ঠানের দৃশ্যটি দেখিতে দেখিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল কুমারের বাল্যকালের মুখখানা। ওই কপালে সেও একদিন ঘটা করিয়া ফোঁটা দিয়াছে। আজও তাহার সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিবার কথা। স্বামীর নির্দ্দেশটিও এই সঙ্গে তাহার মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু এই ছেলেখেলা করিতে তাহার আর প্রবৃত্তি হইল না। ছিঃ! ছিঃ! ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্কটা যেখানে বহু বাধাবিঘ্ন তর্কজালে সমাচ্ছন্ন, সেখানে প্রাণহীন অভিনয়ের যে কোন মূল্যই নাই, ইহা তাহার চেয়ে আজ কে বেশী বুঝিবে? ওই দাসীর মেয়েটির ভাগ্য দেখিয়া তাহার ঈর্ষা করিয়া শুধুমাত্র আত্মগঞ্জনা বাড়াইয়া তোলা ছাড়া আর কিইবা সার্থকতা আছে? কিছু না।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেবী কুমারের মঙ্গল কামনা করিল। মণিও তাহার বোনের দৃশ্যটি অনুরূপ চিন্তা করিয়া সেও মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিল, মানসপটে কুমারের ছবিটি আঁকিয়া তাহার কপালে ফোঁটাও দিল। কিন্তু ইহার চেয়ে বেশী আর সে কিছু করিতে পারিল না। পারা যে সম্ভব নয়, ইহা কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক, আত্মবঞ্চনা করিয়া গৌরাঙ্গ প্রেমের অনুকল্পে মিথ্যা মহত্ত্ব প্রচারের নির্লজ্জ সামর্থ যাহাদের আছে তাহাদেরই থাকুক। দেবীর নাই।

যেন একটা নৈসর্গিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া আজ মধ্যাহ্ন গড়াইয়া পড়িল পশ্চিম আকাশে।

কলিকাতার গাড়ী ধরিবার জাহাজের সময় আসন্ন। দেবীরাণীর বিদায়যাত্রার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। বাহিরে অন্ততঃ ত্রিশখানা গরুর গাড়ী বোঝাই কত যে জিনিষপত্র তাহার আর অন্ত নাই! এত আয়োজন কে করিয়াছে, গাড়ী বোঝাই নতুন নতুন মালপত্র কেই বা এত আমদানী করিল, ইহা জানিত বৃদ্ধ সোমনাথবাবু। জাহ্নবীদেবীর আদেশে এই দুই দিনের মধ্যে সোমনাথবাবু যেন গঞ্জের হাট ভাঙ্গিয়া আনিয়াছে সব জিনিষপত্র। বহু প্রকার খাদ্যদ্রব্য তৈজসপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নতুন নতুন বাক্স তোরঙ্গ ঠাসা দামী দামী বসন ভূষণ সোনারূপা,—দাতব্যের বোধ করি আর কিছু বাকী নাই।

কিন্তু এত আয়োজন উদ্যোগ যে বৃথাই যাইবে ইহা কেহ না ভাবিলেও বৃদ্ধা পিতামহীর মনে সংশয় ছিল যথেষ্টই। মাণিকলালের গোপন ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল অল্পক্ষণ মধ্যেই। জরির টোপরেরা পাল্কীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল দুইটি মাত্র বাহকের স্কন্ধে ভর করিয়া একটি মাত্র ডুলি। সামান্য রকমের একটা ডুলি। এ বাড়ির দাসী চাকরানীরা যাহাতে চড়িয়া যায় আসে। তাহার উপর তেমনি সামান্য রকমের একটা পুরাণো চাদর দিয়া আবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বিস্ময়ে সকলের চক্ষু একই সঙ্গে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল! এ কী! এই কি দেবীরাণীর বিদায়-যাত্রার আয়োজন! কেহই যেন ব্যাপারটা এখনো ঠিক ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, কোথায় যেন ভুল হইয়া যাইতেছে দেবীর সঙ্গে হয় ত যে দাসী যাইবে, তাহার জন্য ওই নগণ্য বস্তুটা। কিন্তু ওই নগণ্য বস্তুটার উপর মাণিকবাবুর এত দরদ কেন? নিজে হাতে বসিয়া ডুলির আবরণটা ভালো করিয়া জড়াইয়া দিতেছে।

দেবী বলিল, 'না ঠাকু'মা। কে জানে তুমি কতদিন বাঁচবে? তোমার খরচের ভার কে যোগাবে ঠাকু'মা, ওই সাহেব? দাদামশাই'র উইলসূত্রে তোমার জীবিতকাল পর্য্যন্ত তোমার মাসোয়ারা পাঠাতে সে আইনতঃ যে বাধ্য তা জানি; কিন্তু আমার বিশ্বাস নাই। না ঠাকু'মা ও আমি কক্ষনো নেব না। তোমার যে আজ কেউ নেই। আমার তবু স্বামী আছে, পুত্র আছে, শ্বশুরবর আছে,—আশীর্ব্বাদ করো স্ত্রীলোকের বড় সম্পদ যা তাই নিয়ে যেন ঘর করতে পারি।'

বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও জাহ্নবীদেবীর স্নেহের দান দেবী প্রত্যাখ্যান করিতেছে। তাহাতে বৃদ্ধার মান অপমান কিম্বা অভিমান কিছুই স্পর্শ করে নাই। শুধু এই ভাবিয়া তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন,—আজন্ম অগাধ সুখ ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিতা দেবী কি করিয়া সামান্য ঐ কয় সহস্র বার্ষিক মুনাফার বিত্তটুকু দিয়া তাহার সংসার চালাইবে। আপদে বিপদে সঞ্চিত অর্থের প্রয়োজনীয়তা হয়ত দেবী আজ বুঝিতেছে না; কিন্তু এমন দিন যদি আসে, সেদিন হয়ত ওই অভিমানিনী আদরিণী পৌত্রী মুখ বুজিয়া কত লাঞ্ছনা ও কৃচ্ছ্রতাই সহ্য করিবে। বুক ফাটিয়া যাইবে তবু হয়ত মেয়ের মুখ ফুটিবে না। ভাবিতে ভাবিতে, জাহ্নবীদেবীর দুই চক্ষু বহিয়া শুধু জলই পড়িতে লাগিল। চীৎকার করিয়া কাঁদিবার শক্তিটুকুও আজ তাঁহার নাই।

মাণিক ইতিমধ্যে আবার বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাগিদ দিতে সুরু করিয়াছে। জাহাজ আসিবার বোধ করি আর এক ঘণ্টাও বিলম্ব নাই, আর দেরী করা কোনমতেই উচিত নয়।

দেবী উঠিবার উপক্রম করিতেই বৃদ্ধা জাহ্নবী বলিলেন, 'বড় ব্যথা দিয়ে যাচ্ছিস দেবী। আবার বলি ওই গয়নার বাক্সটা অন্ততঃ সঙ্গে নিয়ে যা। যাবার বেলায় অভাগিনী ঠাকুরমার শেষ কথাটা রাখ। ও তোর নিজেরই জিনিষ!'

'নিজের জিনিষ বলতে আজ আমার কিছুই নেই ঠাকু'মা। শুধুমাত্র দৈবাৎ স্বামীর নামে যে বিত্তটা কেনা হয়ে গেছে, ওইটে আমার নিজের ফিরিয়ে দেবার হাত নেই। তবু যদি তোমার নাতি বলে ওই সোনার খনিটাও ফিরিয়ে দেব।'

অন্যমনস্কভাবে উঠিয়া যাইবার জন্য দুই পা বাড়াইয়া দেবী বলিল, 'কিছু না ঠাকু'মা, কিছু না। যাবার বেলায় বাপের বাড়ির পায়ের ধূলোটা পর্য্যন্ত আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না। জাহাজে ওঠবার আগে পা দু'টি ভালো ক'রে ধুয়ে তবে জাহাজে উঠবো। বাঙ্‌লার মেয়ে, এর চেয়ে সৌভাগ্য আমাদের কি হতে পারে?'

একটু দম লইয়া দেবী আবার বলিল, 'শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে ভগবানের কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছি, হে ভগবান, বাঙ্‌লার মায়েদের যে পেটে ভাই জন্মাবে, সে পেটে যেন বোন না জন্মায়। — কাশীতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো ঠাকু'মা।'

আর দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া দেবী ঠাকুরমার পায়ের ধূলা শেষবারের জন্য মাথায় তুলিয়া লইয়া তাঁহার দিকে আর ফিরিয়াও তাকাইতে পারিল না। চাপা অশ্রু এক সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার বুক ভাসাইয়া দিল!

দেবী টোপ-ঘেরা পাল্কীর দিকে চাহিয়া আপন মনেই একবার বিদ্রূপ-হাসি হাসিল। পাল্কীর মত পাল্কী পড়িয়া রহিল। দেবী যাইয়া বসিল চাদর-ঘেরা ছোট্ট ডুলিটির মধ্যে।

বাগ্দীদের ছেলে দুইটি দেবীর ডুলিটা মাত্র কাঁধে তুলিয়া ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনি সময়ে সোমনাথবাবু ছুটিয়া আসিয়া দেবীর অলঙ্কারের হাতবাক্সটি দেবীর ডুলির মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরমা তোমার মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছেন দেবী। এ তুমি সঙ্গে

ক'রে নিয়ে না গেলে তিনি অন্নজল ত্যাগ করবেন। লক্ষ্মীটি মা আমার আর দ্বিরুক্তি কোরো না।'

দেবী আর দ্বিরুক্তি সত্যই করিল না। মৌন সম্মতি দিয়া সে ডুলি বাহিতে আদেশ দিল।

জাহাজঘাটে ডুলি আসিয়া থামিলে ডুলির আচ্ছাদনের ফাঁক দিয়া দেবী সম্মুখের দিকে চাহিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে সে হতভম্ব হইয়া পড়িল। সুদীর্ঘ এই কয়বৎসর যাহাদের জন্য জাগ্রত ও নিদ্রায় দেবী মঙ্গল কামনা করিয়া আসিয়াছে, তাহারা দেবীর এই দারুণ দুর্দিনেও যে তাহাকে ভোলে নাই ইহাতেই দেবী দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁহার এই শেষ করুণার জন্য সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিল।

বাহিরে বিশাল জন-সমুদ্র!

এ দেশে যে এত লোক আছে, আজ প্রভাতেও যখন নতুন রাজা এই জাহাজ ঘাটেই প্রথম অবতরণ করিয়াছে, তাহা কেহই আন্দাজ করিতে পারে নাই। শুধুমাত্র তাবেদার শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র জনতা একটা ভীতি ও শঙ্কায় অভিভূত হইয়া ভবিষ্যৎ অন্নের সংস্থানটা যাহাতে অটুট থাকে কেবল তাহারই সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছে।

আজ আবার এই সন্ধ্যায় এই ঘাটেই যেন দেশের লোক ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মাতৃসমা পুণ্যশ্লোকা দয়ার নির্ঝরিণী ভূতপূর্ব্ব রাণীকে জানাইতে আসিয়াছে তাহাদের এতদিনকার সকৃতজ্ঞ অন্তরের সঞ্চিত ভক্তি শ্রদ্ধা।

বিশ সহস্র লোকের এই অপূর্ব্ব জনসমাবেশ দেখিয়া দেবী আর নিজেকে আত্মগোপন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না।

যে অসূর্য্যম্পশ্যা দেবী, চিকের অন্তরালে থাকিয়া এতদিন রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে,—সেই লোকললামভূতা দেবী আজ একান্ত

নিঃসঙ্কোচে ক্ষুদ্র বাহনের আচ্ছাদনটা নিজে হাতে তুলিয়া দিয়া প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করিল !

সাক্ষাৎ দেবীদর্শনে বিশাল জনতা নিঃশব্দে মন্ত্রমুগ্ধের মত শির অবনত করিল।

সাক্ষাৎ দেবীই বটে !

দেবীর অশ্রুপ্লাবিত দুই আয়ত দীর্ঘ চক্ষে অমৃতের ঝরণা ! ললাটে মাতৃমহিমার অনির্ব্বচনীয় অমিতাভ দীপ্তি ! মুখে অকপট স্নেহবাৎসল্যের একটা স্নিগ্ধ আভা !

দেখিতে দেখিতে দেবীর পদতলে ভক্তিশ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ রৌপ্য ও কাঞ্চনের একটি নাতিক্ষুদ্র পর্ব্বত রচিত হইয়া উঠিল।

সর্ব্বপ্রকার মানসিক চঞ্চলতা দূর করিয়া দেবী ভক্ত প্রজাবৃন্দের বিদায়কালীন প্রণামীর স্তূপটা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া সোমনাথবাবুকে ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'এঁদের এই শ্রদ্ধার দান আমি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলেম। কিন্তু এর প্রয়োজন আমার মিটে গেছে। এঁদের বলুন কাকাবাবু, দেশের দুর্দ্দিন আসন্ন। শুধুমাত্র লাঙলের ফলার সাহায্যে আকাশের দিকে চেয়ে কৃষির উন্নতি সম্ভবপর নয়। ভূমি কৃষির উন্নতিকল্পে এঁদের নিতে হবে যথার্থ শিক্ষা ও বিজ্ঞানের সাহায্য। আমি চাই উন্নত-কৃষির জন্য একটা দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মীসঙ্ঘ গঠিত হোক্ এবং তারই প্রাথমিক সাহায্যের জন্য এই অর্থ আমি দিয়ে গেলাম। তার সঙ্গে আমার ত' আর কিছু সম্বল নেই—

বলিয়া ডুলি হইতে দেবীর অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের অলঙ্কারের বাক্সটিও সেই সঙ্গে সোমনাথবাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

বিহ্বল জনতার হর্ষধ্বনি না থামিতেই বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

জাহাজের ভোঁ বাজিয়া উঠিল।

দেবী ত্রান্তিদে মাণিকের হাত ধরিয়া শিশুপুত্র কন্যা সহ জাহাজে গিয়া চড়িতেই ধীরে ধীরে জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

রক্তবর্ণ পশ্চিম আকাশে দেবীর অভ্রভেদী কীর্ত্তির শেষ স্বাক্ষর লিখিয়া রাখিয়া সূর্য্যদেব তখন নদীগর্ভে অস্তগামী। এ দিকে বাংলোর উপরের লবীতে বসিয়া সস্ত্রীক কুমার সাহেব ডিকেণ্টার হইতে সুধা ঢালিয়া রঙিন গেলাসে ভরিতেছে।

ওদিকে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা বৃদ্ধা জাহ্নবীর জীর্ণ বক্ষ ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া যাইতেছে।

নদীর তীরে বিশাল জনতা এখনো জাহাজের দিকে নিষ্পলক অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সব নিষ্পন্দ জড়ের মত ভিড় করিয়া চাহিয়া আছে—অপসৃয়মান পারাপারের হতভাগ্য তরীর দিকে!

ধীরে ধীরে নদীর বাঁকে জাহাজ গেল অদৃশ্য হইয়া!

শুধু তখন দেখা যায় জাহাজের চোঙাটা। আর উদ্গারিত রাশি রাশি ধোঁয়া।

—শেষ—